ভূমিকা

আজ থেকে ত্রিশ বছর অগেকার কথা। মেদিনীপুরে তখন আমি কলেজের ছাত্র। মাতৃভূমির বন্ধনদশা অন্তরকে বেদনাতুর করে তুলেছিল অতি শৈশবেই। বন্ধন মোচনে আমরা দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলাম, সঙ্কল্প করেছিলাম এ বন্ধন ঘোচাতে হবে এবং এই সঙ্কল্প নিয়েই একদিন পথ দেখতে পেয়েছিলাম সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলনে। এই সূত্রেই প্রথমে কলিকাতায় এবং সেখান থেকে মেদিনীপুরে পদার্পণ। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডী সাহেবকে হত্যা ঘটনায় জড়িত হয়ে প্রথমে স্থান পেলুম স্থানীয় জেলে এবং কিছুদিন পরে রাজপুতানায় দেউলী বন্দী নিবাসে। জীবনের কৈশোর এবং যৌবনেরও কতকটা অতিবাহিত হল এইভাবে। প্রায় ৮ বৎসর কাল বন্দী নিবাসে কাটে। মরুভূমির দুঃসহ উত্তাপে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠত শরীর ও মন; চাইত বাংলা মায়ের শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়া, চাইত তার স্নেহ কোমল স্পর্শ। বাংলার মাঠ বাংলার ঘাট, বাংলার পথ, বাংলার নদনদী, বাংলার শিশু এবং বাংলার মা—মন আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলত এদের নয়ন ভুলান ছবি, কল্পনার তুলিতে রূপায়িত হত এরা সবাই। এ কার্যে যাঁর সাহায্য সেদিন সবচেয়ে বেশী পেয়েছিলাম তিনি শরৎচন্দ্র, পল্লী বাংলার দরদী স্রষ্টা, বাংলা মায়ের দরদী শিল্পী ও স্রষ্টা। শরৎ-সাহিত্য পড়তে পড়তে ভুলে যেতাম রাজপুতনার বন্দীনিবাসে বন্দী আমি, ভুলে যেতাম সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত দৃষ্টি আমার সীমাবদ্ধ। মনে হত যেন স্নেহ কোমল বাংলা মায়ের স্পর্শই আমি পাচ্ছি, ধন্য হচ্ছি যেন বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার আকাশ এবং বাংলার বাতাসকে ভালবেসে এবং ভালবাসা পেয়ে। তাই মনে হয় শরৎচন্দ্রকে সেদিন বড় একান্ত আপনার মনে হয়েছিল, নিবিড়ভাবেই আমি যেন ভালবেসে ছিলুম তাঁকে। তাই শরৎচন্দ্রের কথা, শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে সমস্ত স্মৃতি মন্থন করে এই কথাগুলিই যেন ভেসে ওঠে সবচেয়ে আগে কিছুতেই ভুলতে পারিনে সেদিনের কথা।

তারপর একদিন দুঃখের দিন এল। আমার বন্দীজীবনের দশা তখনও কাটেনি। শুনলাম শরৎচন্দ্র আর নেই। ব্যথা পেয়েছিলাম, ইচ্ছা হয়েছিল শরৎ-সাহিত্যে নিয়ে আমার অক্ষম হস্তে কিছু লিখব, নৈবেদ্য সাজিয়ে দেব

শরৎ-স্মৃতিতে। সে ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলাম 'শরৎ-সাহিত্যে নারী চরিত্র' লিখে। শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসা আমার মিশেছিল। আজ নতুন করে শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই আমি অর্পণ করছি শরৎ-স্মৃতিতে সবচেয়ে আগে।

বর্তমান পুস্তকে সাধারণভাবে শরৎ-সাহিত্য, শরৎ-সাহিত্যে সমাজ, শরৎ-সাহিত্যে পতিতা, শরৎ-সাহিত্যে নারী, শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন এবং পথের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সকলই অনন্য-নিরপেক্ষ, সেজন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ, নারী হিসাবে একবার যাকে দেখেছি, পতিতা হিসাবেই পুনরায় তাকে নিয়েই আলোচনা করতে কোথাও কোথাও হয়েছে। নতুবা অনেক প্রধান চরিত্র আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যেত।

শরৎ-সাহিত্য সর্বত্রই নীরব সহিষ্ণুতাময়। প্রেম এখানে মিতভাষী এবং অন্তর্মুখী, বাহ্যরূপে তাহার প্রকাশ নাই। চরিত্র সমূহের ভুলভ্রান্তি এখানে বড় নয়, মনুষ্যত্বই এখানে বড়। সামাজিক আচারপদ্ধতি অনুসরণে এই মনুষ্যত্ব যেমন রক্ষিত হয় না, তেমনি দৈহিক সতীত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও মনুষত্ব রক্ষা করা যেতে পারে। শরৎ-সাহিত্যে তাই সতীত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়। নানা কারণে সমাজ আজ জীর্ণ কিন্তু তবুও এর প্রতাপ মানুষের মনুষ্যত্বকে অহরহ আঘাত করছে। তাই শরৎচন্দ্র ছিলেন এই সমাজের বিরোধী। সমাজ অপেক্ষা তাঁর নিকট মানুষ বড়। মানুষের কল্যাণেই তো সমাজের প্রয়োজন। শরৎসাহিত্যের সর্বত্র আমরা শরৎচন্দ্রের এই সামাজিক আদর্শের পরিচয় পাই। স্বাধীনতা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্রের আদর্শ অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। তাঁর কাছে স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এর থেকে আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন, নইলে স্বাধীনতার কোন মূল্য তাঁর নিকট নেই। শরৎ-সাহিত্য বঞ্চিতের মুখে কথা দিয়েছে, দুর্বলকে, উৎপীড়িতকে, লাঞ্ছিতকে প্রতিবাদ জানাতে শিখিয়েছে, শরৎ-সাহিত্যে ব্যথিতের বেদনা ভাষা পেয়েছে, মানুষের মনুষ্যত্বের দ্বারে এই বেদনা শরৎ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আজ নালিশ জানাচ্ছে। আমরা দেখি, মানুষের মরণ শরৎচন্দ্রকে তেমন আঘাত করে না. যেমন করে মনুষ্যত্বের মরণ। তাই শরৎ-সাহিত্যে সত্যের স্থান মুখে নয়, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে। এইজন্য প্রচলিত আদর্শে শরৎ-চন্দ্র বিশ্বাস করতেন না। এদিক চেয়ে বিচার করলে

শরৎ-সাহিত্যের অতি কম নারীচরিত্রই সতী বলে গণ্য হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শরৎ-সাহিত্য নিষিদ্ধ প্রেমের বিশুদ্ধতার ছবি।

কেহ কেহ বলছেন—'শরৎ সাহিত্যের যুগ শেষ হইয়াছে।' তাঁদের কাছে শরৎ-সাহিত্য আজ মৃত। তাই মৃতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করলে তার পুঁতিগন্ধ বা'র হবে এই ভয়ে একাজে তাঁরা নিজেরাও হাত দেবেন না; অন্যকেও হাত দিতে দেবেন না। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য কালের ব্যবধান অতিক্রম করেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। তাই কালিদাস আজও বেঁচে আছেন, শেক্সপীয়ার বেঁচে আছেন, বাল্মীকি, বেদব্যাস—এরাও বেঁচে আছেন। সাহিত্যাকাশে এঁরা চিরকালের, চিরদিনের এবং চিরযুগের। শরৎ-সাহিত্যও দীর্ঘকালের ঝড়-ঝঞ্ঝাকে, বিপ্লবকে ব্যর্থ করে বেঁচে থাকবে এ সম্পর্কে নিরাশ হবার সময় আজও আসেনি।

ভূমিকা শেষে আলোচ্য বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এমন কয়েকজনের কথা বলব।…বইটির সামগ্রিক উৎকর্ষ ও রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত থেকে আলোচ্য বইটির সমস্ত প্রুফ দেখে দিয়েছেন সাহিত্যসেবী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক অমিয় বসুর ও মুদ্রাকর গৌরহরি দাসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যও কম উৎসাহিত করেনি আমাকে। এঁরা সবাই আমার ধন্যবাদভাজন। ইতি—

কলিকাতা
১২।১১।৬০ } গ্রন্থকার
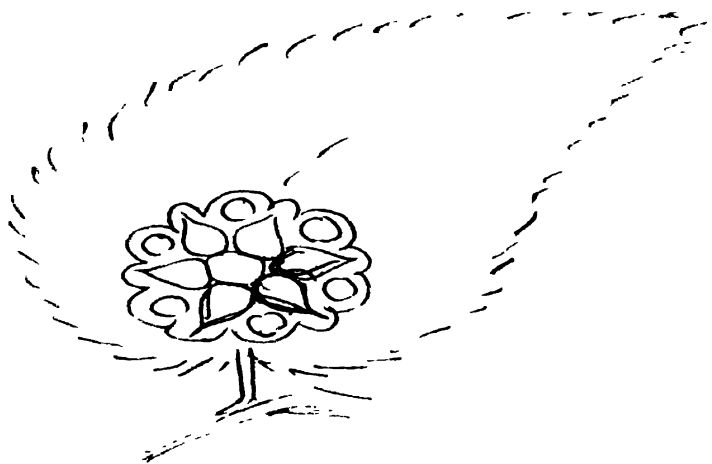
এই লেখকের অন্যান্য বই

শরৎ-সাহিত্যে নারী চরিত্র

ফরাসী গল্পগুচ্ছ

বঙ্কিম সাহিত্যের ধারা

বিপ্লবী স্ট্যালিন

বাংলায় অগ্নিযুগ

শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে-দুঃখে মিলনে-বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়াছেন, বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে।"

কবি এখানে অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু শরৎচন্দ্র বাঙালী হৃদয়কে দূর হইতে দেখিয়াই তাহাদের চিত্র অঙ্কন করেন নাই। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন—"এমন দিন গেছে যখন দু' তিনদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেরিয়েছি। কত লোকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে; তারা ভদ্রলোক। কত হাড়ী বাগদীর বাড়িতে থেকেছি, আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি, তাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তারপর ভাল করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তাছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র আমার স্বচক্ষে দেখা।"

পল্লীবাংলার সমাজকে শরৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়া নয়,—অন্তরের দৃষ্টি দিয়া। পল্লীবাংলাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া শরৎচন্দ্র তাহারই পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে। এইজন্যই শরৎ-সাহিত্য বাঙালী জীবনের প্রকৃত পরিচয়।

সাহিত্যের অন্যান্য ধারার ন্যায় উপন্যাস শুধু লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারা নয়, উপন্যাস মানুষের হৃদয়ের ছবি। এই ছবি যে-পরিমাণে যথাযথ হইবে, সেই পরিমাণেই হইবে ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। কিন্তু তাই বলিয়া অতিবাস্তব সাহিত্যও প্রকৃত উপন্যাস হয় না। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, "আমার চরিত্রগুলির শতকরা নব্বই ভাগ বুনিয়াদ সত্য। কিন্তু এখন মনে রাখতে হবে যে, সত্য মাত্রই সাহিত্য নয়। এমন অনেক সত্য আছে যাহা সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না। সত্যের উপর বনেদ না খাড়া করলে চরিত্র জীবন্ত হয় না। আমি যে চরিত্র দেখেছি তাই লিখেছি।" ইহার অর্থ এই যে শুধু চোখের দৃষ্টি

দিয়া দেখিয়াই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। শরৎচন্দ্র বাঙালী জীবনকে তাঁহার অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রচিত সাহিত্যে বাঙালী জীবনেরই বিচিত্র সুর ধ্বনিত হইয়াছে এবং এইজন্যই শরৎচন্দ্র বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাহিত্যিক।)

শরৎ-পূর্ব বঙ্কিম ও রবীন্দ্রসাহিত্য হইতে শরৎ-সাহিত্য সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করিতেন। এইজন্যই বঙ্কিম সাহিত্যের চরিত্রসমূহ সকলই আদর্শনিষ্ঠ। আদর্শবাদ ব্যাহত করিয়া আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়া বঙ্কিম সাহিত্যের কোন চরিত্রই শাস্তি হইতে রেহাই পায় নাই। বঙ্কিম সাহিত্যে সমাজকে আঘাত করিয়াছিল কুন্দনন্দিনী এবং রোহিনী। বিধবা হইয়াও তাহারা সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী সংযমকে মানিয়া লয় নাই। বিধবা হইয়াও একজন পুরুষকে ভালবাসিয়াছিল, তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যিক কাঠগড়ায় অত্যন্ত নির্মমভাবেই তাহাদের বিচার করিয়াছেন। রোহিনীর বা কুন্দনন্দিনীর বেদনা-ব্যথিত হৃদয়ের দিকে চাহিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে কোন প্রশ্নই করেন নাই। রবীন্দ্র উপন্যাসেও সমাজের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন আমরা দেখি না। অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে সমাজ বড় নয়। সমাজের প্রভাব এখানে উপন্যাসের চরিত্রের জীবনধারা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে না। কিন্তু এই আদর্শনিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তুলিয়াছেন শরৎচন্দ্র। এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যে সতীত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব বড়। শরৎচন্দ্রের নিকট সতীত্ব পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গমাত্র। তাই মনুষ্যত্বকে সে-যে ছাপিয়া যাইবে তাহা হইতে পারে না। শরৎচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন—"একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যে যদি স্থান না পায়, তবে এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?" তাই শরৎ-সাহিত্য সতীত্বের জয় ঘোষণা না করিয়া একনিষ্ঠ প্রেমেরই বিজয় ঘোষণা করে।

শরৎ-প্রতিভা বাঙালী-প্রতিভা ও মনন-শক্তির একটা বিশেষ শিল্পপ্রকাশ। আর্য ভারতের বৈদিক সভ্যতা যেদিন পরস্পর হানাহানিতে এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ক্ষয়িষ্ণু, সেদিন চিন্তাশীল ভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে এক সামগ্রিক নিধনের মধ্যেই আর্যভারতের মুক্তি। এই সামগ্রিক নিধনের ভিতর দিয়াই তিনি এক নবভারত গঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে কামরূপ, কলিঙ্গ ও অঙ্গ লইয়া গঠিত বঙ্গাঞ্চল সেদিন তাঁহার বিরোধিতাই করিয়াছিল। আবার বৌদ্ধভারতের পরে পুনরুত্থান যুগে সমগ্র ভারত আবার যখন আর্য

রমা রমেশের প্রণয় নিষিদ্ধ, পার্বতীর এমন অধিকার নেই যে সে দেবদাসকে ভালবাসিতে পারে, অভয়ার পক্ষেও তাহার রোহিনীদাকে ভালবাসা বা তাহাকে লইয়া স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করা নিষিদ্ধ। চিরদিন সমাজের মুখ চাহিয়া থাকিয়াই রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের জীবনের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিল না, সতীশও সাবিত্রীকে পাইল না। তবুও শরৎ-সাহিত্যে ইহাদের প্রেম ব্যর্থ নয়; অকল্যাণকরও নয়। সমাজে এই প্রেম নীতিবিগর্হিত হইলেও শরৎ-সাহিত্যে ইহা নীতিবিগর্হিত নয়। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি অনেক সমস্যার ইঙ্গিত শরৎ-সাহিত্যে পাই। কিন্তু ইহার কোন সমাধান আমরা এখানে দেখি না। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "সমাজ-সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের বিবরণ আছে; সমস্যা আছে, সমাধান নেই। ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্পলেখক—তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

প্রচলিত সামাজিক নিয়মকে শরৎচন্দ্র সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত করিয়াছেন—তাঁহার 'শেষ প্রশ্ন' বই-এ। শরৎচন্দ্র কমলের মুখ দিয়া সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা শুধু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কথাই নয়, ইহা মানুষ শরৎচন্দ্রের মনের কথা; ১৯২০ সালের ২১শে নভেম্বর চন্দননগরের এক সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র বক্তৃতা করেন। 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস তখনও প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু রচনাকার্য চলিতেছে। বংশ পরিচয় সম্পর্কে কথা উঠিতে শরৎচন্দ্র বলেন—"বংশ পরিচয় দিয়ে কি হবে? পুরান জীবনের গৌরব করে আমাদের কিছু কাজ হবে না। যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে, পাথর খুঁড়ে বার কচ্ছেন আর বলছেন—এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল, আমি তাঁদের কথায় খুসী হই না। আমার বুক তাতে ফুলে উঠে না। আমি বলি, আমাদের কিছু ছিল না। আমাদের যা দরকার, আমরা তা গড়ে নেব।

মানুষ এখন এগিয়ে যাচ্ছে, নিজের জোরে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে। হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল পাথর খুঁড়ে বার করে তা' শুনিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। নিজের গৌরব কিসে হয়, তাই ভাল করে গড়ে তোল। জাতের সম্বন্ধেও একথা খাটে। নাই বা থাকল জাত—নিজের জোরে প্রতিষ্ঠা করে নাও। নাইবা থাকল কিছু বংশ পরিচয়। নিজে সার্থকজীবন হবার চেষ্টা করো। আমার 'শেষ প্রশ্নে' আমি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমাদের যা কিছু বর্তমানে চলছে তার উপর কটাক্ষও আছে, আঘাতও আছে।"

শরৎচন্দ্র এই বক্তৃতায় আরও বলেন, "আমাদের সবই ছিল যদি, সকলই জেনেছিলুম যদি, তবে আমাদের এ দশা হ'ল কেন? পৃথিবীর অন্য জাতিদের দিকে যখন তাকাই, দেখি তারা নিজের পরিচয় দেবার মত প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আর আমরা? যাদের সব ছিল,—একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার ইংরেজের জুতোর তলায় পিষে মরছে কেন? আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের খুব বড় করেই বড়াই করে থাকি। কিন্তু বাইরের লোক সে কথা বিশ্বাস করে না। ধর্মের মধ্যে মস্ত গলদ আছে। মূল সূত্রটা ত্যাগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ত্যাগের ভিতর কি আছে খুঁজে পাই না। কোথায় গলদ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি এরও সেই 'শেষ প্রশ্নে' আলোচনা করেছি।"

তিনি বলেন, "আমাদের এ দশা কেন কেউ যদি বা'র করতে পারেন, দেশের মহা উপকার হবে। এই যে হাজার হাজার বছরের দুরবস্থা, এ সামলাবার কোন উপায় দেখি না, কিছু আশা দেখতে পাই না। বইখানায় আমার যা মত তাই বলেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই আহ্বান করেছি, আসুন কোথায় গলদ আছে বা'র করে দিন। দেখান, কোন্‌খানটায় গলদ ছিল, যার দোষে আমরা এই শাস্তি ভোগ করছি।"

এই বক্তৃতাতেই শরৎচন্দ্র বলেন, "আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই! পুরানো জিনিসটা বদল বদল করে নেবো এ আমি চাই না। সংস্কার মানে কি তা' 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি। যেটা খারাপ জিনিস, অনেকদিন চলে ধধ্‌ধড়ে নড়্‌নড়ে হয়ে গেছে, তাকে মেরামত করা। মেরামত করে কখনও ভাল হয় না। বরং অন্যায় অচল জিনিসটাকে আরও মজবুত করে কায়েমী করে তোলা হয়।"

শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর মুখ দিয়ে বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। ইহা শুধু শরৎ চন্দ্রের মুখের কথা নয়, ইহা তাঁহার অন্তরের কথা।

'শেষ প্রশ্নে' শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সীমা মেনে চলাই সংযম। শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব। সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে, সংযম যেখানে সহজ না হ'য়ে অপরকে আঘাত করে, তখনই সে দুর্বহ। অতি সংযম আর এক ধরণের অসংযম।

আমরা দেখি, ইহাই শরৎ-সাহিত্যের মৌলিক নীতি। শরৎচন্দ্র সংযমকে আঘাত করেন নাই, তিনি আঘাত করিয়াছেন এই সামাজিক অতি সংযমকে, যাহা সংযমের নামে সমাজে আজ চলিতেছে। সামাজিক নীতিকে আঘাত না করিয়া তিনি আঘাত করিয়াছেন সামাজিক অত্যাচারকে এবং ইহাকেই ভুল

বুঝিয়া তৎকালের এক শ্রেণীর লোক শরৎ-সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন।

পল্লীসমাজের চিত্র শরৎচন্দ্র শুধু 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেই অঙ্কিত করেন নাই, তাঁহার 'অনুপমার প্রেম, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মামলার ফল, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, হরিলক্ষ্মী, পরেশ, অনুরাধা', প্রভৃতি সকল উপন্যাসই পল্লীবাংলার চিত্র। এমনকি 'শ্রীকান্ত' বা 'চরিত্রহীন'-এর সমাজও পল্লীবাংলার না হইলেও পল্লীচিত্র এখানে বিরল নয়।

শরৎচন্দ্র এই সকল উপন্যাসে পল্লীবাংলার বহুবিধ সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বয়োবৃদ্ধ সমাজ আজ জীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে; সমাজ আজ বহুবিধ দুর্নীতির আধার। সমাজের হিংস্র কশাঘাতে যাহারা আহত ও রক্তাক্ত তাহাদের জন্য শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল অফুরন্ত এবং এই প্রাণভরা অফুরন্ত দরদ লইয়াই তিনি সমাজ-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যের চরিত্রগুলি সমাজ-জীবনের জীবন্ত অংশ। কিন্তু এই সকল চিত্র অঙ্কনে আমরা কোথাও শরৎচন্দ্রকে সমাজের প্রতি সহানুভূতিহীন দেখি না। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বর্তমান ভারতীয় সমাজ সংরক্ষিত স্বার্থস্তূপের প্রতীক, সামাজিক বিধিনিষেধগুলি প্রাণহীন, এবং সমাজের নরনারীর জীবনের কল্যাণ সাধনে উহা সহায়ক নয়, সমাজ শাসন বর্তমানে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের পথে বাধা। শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন চিত্র ও চরিত্র এইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। শরৎচন্দ্রের দরদ এখানে ব্যক্তির পক্ষে। এজন্য সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভের বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজকে তিনি কোথাও আঘাত করেন নাই। চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, সমাজকে আঘাত করা আর সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক কথা নয়। কিরণময়ী সমাজের অবিচারকে আঘাত করিতে গিয়া সমাজকেই আঘাত করিয়াছিল—এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যে কিরণময়ীর সমর্থন নাই। তাহার পরিপূর্ণ যৌবন যখন বিকাশের জন্য ব্যাকুল, পাথুরিয়াঘাটার বদ্ধগৃহে তাহার অসহনীয় জীবন যাপনের বিরুদ্ধে এখানে বিক্ষোভ আছে কিন্তু তাই বলিয়া মুক্তির সহজ পথের সন্ধান না পাইলেও সে-যে আঘাত করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া বাহির হইবে, ইহা শরৎ-সাহিত্য সমর্থন করে নাই। এইজন্যই দেখি, শরৎ-সাহিত্যে এই বিদুষী বিদ্রোহী নারীর জীবন ব্যর্থ।

কিরণময়ীর সামাজিক-জীবনে আমরা দেখি, স্বামী তাহাকে একদিনের

জন্যও ভাল বাসেন নাই। দিনের বেলায় স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন এবং বধূকেও সেই সঙ্গে শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাভ্যাসের নেশা তাহার এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল যে উভয়ের মধ্যে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ ব্যতীত স্বামীস্ত্রীর মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবার কিছুমাত্র অবকাশ পায় নাই। এইজন্যই পাথুরিয়াঘাটার এই বদ্ধ গৃহে বধূ কিরণময়ীর জগতে সৌন্দর্য এবং মাধুর্য উভয়ই ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, লিখিয়া পড়িয়া ভাত রাঁধিয়া শাশুড়ীর বকুনি খাইয়া, ঘরের কাজকর্ম করিয়া তাহার দিনের বেলা কাটিত। রাত্রে পরকালের বিরুদ্ধে, আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া, নালিশ করিয়া, গ্লানি করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া ঘরের দেয়ালগুলা পর্যন্ত বিষাক্ত করিয়া দিয়া ক্লান্ত জর্জর হইয়া কোন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িত। আবার প্রভাত হইত, আবার রাত্রি আসিত; একদিনের জন্য সূর্য কিরণ এ গৃহে প্রবেশ করে নাই, একমুহূর্তের জন্য আকাশের বায়ু পথ ভুলিয়া প্রবেশ করে নাই। তবুও এই গৃহে কিরণময়ীর বধূজীবনের দশ বৎসর অতীত হইয়াছিল।

পাথুরিয়াঘাটায় এই গৃহ কিরণময়ীর নিকট শুধু শুষ্ক এবং নিরানন্দই ছিল না, শাশুড়ীর নিকট বধূর পরীক্ষা ছিল নির্মম এবং কঠোর। অতি ক্ষুদ্র ভুল-ভ্রান্তিরও সেখানে ক্ষমা ছিলনা! শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, অঘোরময়ী তাঁর রান্নাঘরের হাতা বেড়ী খুন্তী হইতে পোড়া কাঠ পর্যন্ত সবগুলির চিহ্নই এই ছোট বধূটির দেহে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। এইজন্য শরৎ-সাহিত্য কিরণময়ীর প্রতি বেদনাতুর এবং সহানুভূতিশীল; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের প্রতি তাহার বিদ্রোহিতাকে শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেন নাই।

শরৎ-সাহিত্যে চির সহনশীলতাই নারীর ধর্ম। চিরকালের সীতা-সাবিত্রী সে; তাই শত প্রকার নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহিয়াও তাহাদের নীরব থাকিতে হইবে এবং এই লাঞ্ছনার পরীক্ষায় কৃতিত্ব যাহার যত বেশী, সমাজে তাহার গৌরবের আসনও তত উর্ধ্বে। কিন্তু কিরণময়ী এই পথ অবলম্বন করে নাই, সমাজের দেওয়া অত্যাচারকে সে মাথা পাতিয়া আশীর্বাদ রূপে লয় নাই! কিরণময়ী সমাজকে আঘাত করিয়াছিল, এইজন্য সমাজও প্রত্যাঘাত করিয়া তাহার উদ্ধত শির অবনত করিয়াছিল।

কিরণময়ী একদিন দিবাকরকে কহিয়াছিল, "আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি। সুতরাং কোন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে কাহারও সত্যকার অধিকারে
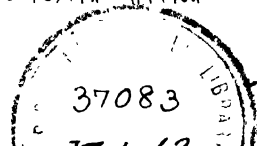
হাত দিতেছি কিনা! আবার এই অধিকার বাহিরের দিকে যেমন, ভিতরের দিকেও ঠিক তেমনি। নিজের উপরও নিজের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারও চেয়ে তুচ্ছ নয়। সে অধিকারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা—নিজের উপর অন্যায় করা।"

আমরা জানি, এই যুক্তির বলেই কিরণময়ী সমাজকে উপেক্ষা করিয়াছিল। কিরণময়ী বুঝিয়াছিল, মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্যই মানুষ নয়। সমগ্র শরৎ-সাহিত্যেও এই যুক্তি আমরা দেখি। কিন্তু অত্যাচার যতই হউক না কেন ব্যক্তি সমাজকে লঙ্ঘন করিবে, ইহা শরৎ-সাহিত্য চাহে নাই। কিরণময়ী বলিয়াছিল, সমাজ যখন উদ্ধত হয়ে তার সত্যিকার সীমানা লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করা উচিত! এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চেতনা হয়, তার মোহ ছুটে যায়। কিন্তু সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে এই আঘাত করার পক্ষে কোন যুক্তি দেখা যায় না। এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যে বহুবিধ সমস্যা আছে; কিন্তু সমাধান নাই।

রেঙ্গুন হইতে ১০।৩।১৬ তারিখে লিখিত শরৎচন্দ্রের একখানি পত্র ১৩৪৫ সালের আশ্বিন মাসে এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহার উদ্দেশ্যে পত্রখানি লিখিত লেখক তাঁহাকে লিখিতেছেন—

'পল্লী সমাজ' আপনার মন্দ লাগে নাই বরং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য ও যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই কাটিয়েছি। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি।

পত্রপ্রাপক সম্ভবতঃ সমাধানের বিষয় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উত্তরে শরৎচন্দ্র লিখিতেছেন—"তারপর প্রতিকারের উপায়! উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও দেখিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে আর যারা প্রতিকার করতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া, বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালমন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিষ।"

ইহা ছিল শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিমত। শরৎ-সাহিত্যে কোথাও ইহার

সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবে ঔপন্যাসিক বিষয়বস্তুর অবতারণা যেভাবে করা হইয়াছে তাহাতে কিছু যে ধারণা করিয়া লওয়া যায় না তাহা নয়।

২৪।৭।১৯ তারিখে হাওড়া হইতে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আমরা শরৎচন্দ্রের অভিমত দেখি—

"আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কিনা জানিনা। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।"

এইজন্যই বড়দিদি মাধবী, পল্লীসমাজের রমা এবং পথ নির্দেশের হেম প্রভৃতির জন্যই শরৎচন্দ্রের লেখনীই শুধু বেদনার্দ্র নয়, পাঠকের হৃদয়কেও উহা বেদনার্দ্র করিয়া তোলে। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছিল, তাহার কল্যাণ অকল্যাণ সমস্ত হাতে তুলিয়া লইয়াছিল কিন্তু তবুও একটা অচ্ছেদ্য ব্যবধান নিবিড় মিলনের মধ্যেও যেন উভয়কেই বিঁধিতেছিল। রাজলক্ষ্মীর কোন মঙ্গল কামনাই এই ব্যবধানকে দূর করিতে পারে নাই। ইহার কারণ সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের একটা সশ্রদ্ধ মমত্ববোধ। সমাজের প্রতি শরৎ-সাহিত্যের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের জন্যই এখানে কোন চরিত্রই সমাজের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কেবল যৌন-আকর্ষণে মিলিত হইতে পারে নাই। সতীশের সঙ্গে সাবিত্রীর মিলনেও ইহাই ছিল বাধা। শরৎচন্দ্র এই কথাই লিখিয়াছেন, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট ১৪।৮।১৯ তারিখে লিখিত এক পত্রে—

"সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবলমাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্যাদাহীন প্রেমের ভার আলগা দিলেই দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।"

সমাজের প্রতি এই মনোভাবই শরৎ-সাহিত্যে রক্ষণশীলতা বলিয়া পরিচিত। শ্রীকান্তের সঙ্গে রাজলক্ষ্মী, সতীশের সঙ্গে সাবিত্রী, গুণীনের সঙ্গে হেমের এবং সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর মিলনে ইহাই বাধা। এই বাধা উপেক্ষা করিয়াছিল অভয়া কিন্তু তাহাও এই বাঙালী সমাজে থাকিয়া নয়, সুদূর ব্রহ্ম দেশে পাড়ি দিয়া। সমাজের নিকট অভয়া চিরদিনই শুনিয়াছিল—নারীর সতীধর্মের গৌরবের কথা, তাই এই সতীধর্মেরই আকর্ষণে আপনার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া সে জীবনে অবহেলাকেই সম্বল করিয়া লইল। হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা এবং চরম লাঞ্ছনার

মধ্যেও এই সতীধর্মের গৌরবেই তাহার রোহিণীদার নিঃস্বার্থ ভালবাসায় প্রতীক্ষার কথা তাহার মনের কোণে একবারও উদয় হয় নাই। কিন্তু এই অপূর্ব পতিপ্রেম, সতীত্ব এবং একনিষ্ঠতার অমোঘ পুরস্কার চিহ্ন লইয়া যেদিন তাহাকে গৃহ ত্যাগ করিতে হইল, অভয়া বুঝিল সতীর সমস্ত গৌরব তাহার নিকট ফাঁকা, ইহাকে মানিয়া লওয়া নীচতা এবং নির্লজ্জতা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়,—সেইদিনই সে সমাজের বিধিবদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিল! অভয়া তাহার রোহিণীদার সঙ্গে একত্রে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করিতেছে—শ্রীকান্তের নিকট সে তাহা অপকটে স্বীকার করিয়াছিল। অভয়া শ্রীকান্তের নিকট জানিতে চাহিয়াছিল, স্বামীর নিকট হইতে এইভাবে চলিয়া আসা তাহার অন্যায় হইয়াছে কিনা। সমস্ত শুনিয়া শ্রীকান্ত তাহাকে বলিয়াছিল,—"চ'লে আসাটা অন্যায় বলতে পারিনে, কিন্তু—।" শ্রীকান্তের মুখের এই 'কিন্তু'র অর্থ আমরা জানি। ইহা শরৎচন্দ্রেরই রক্ষণশীল অন্তরের কথা। ব্যক্তি সমাজকে অতিক্রম করিয়া যাইবে—ইহা তিনি কোনক্রমেই মানিয়া লইতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার সম্মুখের পথ, তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়াছিল—অন্নদা দিদি ও রাজলক্ষ্মী। ইহাদের দিকে চাহিয়াই তিনি সকল নারীর বিচার করিয়াছেন। তাই নারীর চিরাচরিত পথের বাহিরে—কাহারও পদচিহ্ন পড়িলে, ইহাতে তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিত না। কিন্তু তবুও নীচতা এবং হীনতাকে মানিয়া লওয়াই যে নারী জীবনের সার্থকতা ইহাও তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। শ্রীকান্তের উত্তরে অভয়া সঙ্কুচিত হয় নাই। শ্রীকান্তকে বাধা দিয়া সে বলিয়াছিল—"এই 'কিন্তু' এর উত্তরই তো আপনার নিকট চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ করচিনে, কিন্তু স্বামী যখন শুদ্ধমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বা'র করে দেন, তারপরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা, আমি সেই কথাই আপনার কাছে জানতে চাইচি। তিনিও আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করে ছিলেন। অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল, শুধু মেয়েমানুষ বলে আমারি উপর?" শরৎ-সাহিত্যের এ প্রশ্ন শুধু অভয়ার নয়, সকল নারীরই। সামাজিক বিধি-নিয়মের নিষ্ফলতার বিরুদ্ধেই নারীর এ বিক্ষোভ। অভয়া-জীবনে ইহা কিছুটা বিদ্রোহের আকার ধারণ করিলেও ইহাতে হিংসার তীব্রতা দেখি না।

অভয়া শ্রীকান্তের নিকট জানিতে চাহিয়াছিল,—"আমাকে সমাজ থেকে বা'র করে দিলে কি হিন্দু সমাজ বেশী পবিত্র হয়ে উঠবে?" বিদ্রোহী নারীহৃদয় তাহার শেষ মীমাংসায় আরও পৌছিয়াছিল, অতি শান্ত এবং সংযত ভাবেই; বিদ্রোহী জীবনের দুঃখ-দৈন্যকেই আপনার একমাত্র সম্পদ করিয়া অভয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল! অন্তরের সমস্ত বিদ্রোহাগ্নি লইয়াও সে সমাজের নিকটই আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল। শ্রীকান্তের নিকট সে জানাইয়াছে—"আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকবো।" শরৎ-সাহিত্যের সকল নারীই অভয়ার ধরণের। সমাজের বুকে নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিয়াও তাহারা প্রত্যাঘাত করিবার কল্পনাও মনে স্থান দেয় না; বরং অভয়া যতদূর অগ্রসব হইয়াছিল,—এতটুকু অগ্রসর হওয়াও কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। এইজন্য শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী বা বিপ্লবী নন। তিনি বৈপ্লবিক সাহিত্য গড়িবার চেষ্টাও করেন নাই। হিন্দু সমাজ আরও মহান আরও গরিয়ান হইয়া উঠুক, ইহাই তিনি চাহিয়াছিলেন। এইজন্যই সামাজিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন মাত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সাহিত্যাচার্য রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়াছেন, "সাহিত্য সৃষ্টি যে মানুষের পরিবর্তনশীল মানসলোকের উপর নির্ভর করে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই! মানব মনের এই ব্যাপক পরিবর্তন কখনও ধীর মন্থর গতিতে, কখনও দ্রুত গতিতে যায়। যখন সমাজমনের গতি ধীরে ধীরে কোনও এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিণতি লাভ করে, তখন মানবসমাজের অবচেতনা তাহাকে কোনও রূপে মানাইয়া লয়। আর যখন এই পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হয়, তখন সমাজ তাহাকে বিপ্লব আখ্যা দিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সমাজে রক্ষণশীলতা একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষার উপায়। যে সমাজে রক্ষণশীলতা যত বেশী সে-সমাজে বিপ্লবী সংস্কার তত বেগ লাভ করে। ইহাই নিয়ম।"

"সাহিত্যে এই নিয়ম সর্বত্র প্রতিফলিত দেখা যায়। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে যখন রোহিণী কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব হইল, তখন বঙ্গদেশের সমাজজীবন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, মহাশ্বেতার যুগ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, হীরা মালিনীর নির্লজ্জ চাতুরীও অচল হইয়া পড়িয়াছে। তার পরে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"র বিনোদিনী আমাদের বুঝাইয়া দিল যে, 'ভ্রমর'-ও এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত যে ভ্রমরচরিত্রের সমালোচনায় রক্ষণশীল সমাজ একদিন

শতমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, আধুনিক তরুণ সমালোচকগণ দেখিলেন, সে ভ্রমরের যুগ বহুদিন অতীত হইয়াছে, এখন সে চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে সত্যের স্পন্দন আর তেমন অনুভূত হয় না।"

এইজন্যই সাহিত্যে রক্ষণশীলতা বা প্রগতিবাদ উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। আজকের প্রগতিবাদ কালই রক্ষণশীলতায় পরিণত হইবে।

মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের চিত্র শরৎচন্দ্র অতুলনীয় নিষ্ঠার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। এখানে তিনি সত্যদ্রষ্টা। প্রাণবান বাঙ্গালী জীবনের প্রাণের কথা শরৎ-সাহিত্য-মুকুরে ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজই জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। তাহারাই প্রকৃত পক্ষে নানা প্রকার নিপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়া ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু তবুও এই সমাজ নানা প্রকার লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি পাইতেছে না। এইজন্য মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের জন্য শরৎচন্দ্রের সমবেদনা ছিল সুগভীর। এক অপূর্ব সহৃদয়তা লইয়া তিনি বাঙ্গালী জীবনের এই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। 'গুরুচরণ' চরিত্র বাঙ্গালী কেরানী সমাজের জীবন্ত প্রতিনিধি। সহজ অথচ নৈরাশ্যবাদী এই বৃদ্ধের দুঃখে শরৎ-সাহিত্যের পাঠক মাত্রই অভিভূত হয়। হেমাঙ্গিনী, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতির সর্বময়ী মাতৃত্ব, বিন্দুর দৃঢ়তা ও নারায়ণীর স্নিগ্ধতা, কাদম্বিনীর স্বার্থপরায়ণতা, নরেন্দ্রের উদাসীন নির্লিপ্ততা, গোকুল, যাদব, গিরীশ প্রভৃতির উদারতা, ত্যাগ-মহিমা, হরিশের নীচতা এবং স্বার্থপরতা এই সমাজে বিরল নয়।

শরৎ-সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য চরিত্রসমূহের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। পূর্বে অনেকেরই অভিযোগ ছিল যে, বাঙ্গালী জীবনে মহৎ কর্মের একান্ত অভাব। সুতরাং এই জীবন লইয়া কোন সার্থক সাহিত্য রচনা চলে না। প্রকৃতই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সৈনিক নয়, ব্যবসায়ী নয়, জমিদার নয়। দাতা হিসাবে দানশীলতায় খাতায় তাহার নাম নাই, সৈনিক হিসাবে বীরত্বের বড়াই করিবার মত তাহার কিছু নাই। সুতরাং এই অজ্ঞাত অখ্যাত কেরাণী জীবনকে লইয়া মহৎ সাহিত্য রচিত হইবে কেন,—ইহাই ছিল সেদিনকার ধারণা। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইলেন, বাঙ্গালী জীবনে আর কিছু না থাকিলেও বেদনার অশ্রু আছে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর অন্তঃপুর এই ব্যথাবেদনা দিয়াই গড়া। তাই এই ব্যথা বেদনার উপকরণ লইয়াই তিনি বাংলা সাহিত্যে এক অনুপম তাজমহল গড়িয়া তুলিলেন। শরৎচন্দ্রই প্রথম অনুভব করিলেন—বাঙ্গালী কর্মে বড় না হইলেও হৃদয়ে বড়। তাই বাঙ্গালীর

হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যে নারী চরিত্র সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি এবং ত্যাগ-মহিমায় উহা যে উজ্জ্বল তাহাও দেখাইয়াছি। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের মধ্যে অধিকাংশই অন্য-মনস্ক, উদাসীন এবং অনাসক্ত। আমরা বার্থিনকে দেখি—সে দিবারাত্র তাহার চিত্রাঙ্কনধ্যানে মগ্ন। সাধারণ জীবনযাত্রা, সংসারের সুখ-দুঃখের প্রতি 'বড়দিদির' সুরেন্দ্রনাথ, 'দত্তার' নরেন্দ্রনাথ বা 'কাশীনাথ' গল্পের কাশীনাথ কাহারও কোন আগ্রহ নাই। ইহারা সকলেই প্রায় আত্মনির্ভরশূন্য, সম্বল শুধু শিশুর সারল্য। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের চন্দ্রনাথ উদার, ধীর, 'বৈকুণ্ঠের উইলের' গোকুল, 'নিষ্কৃতির' গিরীশের চরিত্রও উদারতায় এবং ত্যাগ-মহিমায় উজ্জ্বল। 'দত্তায়' রাসবিহারীর স্বার্থপরতা এবং বিলাস বিহারীর নীচতা আমাদিগকে আঘাত করে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি না। শরৎ-সাহিত্যে ভোলানাথদের বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে; কিন্তু প্রতিপক্ষকে শরৎচন্দ্র শক্তিহীন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাংলার জাতীয় লেখক। বাংলার জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা, বাঙ্গালী জীবনের সকল ব্যথা বেদনা এই জন্যই তাঁহার সাহিত্যে এমন মূর্ত, জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু বাঙ্গালী বিধবা জীবনের দুঃখ নয়, শুধু বালিকা কুমারী জীবনের গ্লানি নয়, বাঙ্গালী সামাজিক জীবনের ঘৃণা বিদ্বেষও অপূর্ব সমবেদনায় মণ্ডিত হইয়া এখানে রূপ পাইয়াছে।

একশ্রেণীর সমালোচক বলেন, শরৎ-সাহিত্য পতিতাদের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় সমবেদনাশীল, সমাজপরিত্যক্ত এবং নির্যাতিতাদের প্রতি তিনি অত্যধিক সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। এ অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু সমাজ পরিত্যক্তাদের বা পতিতাদের শরৎ-সাহিত্যের অন্যান্য নারী হইতে আলাদা করিয়া দেখা চলে না। শরৎ-সাহিত্যে সকল নারীই তাহাদের বেদনার মধ্য দিয়া পাঠক চিত্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। পতিতা শ্রেণীর যাহারা শরৎ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে তাহারাও এই ব্যথা-বেদনা লইয়াই এখানে আসিয়াছে। অন্য কোনপ্রকার সহানুভূতি তাহারা এখানে আশা করিতে পারে না। শরৎ-সাহিত্য অন্নদা দিদির প্রতি সহানুভূতিশীল, কারণ অন্নদা দিদির জীবন সতীত্বের আদর্শের নিকট আত্মাহুতি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। ব্যথা-বেদনাই তাহার একমাত্র সম্বল। শরৎ-সাহিত্যে চন্দ্রমুখী বা বিজলী বাইজীর সম্বলও ইহার বেশী নয়।

প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্র মাতুলালয়ে অবস্থান কালে সমাজে নির্যাতিতাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়াছিলেন এবং এজন্য নিগৃহীতও হইয়া ছিলেন। তাই পরবর্তী সাহিত্যিক জীবনে এই ব্যথিত হৃদয়ের জন্য কিছুটা অশ্রু প্রার্থনা করিয়াছেন পাঠক শ্রেণীর নিকট, এই মাত্র। ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। শরৎচন্দ্র পতিতাদের অন্য নারী হইতে আলাদা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। শরৎচন্দ্র পতিতাদের কেবল মাত্র পতিতা বলিয়াই দেখেন নাই। শরৎচন্দ্র দেখিয়াছেন, সমাজের নিষ্ঠুর এবং হিংস্র কশাঘাতে ইহারা আহত এবং রক্তাক্ত। দোষ-গুণের বিচার না করিয়াই সমাজ ইহাদের তাহার গণ্ডীর বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাই এক অপূর্ব প্রাণভরা দরদ লইয়াই শরৎচন্দ্র সাহিত্যে ইহাদের চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন। আসলে শরৎ-সাহিত্যে পতিতা ইহাদের রূপ নয়, ইহারা সাধারণ নারী জীবনের একটা অংশ মাত্র।

সমগ্র শরৎ-সাহিত্য নারী সত্তার স্নেহ ধারায় পরিপুষ্ট, নারী এখানে পুরুষের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াও যেন মাতার মমত্ব লইয়াই পুরুষকে আশ্রয় দেয়। দেবদাসের প্রতি পার্বতীর এবং চন্দ্রমুখীর আচরণে, সুরেন্দ্রনাথের প্রতি মাধবীর আচরণে এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আচরণে আমরা ইহাই দেখি। সকল নারীই যেন শরৎজননী ভুবনমোহিনীর প্রতিরূপ, সকলেই উদার প্রাণ। কৃচ্ছ্র সাধনা, ত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতির ভিতর দিয়া সকলেই যেন পরিবারকে দুঃখ-যন্ত্রণামুক্ত এবং স্নিগ্ধ রাখিতে চায়।

শরৎ-সাহিত্যে দৈহিক সতীত্ব ও মানবিক মহত্ব সমার্থবাচক নয়। দেহের দিক হইতে চন্দ্রমুখী সতী নয়, দেহবিক্রয় তাহার উপজীবিকা। দেবদাসকে একান্ত ভাবে ভালবাসিবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সে এই পথ ত্যাগ করে নাই। সে যখন এই পথ ত্যাগ করিয়াছে দেবদাস অধঃপাতের পথে তখন অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। তবুও চন্দ্রমুখীকে আমরা হীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ তাহার মধ্যে এক নিষ্কলঙ্ক মানবহৃদয়কে দেখি, মানুষের জীবনের ব্যথা-বেদনায় যে অংশ গ্রহণ করিতে ছুটিয়া যায়, সে হৃদয় পরের দুঃখে কাঁদে, দুঃখীকে হাত ধরিয়া তুলিতে চায়।

শরৎ-সাহিত্যে বিজলী বাঈজীও সতী নয়। সত্যেনকে সে গঙ্গার ঘাট হইতে বারাঙ্গনা গৃহে আকর্ষণ করিয়াছিল; নানা খেলায় খেলাইয়া বড়শীতে গাঁথা মাছের মতই শেষ পর্যন্ত সে তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিল। শিকার হাতের মধ্যে পাইয়া নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন,

বিজলী বাইজীর এই রূপই সত্যিকার রূপ নয়। বিজলীর অন্তরে আছে এক বেদনার্ত মানব হৃদয়, যে হৃদয় ভালবাসিতে পারে এবং ভালবাসার পাত্রের নিকট হইতে আঘাত পাইলেও সে আঘাত সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যাঘাত করিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না, কারণ আঘাত যে করিয়াছে, সে যে তাহার ভালবাসার পাত্র। তাই আঘাত তাহার যত তীব্রই হউক না কেন, যত নিষ্ঠুরই হউক না কেন, সে যে মধুর হইয়া হৃদয়ে বাজে। সত্যেনকে ভালবাসিয়া বিজলী তাহার ঘৃণিত জীবনযাত্রা ত্যাগ করিয়াছিল। সত্যেনের আঘাতই তাহাকে প্রকৃত মানবতার পথের সন্ধান দিয়াছিল; সত্যেনের আঘাতকে একদিনের জন্যও সে আঘাত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পরবর্তী জীবনে বিজলী মহৎ, এমনকি যে সত্যেন তাহার পথের গুরু, তাহার মধ্যেও আমরা অতখানি মহত্ব দেখি না। এই জন্যই বাইজী রূপই শরৎ-সাহিত্যে বিজলীর একমাত্র রূপ নয়। বিজলীর এই বাইজী রূপ আমাদের আকর্ষণ করে না; কিন্তু তাহার পরবর্তী জীবন আমরা ভুলিতে পারি না।

রাজলক্ষ্মীও বাইজী। এমনকি শ্রীকান্তের সঙ্গে মিলনের পরেও তাহার বাইজী জীবনযাত্রা ঘুচে নাই, ইহা আমরা দেখি। রূপ ও দেহসৌন্দর্য বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিবার তাহার কোন প্রয়োজন তখন ছিল না। কিন্তু ইহা সত্বেও পিয়ারী বাইজী যেন পিয়ারী হইয়াই শরৎ-সাহিত্যের এক অখ্যাত কোণে পড়িয়া থাকে। রাজলক্ষ্মী যেন পিয়ারী বাইজী থেকে সম্পূর্ণ ভাবেই আলাদা। তাহার যেন আলাদা সত্তা এবং আলাদা অস্তিত্ব। নারী রূপে, রমণী রূপে সংসারে সকলের প্রতিই তাহার যে অসীম প্রীতি ও সহানুভূতি, তাহা পিয়ারী চরিত্রের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। রাজলক্ষ্মী, বিজলী বাইজী বা চন্দ্রমুখীর মধ্যে দৈহিক সতীত্ব কতটুকু আছে তাহা লইয়া নারীজীবনের এই সামগ্রিক কল্যান সাধনার বিচার করা চলে না।

শরৎ-সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার দুর্দম গতিবেগ। গতিহীন বাঙ্গালী সমাজে শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত নরনারীদল এমন গতিপ্রবাহ সৃষ্টি করে, যাহা পাঠক-চিত্তকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পাঠক ভাবিবার অবকাশ পায় না,—ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, নরেন্দ্র, রাসবিহারী, বিলাসবিহারী, বিজয়া, অন্নদা দিদি রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি নরনারীর দল কোথা হইতে আসিল এবং উপন্যাসের কর্মপ্রবাহ শেষে কোথায়ই বা আশ্রয় লইল। কিন্তু পাঠকের চিত্তপটে সকলেই এমন এক সুপরিস্ফুট রেখাপাত করে, যে চিহ্ন সহজেই মুছিয়া যাইবার নয়। শরৎ-সাহিত্যের এই দুঃসহ বেগ

অনেক ক্ষেত্রেই ভাবাবেগ ইহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু পাঠক চিত্তকে এই আবেগের নিকট মাথা নত করিতে হয়, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সর্বশেষে আমাদের প্রশ্ন, শরৎ-সাহিত্য কি অবাস্তব ? উত্তর শরৎচন্দ্র নিজেই দিয়াছেন—"আমার অঙ্কিত চরিত্রের শতকরা নব্বই ভাগই বুনিয়াদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।" তবুও আধুনিক বা অতি আধুনিক সাহিত্যে বাস্তব সাহিত্য বলিতে যা বুঝা যায়, শরৎ-সাহিত্য তাহা নয়। ১৩৩৩ সালের ২৬শে ফাল্গুন রবীন্দ্র-নাথের নিকট এক পত্রে শরৎচন্দ্র লেখেন—"আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হইয়াছে। তাতে দলে লোক আসে—সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই অর্থাৎ যেমন সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয় এতে লাভ কি ? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই এমনি। মাঝে মাঝে হয়তো অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও নিপুণ বর্ণনা থাকে—তার ভাষাও যেমনি, আড়ম্বরও তেমনি। কিন্তু মন খুশী হয় না। অথচ এরা বলে এই তো সাহিত্য।" বলা বাহুল্য শরৎ-সাহিত্য এই শ্রেণীর বাস্তব সাহিত্য নয়। শরৎচন্দ্রের—চরিত্রসমূহের বুনিয়াদ শতকরা নব্বইভাগ সত্য কিন্তু তবুও সত্যমাত্রই সাহিত্য নয়, একথা শরৎচন্দ্র নিজেও লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও ইহাই লিখিয়াছেন—সত্য ঘটনা কবিচিত্তে, সাহিত্যিকের চিত্তে যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যরূপ লইয়া দেখা দেয়, তাহাই সাহিত্য—'যা ঘটে' তা কবির রাজ্যে, সাহিত্য রাজ্যে সব সময়ে সত্য হয় না। যে ঘটনা ঘটে কবি মানসে তাহা নবসৃষ্টির রূপ নেয়, কবি কল্পনায় সৌন্দর্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহা পাঠকের মনোহরণ করে। কবির কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টি পাঠকের নিকট যতটা মনোহারী হইতে পারে, ততখানিই উহার সার্থকতা। বাস্তব বা অবাস্তব এখানে বিবেচ্য নয়। তবে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির ভিত্তি বা বুনিয়াদ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে। নতুবা পাঠক চিত্তকে ইহা আকৃষ্ট করিতে পারে না। এই দিক হইতে বিচারে শরৎ-সাহিত্য শুধু বাস্তব নয়, সার্থক রচনাও।

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ে মহা আড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী বলিয়াছেন, তিনদিন দুর্গাপূজার ব্যয় এক রাত্রিতে হইত। ভাগলপুরের সমগ্র অভিজাত সমাজ নিমন্ত্রিত।

বাড়ীর অন্যান্য তরুণদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র গেলেন পরিবেশন করিতে। হঠাৎ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ওকে বাহির করিয়া দাও, নতুবা আমরা এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইব। অগত্যা শরৎচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া নিমন্ত্রিতদের সম্মানই রাখিতে হইল। বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল মাতুলালয় হইতে বর্জিত হইলেন।

ইহার পশ্চাতে যে করুণ কাহিনী ছিল, তাহা দীর্ঘদিনের। উনবিংশ শতাব্দীর ভাগলপুর অনেকটা বাঙ্গালীরাই জঙ্গল কাটিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। এখানে বাঙ্গালী সমাজের প্রাধান্য ছিল খুবই বেশী। ইংরেজী শিক্ষার আগমনী গান আরম্ভ হইয়াছে। ফলে ভাগলপুর সমাজ সেদিনের বাংলাদেশের মতোই দুই দলে বিভক্ত—উদারপন্থী ও রক্ষণশীল। শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রক্ষণশীল দলের সমাজপতি। উদারপন্থীদলের নেতা ছিলেন শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিদ্যালয়েই শরৎচন্দ্র এবং বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা পড়িত। তাহারই অর্থ সাহায্যে ভাগলপুরে চলিয়া ছিল সঙ্গীত, সাহিত্য ও ব্যায়াম চর্চা; কিন্তু কেদার বাবুর দলে এ সমস্ত ছিল নিষিদ্ধ।

রামচন্দ্র মজুমদারের পুত্র রাজু বা শরৎ-সাহিত্যের ইন্দ্রনাথের সাহচর্যে আসিয়া শরৎচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—গৃহে প্রতিপালিত হইয়াও শিবচন্দ্রের ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং উদারপন্থী দলে যোগ দিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের নাট্যশালায় 'জনা' নাটকে 'জনা'র অভিনয় করিলেন, এমন কি শিবচন্দ্রের শ্যালক কান্তি পণ্ডিতের স্ত্রীর মৃত্যু হইলে শ্মশানে শবদেহ বহিয়া নিয়া দাহ করিয়া আসিলেন। এই সমস্ত দুষ্কার্য এবং কুকীর্তির কথা গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। নিষ্ঠুর শাসন আরম্ভ হইল বালকের উপর। কিন্তু কোন ফল হইল না। এই সময়ে জগদ্ধাত্রী

পূজার ব্যাপারটা সমস্ত ঘটনার উপর যবনিকা টানিয়া দিল। মাতুল গৃহে শরৎচন্দ্র পরিত্যক্ত হইলেন। অপমানিত শরৎচন্দ্র সেই রাত্রিতেই গৃহত্যাগ করিলেন এবং ইহার পর সন্ন্যাসী বেশে বহুস্থান ভ্রমণ করিলেন।

রক্ষণশীল সমাজের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া শরৎচন্দ্র সেদিন গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই কিছু রাখিয়াছেন শরৎ-সাহিত্যে, বাংলার ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য। (এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যে একদিকে আমরা দেখি—পতিত বা সমাজলাঞ্ছিতদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, আর ক্রূর কৌশলী ধর্মধ্বজী সমাজপতিদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ। আপন জীবনের অভিজ্ঞতাটুকুই শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক দরদে সিঞ্চিত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। ইহার জন্য শরৎ-সাহিত্যে আমরা পাই বঞ্চিত মানুষের কথা।) তিনি নিজেই এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন ঃ

"সংসারে যারা শুধু দিল কিন্তু পেলনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলনা সমস্ত থেকেও কেন তাহাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদেরই বেদনা দিল আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ কুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।"

শরৎচন্দ্র এখানে সত্যকথাই বলিয়াছেন। প্রকৃত শরৎ-সাহিত্য অন্তরের নিকট অন্তরের আবেদন, নিপীড়িত প্রাণের বাণী এ সাহিত্য আর একজনের প্রাণে পৌঁছাইয়া দেয় এবং সহানুভূতির বারি সিঞ্চনে ইহা প্রাণবন্ত ও মনোরম হইয়া উঠে। এইজন্যই শরৎ-সাহিত্য সমাজ-নিগৃহীতা বা পতিতাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

শরৎ-সাহিত্যে এই একটা প্রশ্নই বড করিয়া দেখা দিয়াছে—সমাজ যাহাদের চরম দণ্ড দিয়া সমাজের বাহিরে একদিন ঠেলিয়া দিয়াছে সমাজের আইনের বিধান তাহারা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া, সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে যাহারা বঞ্চনা ভিন্ন কোন কোন কিছুই পাইল না, সত্যই কি তাহারা অপরাধী? যে আইনে সমাজ তাহাদের দণ্ডিত করিল সত্যই কি সে আইনে কোন ত্রুটি নাই? শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু কোন জবাব দেন নাই। শুধু একটু সহানুভূতি, লাঞ্ছিতাদের প্রতি একটু দরদ ইহাই আমরা দেখি।) আর শুধু এইজন্যই শরৎ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের কতই না অভিযোগ।

এই অভিযোগ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'যে অপরাধে আমি সব চেয়ে লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ—পাপীর চিত্র নাকি আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে—আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন—এ ভাল কি মন্দ জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ বেশী হয় কিনা, এ বিচারও করে দেখিনি, শুধু সেদিন যাকে সত্য বলে অনুভব করে ছিলাম, তাহাই অকপটে প্রকাশ করেছি।

এতো গেল সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উক্তি। প্রকৃত সাহিত্য বিচার করেনা, বিশ্লেষণ করেনা, ভালমন্দ নির্ধারণ করিবার ভার সাহিত্যিকের উপর নয়। জীবনের যে বাণী তাহার মনের আনন্দলোকে আলোড়ন তুলিয়াছে, বহির্বিশ্বে তাহাকে প্রকাশ করিয়া অন্য দশজনের আনন্দের সম্পদ সৃষ্টি করাই তাহার কাজ। কিন্তু সাহিত্যিকের অন্তরে একজন মানুষও তো আছেন। তাহার নিকট আছে যুক্তি, আছে বিচার, আছে বিশ্লেষণ। এই মানুষ শরৎচন্দ্র বিচার করিয়াছেন তাহার নিজের উপন্যাসের। তিনি বলিয়াছেন—লোকে বলে পতিতাদের আমি সমর্থন করি। সমর্থন আমি করিনে, কিন্তু ঘৃণা করতেও মন চায় না। বলি, তারাও মানুষ। তাদের মধ্যে ত্যাগ আছে, মহত্ব আছে। আমি তো দেখেছি পতিতাদের মধ্যে কতো মহৎ চরিত্র। আবার পরম সতীকেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখিয়াছি।

শরৎ-সাহিত্যে পতিতা আর পতিতা নাই। তাহাদের অন্তরে চিরন্তন মানুষটিই এখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহাদের সম্পর্কে আরও লিখিয়াছেন—"মানুষের মধ্যে যে পশু আছে, কেবল তার অন্যায়, তারি ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে মানুষের বিচার করব, আর যে দেবতা সব দুঃখ, সব ব্যথা সব অপমান নিঃশব্দে বহন করেও আজ সস্মিত মুখে তারই ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন, তাকে বসতে দেবার জন্য আসন কোথাও পেতে দেবনা?"

জনৈক সমালোচক শরৎ-সাহিত্যের পতিতাদের বারাঙ্গনা, গৃহত্যাগিনী বিধবা, গৃহত্যাগিনী সধবা, নীরব প্রেমিকা এবং কুমারী—এই পাঁচ শ্রেণীকে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগ শরৎ-সাহিত্য অনুমোদিত কিনা সন্দেহ। এইরূপ বিভাগ শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। শরৎ-সাহিত্যে একটি মাত্র নারীই জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহারই অন্তরের বেদনা শরৎচন্দ্রের দরদী লেখনীমুখে অপূর্ব সাহিত্যিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া রূপ পাইয়াছে। তাই শরৎ-সাহিত্যে নারীর রূপ বড় নয়, তাহার বেদনাই

বড়। এই সাধারণ নারীরই একটি রূপ 'পতিতা', ইহাই—শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি।

শরৎ-সাহিত্যে পতিতাদের মধ্যে একজন 'আঁধারে আলোর' বিজলী বাইজী। বিজলী সমাজপরিত্যক্তা; সমাজকে সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া সমাজের আঙিনার বাহিরের আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। তাহার মধুময় রূপে যাহারা একবার মুগ্ধ হয়, ধন, মান, জীবন, যৌবন সকলই তাহারা জলাঞ্জলি দেয়। পতিতার সংস্পর্শে যাহারা আসে অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে তাহারা নামিয়া যায়। তাই এই পতিতার দল সমাজের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য। বিজলীর রূপের আগুনে পতঙ্গের মতই আকৃষ্ট হইল জমিদার পুত্র সত্যেন। বিজলীও আকর্ষণ-বিকর্ষণে তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দক্ষ মৎস্য শিকারীর মতই তাহাকে ডাঙ্গায় তুলিল। সত্যেন বিজলীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এমন কত হইয়াছে। পতিতা বারবনিতা গৃহে প্রথমে যাহারা আসে, তখন থাকে তাহাদের গোবেচারা ভাব, সমস্তই বাধো বাধো মনে হয়। কিন্তু দুই দিনেই এই অবস্থা কাটিয়া যায়। বিজলী তাহাই জানিত এবং সত্যেন্দ্র সম্পর্কেও তাহাই মনে করিয়াছিল। তাই নূতন শিকার লইয়া বারবনিতা মন তাহার খেলাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সত্যেন্দ্রের অন্তর হইতে এক সর্প হঠাৎ যেন ফণা উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল। বিজলী বাইজীকে সে চরম আঘাত হানিল। সে আঘাতে বিজলী মরিল; আর এক নূতন মানুষ বাহির হইয়া আসিল তাহারই মৃত জীবনের ভিতর দিয়া। নূতন বিজলী বাইজী যে-জগতে প্রবেশ করিল, সেখানে না আছে পতিতা জীবনের বিষ, না আছে কোন ক্লেদ। বিজলী তাহার পুরাতনকে ভুলিল। সত্যেনের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে এই নূতন জগতের সন্ধান দিল, সে সত্যেনকে আকর্ষণ করিল না। শুধু তাহার ভালবাসার রূপকে ধ্যান করিয়াই সে পুরাতন জীবনের কলুষ হইতে মুক্ত হইতে চাহিল।

বিজলীর এই নূতন জীবনের সন্ধান সত্যেন্দ্রনাথ রাখিত না। সমাজের বুকে ফিরিয়া সে জমিদারী পাইয়াছে ধন পাইয়াছে; স্ত্রী-পুত্র পাইয়াছে। কিন্তু বিজলী একদিন যে তাহাকে কলুষিত জীবনে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিল, একদিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, সে তাহা ভুলিতে পারে নাই। বিজলী তাহাকে আঘাত করিয়াছিল, সে আজ প্রত্যাঘাত করিয়া তাহার শোধ চাহিল। বিজলীর নিদারুণ দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া অর্থের বিনিময়ে তাহাকে গৃহে আনিয়া অপমান করিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত সত্যেনের রূপ ধ্যান করিয়া

বিজলী বাইজী যে আর এক লোকে প্রবেশ করিয়াছে! সত্যেনের দেওয়া মান-অপমান আজ সে হেলায় উপেক্ষা করিতে পারে। বিজলী আজ করিলও তাহাই। সত্যেনের দেওয়া আঘাত সে মাথায় তুলিয়া লইল। অনুষ্ঠান সে যথারীতি সম্পন্ন করিল এবং গৃহে ফিরিবার সময়ে সত্যেনের স্ত্রীর নিকট হইতে প্রেমাস্পদের একখানি ক্ষুদ্র ছবি চাহিয়া লইল। আজ এই ছবিই তাহার একমাত্র দেবতা। যাহার দেহাতীত রূপ ধ্যান করিয়া পাপজীবন সে হেলায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারই একখানি ক্ষুদ্র চিত্র সম্মুখে রাখিয়া ইহজীবনের সমস্ত কলুষতার আকর্ষণ হইতে সে মুক্ত হইতে পারিবে,—এ শক্তি আজও তাহার আছে! বিজলী বাইজীর এ আশা ব্যর্থ হইবার নয়, ইহা আমরা জানি। বিজলীর অন্তরের এই নিস্পৃহ প্রেম কি বিজলীকে মহীয়সী করিয়া তোলে নাই? তবুও কি বিজলী পতিতা? শরৎ সাহিত্যের ইহাই প্রশ্ন।

শরৎ-সাহিত্যে আর একজন পতিতা চন্দ্রমুখী। বিজলী বারাঙ্গনা, চন্দ্রমুখীও বারাঙ্গনা। বিজলী যেমন সত্যেনকে ভালবাসিয়া কলুষ জীবন হইতে মুক্ত হইয়াছে, চন্দ্রমুখীও তেমনি দেবদাসের স্পর্শ লাভ করিয়া ধীরে ধীরে মোহমুগ্ধ হইয়া একদিন ইন্দ্রিয়াতীত সত্য ও প্রেমের জগতে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজলী সত্যেনকে পাইয়াছিল ধ্যানে; কিন্তু চন্দ্রমুখী দেবদাসকে পাইল দেহ এবং মনে, প্রেমাস্পদকে সেবা করিয়া, সান্নিধ্য দিয়া সে ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহারই বারাঙ্গনা জীবনকে অবলম্বন করিয়া দেবদাস যখন কলুষতার গভীর পঙ্কে ধীরে ধীরে নামিতেছিল, চন্দ্রমুখী ব্যাকুল হইয়াছিল প্রেমাস্পদকে রক্ষা করিবার জন্য। বারাঙ্গনা জীবনের তীব্র হলাহল তাহাকে এ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু যে দেবদাসের প্রেম তাহাকে এই নূতন জীবনের সন্ধান দিল, চন্দ্রমুখী তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এই দিক দিয়া সমস্ত চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হইল। চন্দ্রমুখীর দেহ অবলম্বন করিয়া দেবদাস একদিন নামিয়াছিল কিন্তু চন্দ্রমুখী সেই দেবদাসকে অবলম্বন করিয়াই উঠিল। বারাঙ্গনা চন্দ্রমুখী মরিয়া নূতন চন্দ্রমুখী হইল। আজ সে সমাজকল্যাণকামী, শরৎ-সাহিত্য উদ্যানে শ্বেতশুভ্র পদ্ম। তবুও কি সে পাপিষ্ঠা, তবুও কি সে পতিতা?

শরৎ-সাহিত্যে আর একজন পতিতা রাজলক্ষ্মী। কাশীতে একবার মরিয়া রাজলক্ষ্মী বাইজী হইয়াছিল। শৈশবে এক ছড়া বৈঁচিমালা অবলম্বন করিয়া শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর যে প্রেমের জীবন শুরু হইয়াছিল, জীবনে নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়াও তাহা কেহ ভুলিতে পারিল না; অথচ সমাজের বিরুদ্ধ শক্তিকে

এই শ্রীকান্তই একদিন বলিয়াছিল—"মানুষ ত কেবল তার দেহটাই নয়। পিয়ারী নাই, সে মরিয়াছে। কিন্তু একদিন যদি তার ওই দেহটার গায়ে কিছু কালি লাগিয়াই থাকে সেটুকুই কি কেবল বড় করিয়া দেখিব, আর যে রাজলক্ষ্মী তাহার অপরিমিত দুঃখের অগ্নি পরীক্ষায় পার হইয়া আজ অকলঙ্ক শুভ্রতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে মুখ ফিরাইয়া বিদায় দিব ?"

আমরা জানি, এ অভিযোগ শ্রীকান্ত বা শরৎচন্দ্রের একার নয়, শরৎ-সাহিত্যের পাঠক সমাজের ইহাই অভিযোগ। সমাজের নিষ্ঠুর অভিশাপে শত শত রাজলক্ষ্মী শত শত শ্রীকান্তের মিলন প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হইতেছে। শতদলশুভ্র হৃদয় লইয়াও রাজলক্ষ্মীর দল আজও সমাজে পতিতা। সমগ্র জীবন সমাজ-কল্যাণের বেদীমূলে বলি দিয়াও লাঞ্ছনা হইতে যাহারা মুক্তি পাইল না, কোন্ এক অজানা শৈশবে, সামান্য কি ভুল করিয়া বসিল, জীবনে তাহাই সত্য হইয়া রহিল—সমাজের এ নিষ্ঠুর বিধান কেন ?

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেই চরিত্রহীন ; কিন্তু ইহাদের সকলের চরিত্রে এমন এক-একটি দিক আছে, যাহাতে তাহারা সমাজের সাধারণ নরনারীর বহু ঊর্ধ্বে স্থান পাইতে পারে। তথাকথিত অনেক চরিত্রবান অপেক্ষাই ইহারা অধিকতর চরিত্রবান।

আত্মীয় ভুবনমোহনের প্ররোচনায় সাবিত্রী একদিন সমাজের আবেষ্টনী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং সাবিত্রীও সমাজের দৃষ্টিতে পতিতা। কিন্তু স্নেহে, প্রেমে, উদারতায় এবং আত্মত্যাগে এই মহীয়সী রমণী আপনার যে পরিচয় শরৎ-সাহিত্যে রাখিয়া গেল সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। একদিন সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, উহাই সমাজের নিকট বড় হইয়া রহিল সাবিত্রীর হৃদয়ের অতুলনীয় গুণাবলীর কানাকড়ি মূল্যও সমাজের নিকট নাই ইহাই আমরা দেখি।

পটলডাঙ্গা মেসে আমরা সাবিত্রীকে প্রথম দেখি। মেসের সে সর্বময় কর্ত্রী, স্নেহ-যত্নে সে সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছে। সমাজের বাহিরে আসিয়া এবং মোক্ষদা প্রভৃতির সঙ্গে ভদ্র বিবর্জিত পারিবেশে বাস করিয়াও সে নিরামিষ আহার করে, একাদশী পালন করে এবং মেসে দাসী বৃত্তি করিয়া আপনার জীবিকা নির্বাহ করে। বিজলী, পিয়ারী বা চন্দ্রমুখীর মত দেহকে পণ্য সাজাইয়া সে ঐশ্বর্যময়ী হইতে চাহে নাই। কোন সামাজিক দাবী তাহার নাই, অভাবও তাহার বেশী নয়। জীবন তাহার সমারোহপূর্ণ নয়, সমারোহ সে এক-দিনের জন্যও চাহে নাই। সতীশকে সাবিত্রী ভালবাসিয়াছিল, সে ভালবাসার

কোন তুলনা হয় না। অথচ এই সতীশই যতবার তাহাকে আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছে ততবারই সাবিত্রী তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। প্রিয়তমকে অনেক সময়ে এজন্য নির্মম আঘাত করিতে হইয়াছে, এবং সে আঘাত সতীশ অপেক্ষা সাবিত্রীকেই বাজিয়াছে বেশী। হৃদয় তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অশ্রুহীন চোখে হৃদয়ের অসীম বেদনা সে সহ্য করিয়াছে প্রিয়তমেরই মঙ্গলের জন্য। একদিন সমাজ ত্যাগ করিয়া সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া সমাজের দৃষ্টিতে সে ভ্রষ্টা হইয়াছে; আজ তাহাকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমের জীবন কলুষিত হউক, সমাজের দশজনের দৃষ্টিতে তাহার প্রিয়তম হেয় হউক, সাবিত্রী ইহা চাহে নাই। নিজের স্বর্গসুখের বিনিময়েও সতীশের এই অধঃপতিত চিত্র সাবিত্রী কল্পনা করিতে পারিত না। এইজন্যই আমরা দেখি, সাবিত্রীর জীবনে ভোগ-লিপ্সা নাই। সে জানে, যথার্থ প্রেম প্রিয়তমকে শুধু নিকটেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়। সাবিত্রীর অন্তরের এই যথার্থ প্রেমই তাহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছে।

সতীশকে ভালবাসিয়া সাবিত্রী আপনার সবকিছুই নিঃস্বার্থভাবে বিলাইয়া দিয়াছিল, শুধু দিতে পারে নাই আপনার দেহটাকে। কারণ, ঐ দেহটাকে সে অপবিত্র মনে করিয়াছে। সুতরাং আপনার একান্ত উপাস্য দেবতার পূজা অশুচি উপাচারে চলে না, ইহাই সে জানিত। সাবিত্রীর আত্মত্যাগের কোন তুলনা হয় না। যেদিন দেখি সরোজিনীর সঙ্গে সতীশের বিবাহ দিয়া সমাজে সে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল—প্রশ্ন আসে, সমাজে পতিতা নারীর ইহা আত্মত্যাগ, না হৃদয়হীন সমাজের পায়ে আত্মবলি? সতীশকে সরোজিনীর নিকট সমর্পণ করিয়া শূন্যহৃদয়ে আজ সাবিত্রী কোথায় দাঁড়াইবে সমাজ তো একবারও তাহা ভাবিয়া দেখিল না।

সমাজের দৃষ্টিতে কিরণময়ীও চরিত্রহীনা, পতিতা। আমরা দেখি, কিরণময়ী শুধু সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করে নাই, সমাজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহও করিয়াছে। কিরণময়ীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহজ সরল—অথচ তীব্র আত্মানুভূতি রমণী-চরিত্রে বিরল। শরৎ-সাহিত্যের কমল ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল নারীই সামাজিক অবিচারকে অবিচার মনে করিয়াও তাহার নিকট মাথা নত করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত সকল বিরোধের অবসান করিয়াছে অশ্রুজলে, কিন্তু কিরণময়ী সে পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই। আমরা দেখি, এই অমিত শক্তিশালী নারী সমাজের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্রোহ করে নাই, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নাই, প্রচলিত ধর্ম ও সমাজকে ব্যঙ্গ ও

করিয়াছে; অন্য দশ জনের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্বকেও সে পদদলিত করিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিরণময়ী আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কারণ, আপন শক্তির দম্ভে অহঙ্কারের মত্ততায় যে খেলায় সে মাতিয়াছিল, নারীর পক্ষে সে মারাত্মক খেলা। একদিন ইহার ভয়ঙ্করতা তাহাকে বুঝিতেই হইল এবং ইহা বুঝিতে পারিয়াই সে ফিরিল। তাই কিরণময়ীর সমগ্র ইতিহাস ব্যর্থতারই ইতিহাস, তীব্র যাতনার ইতিহাস, আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে তিল তিল মরণের ইতিহাস।

ছেলেবেলায় কিরণ অনাত্মীয় ঘরে মানুষ হইয়া ততোধিক ছেলেবেলায় স্বামী-ভবনে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীগৃহে সে একদিনের জন্যও ভালবাসা পায় নাই। শুধু স্বামীর নিকট পাইয়াছে বিদ্যার্জনের শিক্ষা, শাশুড়ীর নিকট পাইয়াছে নির্যাতন। তাই সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জগৎ হইতে সে ছিল চির-নির্বাসিত।

একদিন পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া এই নিরুপমা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী যখন আপনার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এক শুষ্ক কঠোরতা ভিন্ন সে অন্য কিছুই দেখিতে পাইল না। পাথুরিয়াঘাটার নিরন্ধ্রগৃহে বন্দীদশা তাহার নিকট অসহনীয় মনে হইল, মুক্তির সহজ পথ না দেখিয়া সে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াই বাহির হইতে চাহিল।

হঠাৎ একদিন কিরণময়ী দেখিতে পাইল—রূপ, যৌবন নারীর বিকাশের পক্ষে যাহা সহায়, কোন কিছুরই তাহার নিজের মধ্যে অভাব নাই। যৌবনের রূপ তাহার সর্বাঙ্গ উপচিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কে সে প্রিয়তম, যাহার পায়ে সে এই অপরিমিত ঐশ্বর্য উপহার দিবে? ভোগতৃষ্ণা তাহার প্রবল হইল, কিরণময়ী এক আকণ্ঠ পিপাসা অনুভব করিল। এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কিরণময়ী নর্দমার ঘোলা জল দিয়াই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চাহিল, সে মনজ ডাক্তারকে আপনার প্রেম নিবেদন করিল। কিন্তু আমরা দেখি, দৈহিক ক্ষুধা কিরণময়ীর অন্তরে কখনও প্রবল হইয়া উঠে নাই, এমন কি সুদীর্ঘ বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা অন্তরের মধ্যে জমাট বাঁধা থাকা সত্ত্বেও নয়। তাই উপেন্দ্রকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল, মুহূর্তমধ্যে মনজ ডাক্তারকে আপনার চতুষ্পার্শ্ব হইতে মুছিয়া ফেলিল। উপেন্দ্রের সাম্য মূর্তিই কিরণময়ীকে আকর্ষণ করিল। কিরণময়ী ভালবাসিয়াছিল—উপেন্দ্রের শান্ত উদাসীনতাকে, তাঁহার পরিপূর্ণ মহত্ত্বকে, তাহার দেহকে নয়। এখানেই পাইল সে জীবনের প্রথম শান্তির অপূর্ব আস্বাদ। জীবনের এই প্রথম মধুর স্পর্শ তাহাকে মাতাল করিয়াছিল, তাই উপেন্দ্রের নিকট ইহা না জানাইয়া সে পারে নাই। অকপটে হৃদয়কে ব্যক্ত করিয়া এক অপূর্ব তৃপ্তি অনুভব করিতে সে গিয়াছিল;

উপেন্দ্রের নিকট প্রেমনিবেদন করিতে সে যায় নাই, এবং সে উদ্দেশ্যও তাহার ছিল না। কিরণময়ীর মধ্যে যে অপূর্ব শক্তি, সেই শক্তিবলেই সে আপনাকে অমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু উপেন্দ্র তাহাকে ভুল বুঝিল।

উপেন্দ্র ছিল নেহাৎ ভালমানুষ। মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। একজন যাহাকে ভালবাসিবে আর একজন তাহাকে ভালবাসিতে পারিবে না,—এ ছিল তাহার শেখা কথা। সুরবালা তাহাকে ভালবাসে। পাছে তাহার একাধিপত্য নষ্ট হয় এইজন্যই সে আপনার বিবেকের দ্বারে এক সজাগ প্রহরী বসাইল। উপেন্দ্র বুঝিয়াছিল দেহের লালসাই কিরণময়ীর একমাত্র কাম্য। এইজন্যই সে দিবাকর ও কিরণময়ীর স্নেহ-ভালবাসার সহজ সম্বন্ধকে সন্দেহ করিয়া বসিল।

আমরা দেখিয়াছি, দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়ীর হাসিঠাট্টা অনেক সময় রুচির সীমা অতিক্রম করিত। ইহার প্রভাব দিবাকরের উপর যাহাই হউক না কেন, ইহার কদর্যতা কিরণময়ীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিরণময়ী ছিল আপন শক্তিতে ভরপুর, তাই দিবাকররূপী—এই অসহায় জীবটিকে লইয়া সে একটু আমোদ করিত মাত্র! সংসারানাভিজ্ঞ গোবেচারা তাই তাহার হাসিঠাট্টার পাত্রই ছিল। আমরা জানি, দিবাকরের প্রতি কিরণময়ীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না এবং এই শ্রদ্ধা ব্যতীত প্রণয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না,—ইহাও আমরা জানি। কিন্তু অন্ধ উপেন্দ্র ইহা দেখিতে পায় নাই ; তাই কিরণময়ীর প্রতি তাহার বিচারও নির্ভুল হয় নাই।

কিন্তু উপেন্দ্রের এই ঔদ্ধত্য কিরণময়ী সহ্য করিতে পারিল না। সে উদ্যত ফণা তুলিয়া উপেন্দ্রকে আঘাত করিল। উপেন্দ্রকে সে জানাইয়াছিল দিবাকর সংক্রান্ত সমস্ত ধারণা তাহার ভ্রান্ত—'সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত মিথ্যে, ছিঃ ছিঃ এত ছোট তুমি আমাকে পারলে ভাবতে?' কিন্তু ইহা সত্ত্বেও উপেন্দ্র তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। কিরণময়ীকে সে তীব্র ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাই আহত হইয়াই সর্প এবারে প্রত্যাঘাত করিয়া বসিল। ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় কিরণময়ীর ছিল না। সুবুদ্ধি এবং সুবিচার পরে একদিন উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ফিরিবার সময় তখন আর ছিল না।

আরাকানে দিবাকরকে লইয়া কিরণময়ী ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। অবোধ অপরিণামদর্শী এক তরুণকে সে ভালবাসার মোহে প্রতারিত করিয়া তাহাকে তাহার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

আরাকানে দিবাকর একদিন কিরণময়ীর নিকট জানিতে চাহিয়াছিল, কেন সে তাহাকে ভালবাসিতে পারে নাই। ইহার উত্তরে কিরণময়ী বলিয়াছিল—"কে বললে বাসিনি? বেসেছিলুম বৈকি! কিন্তু বয়সে আমি বড়, তাই যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেইদিন থেকে তোমাকে ছোট ভাইটির মত ভালবেসেছিলুম। তাই ত' এই ছ'টা মাস নিজের ছলনায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। তোমার চোখের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায়, লজ্জায় কেমন করে শিউরে উঠে, তা কি একদিনও বুঝতে পারো নি ঠাকুরপো?" কিরণময়ীর এই স্নেহই দৈহিক আকর্ষণ মনে করিয়া দিবাকর প্রতারিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিণতি যে ইহার এমন ভয়াবহ হইবে, তাহা এই বুদ্ধিমতী নারীও সেদিন বুঝিতে পারে নাই।

কিরণময়ীর অপরিসীম বুদ্ধি তাহাকে অন্য নারী হইতে পৃথক করিয়াছিল। সাধারণ নরনারীর মধ্যে যে অন্ধ বিশ্বাস সংস্কাররূপে কাজ করে, স্বামীর শিক্ষার ফলে কিরণময়ীর মধ্যে তাহার বাষ্পটুকু মাত্র ছিল না। আমরা তাহাকে বলিতে শুনি—"আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে—স্বর্গ, নরক ওসব কিছুই মানিনে—ও-সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে।" বুদ্ধিমতী বিদুষী নারী তাহার শিক্ষার ফলে বুঝিয়াছিল—যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই সত্য, ইন্দ্রিয়াতীত জগতে কোন সত্য থাকিতে পারে—এ ধারণা তাহার হয় নাই। এই জন্যই এবং এই ধারণা লইয়াই সে উপেন্দ্রকে আঘাত করিতে গিয়াছিল। কিন্তু মাত্র ছয় মাস পরে উপেন্দ্রের মরণাপন্ন অসুখের সংবাদ পাইয়া সে আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই। সতীশের মুখে এ সংবাদ শুনিয়া কিরণময়ী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে আপনাকে ভুলিয়া গেল। তাহার উদ্যত ফণা মুহূর্তমধ্যে নত হইয়া গেল। সমস্ত অহঙ্কার ভুলিয়া, লজ্জা, ঘৃণা মাথায় করিয়া সে উপেন্দ্রের রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা জানি, একমাত্র উপেন্দ্রের জন্যই সে এই হীনতা, এই অপমান সহ্য করিয়া ছিল। যে সমাজকে একদিন সে ব্যঙ্গ করিয়া, উপহাস করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া এবং আঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, উপেন্দ্রের অমঙ্গল কানে শুনিয়াই সে তাহার নিকট আসিয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। তাহার অমিত বুদ্ধি এবং অপরিসীম বিদ্যা এ পথে তাহার অন্তরায় হইল না।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই আত্মসমর্পনের পরেও সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিল

না। আমরা জানি, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে শরৎচন্দ্র কখনও ক্ষমা করেন নাই। সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের দ্বন্দ্বে শরৎচন্দ্র নারীকে কখনও জয়ী হইতে দেন নাই। মনে হয়, সমাজের উমেদারীর বোঝা কাঁধে লইয়াই তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন।

শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি, সহনশীলতাই নারীর ধর্ম। চিরকালের সীতা সাবিত্রী সে, তাই শত প্রকার নির্যাতনের মধ্যেও তাহাকে নীরব থাকিতে হইবে। এই সহনশীলতাই এখানে কৃতিত্ব। কিন্তু কিরণময়ী এই পথ ধরিয়া তাহার জীবনপথে অগ্রসর হয় নাই। জ্ঞান এবং বুদ্ধির নির্দেশই কিরণময়ীকে পরিচালিত করিয়াছে। এইজন্যই সমাজের দেওয়া অবিচারকে, অত্যাচারকে সে মাথা পাতিয়া আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

কিরণময়ী একদিন উপেন্দ্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—ভালবাসা অন্ধ—একথা সত্য কিনা। উপেন্দ্র উত্তর দিয়াছিল—এটা সত্য বই কি? অনেকের অভিজ্ঞতাই তো প্রবাদ বচন। কিরণময়ী তখন তাহার নিকট বলিয়াছিল—"তা যদি হয়, কাণা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়। তার জন্য দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালর চেষ্টা করে। কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্তে পড়ে, কেউ ত তুলে ধরতে আসে না? বরং আরও হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে সেই গর্তে মাটি চাপা দিতে চায়।"

কিরণময়ী জানিতে চাহিয়াছিল, যে সত্য মানুষ প্রচার করে, প্রয়োজনের সময়ে কেন সে তাহার কোন মর্যাদাই রাখে না। আমরা জানি, এ প্রশ্ন শুধু কিরণময়ীর একারই নয়, শরৎ-সাহিত্যের সমস্ত পাঠক সমাজের।

আমরা জানি, জীবনে সার্থকতার পথই কিরণময়ী খুঁজিয়াছিল। এই পথে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত একা উপেন্দ্র। উপেন্দ্রের নির্দেশ মাথায় তুলিয়া লইতে পারিলে তরঙ্গ-সংকুল সংসার-সাগরে পাড়ি জমাইতে তাহার আর কোন অন্তরায়ই থাকিত না। কিন্তু উপেন্দ্রের ভ্রান্তবুদ্ধির জন্যই ইহা সম্ভব হইল না। স্বাভাবিক বিকাশের পথ কিরণময়ীর নিকট উন্মুক্ত হইল না। তাই অপরিণামদর্শী বুদ্ধি তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার মত দুর্দাম বেগে দুই কূল ভাঙ্গিয়া লইয়া চলিল। অন্তরে তাহার প্রবল শক্তি ফল্গুধারার মতই প্রবাহিত হইতেছিল। স্বাভাবিক সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত না দেখিয়া ধ্বংসের পথই সে বাছিয়া লইল। অন্তরের প্রবল শক্তি তাহার নূতন সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারিত কিন্তু সমাজের প্রতিরোধে তাহা ধ্বংসের কার্যেই নিয়োজিত হইল। কিরণময়ী

নিজে ডুবিল, দিবাকরকেও ডুবাইল। ধূমকেতুর মত একটা অনাসৃষ্টি করিয়া সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত সৌন্দর্যকে কলুষিত করিয়া দিল।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কি একা কিরণময়ী? কিরণময়ীর জীবনের এ অশুভ পরিণতিতে আর কাহারও কি কোন দায়িত্ব নাই?

শরৎ-সাহিত্যের আর একজন পতিতা কমললতা। শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনে তাহার কমললতা নূতন করিয়া সুর যোজনা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। কমললতার সঙ্গে আমাদের এবং শ্রীকান্তেরও প্রথম পরিচয় মুরারিপুর আখড়ায়। তাহার পরিচয় দিয়াছিল নবীন। নবীন বলিয়াছিল, কমললতা দেখিতে ভাল, গান জানে ভাল, তাহার কথা শুনিলে লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। কন্ঠি-বদল করা স্বামীত্বের দাবী লইয়া একব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল মুরারিপুর আশ্রমে—তাহার নিকট আমরা শুনি, তাহার আসল নাম কমললতা নয়; নাম ছিল তার ঊষাঙ্গিণী, বাড়ী তাহার শ্রীহট্ট জিলায়। কমললতা নিজেই তাহার জীবনেতিহাসের পাতা কয়টি শ্রীকান্তকে উল্টাইয়া দেখাইয়াছিল। আমরা দেখি, পাতাগুলি কলঙ্ককালিমালিপ্ত; তার গাঢ় মসীরাশি ভেদ করিয়া প্রকৃত কমললতাকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। পরিচয় দিয়াছিল একদিন শ্রীকান্ত নিজেই—"ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব কবি-চিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দে মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষায় ক্রটী অনেক, কিন্তু ওর বিচার সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাদের দেওয়া কীর্তনের সুর, মর্মে যাহার পশে, সেই শুধু তার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশের লালরঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই, কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।"

সকলের আড়ালে থাকিয়া, সকলের অগোচরেই মুরারিপুর আশ্রমের সকল গুরুভার কমললতা একাকী বহন করিত। সকল ব্যবস্থায়, সকলের উপরেই তাহার ছিল কর্তৃত্ব। স্নেহে, সৌজন্যে এবং সবিনয় কর্মকুশলতায় এই কর্তৃত্ব ছিল সহজ শৃঙ্খলায় প্রবাহমান। কমললতার এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাগুণেই আশ্রম-জীবনে ঈর্ষা-বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনা কোথাও জমিতে পারিত না; ইহা শরৎচন্দ্রই আমাদের জানাইয়াছেন। আমরা দেখি, আশ্রমপ্রাণ এই নারী আপন স্নেহ-প্রেমে সকলকেই সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল, দুঃখের সামান্য কাঁটাটিও সকলের মঙ্গলের পথ হইতে সে দূরে রাখিতে চাহিত, বিমর্ষতার সামান্য বাষ্পটুকুও তাহার নিঃশ্বাসে দূর হইয়া যাইত।

একদিন এই মুরারিপুর আশ্রমও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেও অপরকে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য। কমললতা বুঝিয়াছিল, জহর তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসার প্রতিদান সাধ্যাতীত, তাই এই নিরীহ নির্বিরোধ লোকটির অনন্ত দুঃখের কারণ না হইয়া আশ্রমত্যাগই সে সমীচীন মনে করিয়াছিল। কিন্তু এ তাহার কতবড় দুঃখ, কতবড় শাস্তি, তাহা কমললতা ভিন্ন অন্য কেহই হয়ত সেদি·' উপলব্ধি করিতে পারে নাই। হয়ত শ্রীকান্ত কিছুটা বুঝিয়াছিল, কারণ একমাত্র শ্রীকান্তকেই সে তাহার ব্যথিত জীবনের গোপন অশ্রুর অংশ দিতে পারিয়াছিল। যাবার দিনে শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কমললতা, তোমার কষ্ট হয় না?" কমললতা উত্তর করিয়াছিল, "জানই তো সব। আবার জিজ্ঞেস করচ কেন?" ইহার কারণ মুরারিপুর আখড়ায় সঙ্গে কমললতার গ্রন্থি কেবলমাত্র একটাই নয়। গ্রন্থি ছিল তাহার আশ্রমের অধিকারী দ্বারিকাদাসের সঙ্গে, গ্রন্থি ছিল পদ্মার সঙ্গে, গ্রন্থি ছিল আশ্রমের বৃক্ষলতার সঙ্গে, গ্রন্থি ছিল আশ্রমের আকাশ এবং বাতাসের সঙ্গেও। এই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কমললতা সেদিন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতেই চলিয়াছিল। ছিন্নমূল কমললতা ইহার পরে যে শুকাইয়া মরিবে সে সম্পর্কে কোন সংশয়ই আমাদের নাই। কিন্তু ইহাও জানি যে, এই কমল শ্রেণীর লতার ইহাই স্বভাব। চলার পথে যাহাকে পায় তাহাকেই ইহারা জড়ায় কিন্তু নিজের বাঁচিবার রস সংগ্রহ করিবার জন্য নয়; নিজ দেহ হইতে রস দিয়া তাহাদের সঞ্জীবিত করিবার জন্য। নিজের বাঁচিবার কোন দাবীই ইহারা রাখে না কাহারও ওপর। তাই সকলের চলার গতিতে যখন ইহারা দলিত-মথিত হয়, তখনও সমানভাবেই স্নেহধারা বর্ষণ করে।

মুরারিপুর আশ্রম হইতে কমললতা একদিন নিজেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল। আপনাকে সে গোবিন্দজীর চরণেই দাসী করিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ও কি ইহাই চাহিয়াছিল? ইহাই কি তাহার সার্থকতার পথ? একদিন কিন্তু সে শ্রীকান্তকে নিয়াই এই পথে বাহির হইতে চাহিয়াছিল। শ্রীকান্তকে নিয়াই তাহার ঠাকুর পূজা এবং দেবদেবীর আরাধনা আরও সার্থক এবং আরও মহিমান্বিত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এ সার্থকতা যে তাহার ভাগ্যে মিলিলনা, তাহাও আর একজনের স্বার্থরক্ষার জন্যই। কমললতা শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছিল। সে ভালবাসার মধ্যে কোন আবিলতা ছিলনা, কোন কালিমা ছিল না। গতজীবনের সমস্ত আবর্জনা, সমস্ত ময়লা ধুইয়া দিয়াছিল যতীন তাহার

আপন জীবন দিয়া। তাই কমললতা এত নিঃসঙ্কোচেই আজ শ্রীকান্তর নিকট প্রণয় নিবেদন করে। বেশ পরিষ্কার ভাষায়ই সে শ্রীকান্তকে কহিল—সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেচো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশী এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসেনা।"

কমললতা শ্রীকান্তকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু প্রতিদানে সে কিছুই চাহে নাই। কোন দাবীই তাহার ছিলনা। কিন্তু তবুও এপথেও তাহার সার্থকতা মিলিলনা। বাধা হইল রাজলক্ষ্মী। শ্রীকান্তের নিকট কমললতার গল্প শুনিয়াই সে ভীত হইল। শ্রীকান্তকে 'বদলে ভেঙ্গে গড়ে' তুলিতে চাহিল, যাহাতে 'কমললতা দিদি আর যেননা কোনদিন দাবী করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে।" শুধু ইহাই নয়; কমললতার কল্পিত দাবী হইতে আপনার জিনিসটিকে রক্ষা করিবার জন্য সে ছুটিয়া গিয়াছিল মুরারিপুর আশ্রমে। রাজলক্ষ্মী বুদ্ধিমতী, প্রখর বুদ্ধিবলেই সে কমললতা ও শ্রীকান্তের মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি করিল এবং অতি সহজেই সে এই ব্যবধানের মধ্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। মুরারিপুর আশ্রমে গিয়া রাজলক্ষ্মী কমললতার ছোট বোন সাজিল এবং ছোট বোনের অধিকারেই শ্রীকান্তকে সে স্নেহাশীর্বাদ মাগিয়া লইল। কিন্তু স্বার্থপর সে; এই আশীর্বাদ আর একজনের বুকে যে কতখানি বাজিল, ইহা সে দেখিয়াও দেখিল না।

কমললতা জানিত, শ্রীকান্তরূপী রসাল বৃক্ষে তাহার আশ্রয় মিলিবে না; বৃক্ষসংলগ্ন হইবার সৌভাগ্য সে চাহে নাই। শুধু দূর হইতে তাহার বাষ্প আহরণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সেখানেও সে বঞ্চিত হইল।

রাজলক্ষ্মীর জীবনে কিন্তু কমললতা ব্যর্থ নয়। রাজলক্ষ্মীর পরিপূর্ণতার যে ছবি আমরা শেষে দেখি, সেখানে সে সত্যই কল্যাণী। শ্রীকান্তর নিকট আমরা শুনি, "দিশাহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সফল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত কল্যাণ যেন দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরিতৃপ্তির ছায়া।" কিন্তু এই শান্তি ও পরিতৃপ্তি রাজলক্ষ্মী কোথায় পাইল? আমরা জানি, মুরারিপুর আশ্রমে কমললতার নিকট হইতেই সে ইহা লইয়া আসিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর জীবনে এতদিন ইহারই অভাব ছিল। তাহার সন্তর্পণ সতর্ক দৃষ্টি এইজন্যই এতদিন শ্রীকান্তকে আকর্ষণ করিলেও বাঁধিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মী তাহাকে সমস্ত দিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে নাই।

সে চাহিয়াছিল, যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু মহৎ তাহা দিয়াই ভালবাসার দেবতার পূজা করিতে। এইজন্যই যাত্রাপথে শ্রীকান্ত এবং রাজলক্ষীর মিলিত জীবনের গতি কখনও স্বচ্ছ সাবলীল এবং সহজ হইয়া উঠে নাই। লক্ষীর সেবা এবং ভালবাসা শ্রীকান্তকে আকর্ষণ করিলেও কিছুদিন পরেই সে খুঁজিত মুক্তির পথ। আর রাজলক্ষীও সহজ পথের সন্ধান না পাইয়া আপনাকে ডুবাইয়া দিত গঙ্গাস্নানে, দেবদেবীপূজা ও ব্রত পার্বণের মধ্যে। কিন্তু কমললতার নিকটই রাজলক্ষী প্রথম শিখিল, কেবলমাত্র বাছা ফুলেই দেবতার পূজা হয় না। আপন মঙ্গল-অমঙ্গল সকল প্রকার অর্ঘ্য নিবেদন করিলেই তবে প্রেমের দেবতার পূজা সিদ্ধ হয়।

সকলের জীবনের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম প্রয়োজন মিটাইয়া কমললতা শ্রীকান্তের জীবনের নিকট বিদায় লইয়া কোন এক সুদূর বৃন্দাবনে পাড়ি জমাইল। তাহার বুক ফাটা ক্রন্দনের সুর তাহার নিজের মধ্যেই ডুবিয়া গেল, সমবেদনার এক বিন্দু অশ্রুপাতে তাহা সজল হইয়া উঠিল না। জীবনে একদিন যে ভুল করিয়াছিল, তাহাই শুধু সত্য হইয়া রহিল, এজন্য চিরদিন তাহাকে শাস্তি বহন করিতে হইল, আর যে কল্যাণশ্রী রূপ তাহার মরুভূমির বুকে কল্যাণবারি বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল, তাহা যা সমাজ গ্রহণ করিতে পারিল না, সেজন্য সমাজ কি একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হইল না? শতধারায় কল্যাণ ঝরিয়া পড়িতেছে, তবুও কি ইহারা পতিতা?

সমাজের দৃষ্টিতে অন্নদা দিদিও পতিতা। কিন্তু ইহার কারণ এই নয় যে, যে ব্যক্তিকে সে স্বামীত্বে পুনর্বরণ করিয়াছে—সেই ব্যক্তি অপরাধের উপর অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়া সমাজের নিকট অস্পৃশ্য। সমাজ কিন্তু শাহজীর বা অন্নদা দিদির স্বামীর কোন দোষই দেয় নাই, সমাজের দৃষ্টিতে যত দোষ অন্নদা দিদির।

অন্নদা দিদিকে আমরা দেখি, সমাজের দেওয়া সমস্ত অত্যাচারই সে নীরবে নতমুখে সহ্য করিয়াছে। একদিন যাহার আজীবন সঙ্গ তাহার জন্য সমাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সমাজের বাহিরে আসিয়াও অন্নদা দিদি তাহারই হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবুও কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে অন্নদা দিদি অপরাধী, সমাজে অন্নদা দিদির স্থান নাই। হৃদয়ে অতুলনীয় গুণরাশি লইয়া চিরদিন অপরাধীর জীবন যাপন করিতে হইবে, ইহাই সমাজ কর্তৃক তাহার জন্য একমাত্র ব্যবস্থা হইল। দুঃসহ সুদীর্ঘ জীবনে একদিনের জন্যও কেহ তাহাকে সান্ত্বনার বাণী শুনায় নাই, একদিনও কেহ জানিতে চাহে নাই অন্নদা দিদির সত্যিকার

অপরাধ কোথায়। তবুও আমরা জানি, কিছুই না জানিয়া এবং দোষ-গুণের কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহার জাতি, ধর্ম, সংসার, সম্ভ্রম সকলই কাড়িয়া লইয়া এক অজানার পথে যে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, সে সমাজ। এই নিরাশ্রয় রমণীর পথের শেষ কোথায় এবং এই পথে চলিবার জন্য তাহার পাথেয় কি এবং তাহা তাহার আছে কিনা, কেহ সে সংবাদ রাখে নাই, রাখিবার প্রয়োজনও মনে করে নাই। আমরা জানি, দুঃখ এবং দৈন্যেই অন্নদা দিদির চিরদিনের অধিকার। শত শত শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের মুখে ইহারা হাসি ফুটায় ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা ছড়াইয়া। কেহ ইহাদের প্রতি চাহিয়াও দেখিলনা, সেজন্য ইহাদের কোন অভিযোগ নাই, কোন নালিশ নাই। নারীর একমাত্র গতি স্বামী; ইহা সমাজই তাহাকে শিখাইয়া ছিল এবং দুঃসহ দুঃখের ভিতরও অন্নদা দিদি এই শিক্ষাকেই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। জীবনে অন্নদা দিদি সুখ চাহে নাই, শান্তি চাহে নাই, আপন ভবিষ্যৎকে সে অন্ধকারেব সঙ্গেই মিলাইয়া দিয়াছিল। ব্যথা-বেদনাই তাহার নিরাশ্রয় জীবনের অনন্ত সম্বল হইয়া রহিল।

শরৎ-সাহিত্যে আর একজন পতিতা নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কন্যা পার্বতী। পার্বতী সমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের দৃষ্টিতে পতিতা। কারণ, হাতীপোতা গ্রামের জমিদার গৃহিণী হইয়াও মনে মনে সে দেবদাসকে ভালবাসিয়াছিল! পার্বতী আশৈশব জানিয়া আসিয়াছিল দেবদাদা তাহারই; সাধ ছিল একদিন এই দেবদাদারই আদরের পারু হইয়া তাহার ভালমন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল সমস্তই নিজহাতে তুলিয়া লইবে। কিন্তু হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, পাবতীর আশালতা ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল! তের বছরের পারু একদিনেই জমিদার গৃহিণী পার্বতী সাজিয়া বসিল—বি-এ পাশ করা মহেন তাহার ছেলে এবং স্বামী ছেলে মেয়ে সহ যশোমতী তাহার কন্যা। এই অভিনয় শুধু একদিন নয়, সমস্ত জীবনভর তাহাকে করিতে হইয়াছে। আমবা জানি, হৃদয়ে এক গোপন ব্যথাই পার্বতীকে এই নূতন অভিনয়ে সফলতা দিয়াছিল। বাহির-জীবনে তাহার নিজের অভাব হয় নাই। কিন্তু উহা তাহার অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। অন্তরে তাহার যে ঝড় বহিতেছিল, বাহিরে অভিনয় করিয়া তাহারই প্রচণ্ডতাকে সে গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

শৈশবহৃদয় দেনা-পাওনার হিসাব রাখিত না। পারু জানিত, দেবদা তাহারই, দেবদাস জানিত পারু তাহার। আমরা দেখি, সুদীর্ঘ তেরটি বছর

পার্বতী দেবদাসেরই ধ্যান করিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "অজ্ঞাতসারে অশান্তমন দিনে দিনে এই অধিকারটি এমন নিঃশব্দে অথচ এতই দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল যে বাহিরে যদিও বাহ্য প্রকৃতি এতদিন ধরিয়া তাহার চোখে পড়ে নাই ; কিন্তু আজ হারানোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।" আমরা জানি, হৃদয়ের এই উত্তাল তরঙ্গই জমিদার বাড়ীর দেউড়ী পার করিয়া গম্ভীর রাত্রে পার্বতীকে দেবদাসের কক্ষে লইয়া গিয়াছিল। আমরা দেখি, এখানেও পার্বতী প্রেমে একনিষ্ঠ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ। জমিদার গৃহিণীর জীবন তাহার নিকট অভিনয় মাত্র। একদিন মনে মনে দেবদাসকে সে-যে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল ইহাই তাহার নিকট আজও সত্য হইয়া আছে। পার্বতী প্রতিদান পায় নাই, প্রতিদান সে চাহে নাই ; কিন্তু ইহা সত্বেও অন্তর-বাহির তাহার দেবদাসময়। সেখানে কিছুমাত্র শূন্যস্থান নাই, যেখানে হাতীপোতা গ্রামের প্রবীন জমিদার তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য লইয়া আসন পাতিতে পারে।

সখী মনোরমা তাহার বহির্জীবনকেই দেখিয়াছিল এবং ইহাকেই সে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু পার্বতী তাহাকে দেবদাস সম্পর্কে বলিয়াছিল— "তুমি সই, তুমি আপনার কিন্তু তিনি কি পর ? যে কথা তোমাকে বলতে পারি সে কথা কি তাকে বলা যায় না ?" ইহা হইতেই আমরা বুঝি, এক মুহূর্তের জন্যও পার্বতী দেবদাস হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে নাই। মনোরমাকে পার্বতী আরও কহিয়াছিল—"মনো দিদি, তুই মিছিমিছি মাথায় সিন্দুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই জানিস নে।" মনোদিদি শ্রেণীর নারী যাহারা তাহাদের এ শিক্ষা হয় না, তাহা শরৎচন্দ্র নিজেও স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু পার্বতী তাহার তের বছর জীবনেই এ শিক্ষা এমনভাবে লাভ করিয়াছিল যে, সমস্ত জীবনব্যাপী বহু অশ্রুপাতেও তাহা মুছিয়া যায় নাই।

তালসোনাপুর গ্রামের মাটিতে পড়িয়া একদিন পার্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে দেবদাসের নিকট বলিয়াছিল—'দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট, আমি যে মরে যাচ্ছি, কখনও তোমায় সেবা করতে পেলাম না, আমার যে আজন্মের সাধ—।" আমাদের মনে হয়, বাহিরের নানা আকর্ষণে দেবদাস বোধ হয় এই কথাগুলির অন্তর্নিহিত মর্মান্তিক বেদনা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু চন্দ্রমুখীর নিকট দেবদাস একদিন শুনিয়াছিল—চঞ্চল অস্থির চিত্ত বলিয়া স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। এই চন্দ্রমুখীই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল দেবদাসকে

পার্বতীর অন্তরের সঙ্গে। চন্দ্রমুখী তাহাকে বলিয়াছিল—কর্তব্য এবং ধর্মাধর্ম আছে বলেই ত যে যথার্থ ভালবাসে সে সহ্য করে থাকে। শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি আনতে চায় না।"

আমরা দেখি, চন্দ্রমুখী পার্বতীকে সঠিক বুঝিয়াছিল। হাতীপোতা গ্রামে আমরা পার্বতীকে দেখি—সে জমিদার গৃহে অন্নপূর্ণা। কাজ করিয়া, মধুর বাক্যে সকলের তুষ্টিসাধন করিয়া সেখানে তাহার দিন কাটে; কিন্তু তবুও সবার অলক্ষ্যে এক ফোঁটা চোখের জল টপ করিয়া ঝরিয়া কোথায় জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়! পার্বতীর জীবন যেমন ধীর, তেমনিই স্থির, সেই অতল স্নেহ-জলধিতে সামান্য তরঙ্গও বাহির হইতে পরিলক্ষিত হয় নাই। শুধু দেবদাসের পতনের সংবাদ পাইয়া পার্বতী তাহাকে হাতীপোতা গ্রামে লইয়া যাইবার জন্য তালসোনাপুরে আসিয়াছিল। সময় এবং সুযোগ পাইলে সে দেবদাসের ছন্নছাড়া জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। এ শক্তি এবং সামর্থ পার্বতীর ছিল। মনোরমা সেদিনও শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিযাছিল—বলিস কি? লজ্জা করতো না? পার্বতী উত্তর করিয়াছিল—লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব তাতে আবার লজ্জা কি? পার্বতীর এই উক্তিই তাহার অন্তরের যথার্থ পবিচয়। জীবনে একদিন যাহাকে স্বামী বলিয়া চিনিয়াছিল কোন অবস্থায়ই যে তাহার কোন ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না, ইহাই সে বুঝিয়াছিল। কিন্তু সমাজ ইহা মানিয়া হইয়া একবিন্দুর সহানুভূতির অশ্রু ফেলিবে না, তাহার জন্য অসতীর অস্পৃশ্যজীবনই নির্দেশ করিবে, কিন্তু কেন তাহাই শরৎ সাহিত্যের প্রশ্ন।

সমাজের দৃষ্টিতে রমাও পার্বতীর ন্যায়ই অপরাধী। কারণ, বিধবা হইয়াও রমেশকে সে ভালবাসিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, শৈশব প্রেমে অভিশাপ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বলিয়াছিলেন প্রতাপ শৈবলিনীকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে পার্বতী দেবদাস এবং রমা ও রমেশের ব্যথাময় জীবনেও ইহার সত্যতা আমরা দেখি। শীতলাতলা পাঠশালায় বাগদেবী রমা এবং রমেশকে কতখানি অনুগ্রহ করিয়াছিল আমরা জানিনা, কিন্তু মীনকেতু কন্দর্প দেবতা—এই দুটি শৈশব-হৃদয়ের জন্য এক গভীর দুঃখই লিখিয়া রাখিয়াছিল।

একদিন রমা সকল কিছুই রমেশের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইতে পারিত; এমন কি মাতৃস্নেহ পর্যন্ত। খুড়িমার হৃদয়েও যদু মুখুয্যের কন্যার জন্য একটু বিশেষ

স্নেহের আসন ছিল; কিন্তু তবুও ঘোষাল গৃহে তাহাকে বধূভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। তারপরে দীর্ঘ অদর্শনে উভয়েরই জীবনে বিরাট ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, রমা এবং রমেশ উভয়ে উভয়কে ভুলিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন আসিয়া রমেশ দেখা দিল। বহু দিনের পুরাতন সুরে রমেশ 'রাণী' বলিয়া ডাক দিল! শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, রমার বুকের ভিতর যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। হৃদয় তাহার তখনই রমেশের নিকট ছুটিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু বাধা ছিল পল্লীসমাজ। তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল পল্লীসমাজের একনিষ্ঠ পরিচালক বেণী ঘোষাল, যাহার নিকট মুহূর্ত আগেও রমা আপনার আনুগত্য জানাইয়াছে। সেদিন রমা সেই পল্লীসমাজের অন্তরালেই আত্মগোপন এবং আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিত; কিন্তু আমরা জানি একার্যে তাহার অন্তর বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় নাই। যথাসময়ে মামী আসিয়া বেণী ঘোষাল পরিচালিত পল্লী সমাজের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিল কিন্তু পল্লীসমাজের এই বিজয় গৌরবের মধ্যে আরম্ভ হইল রমার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব এবং এইখানেই তাহার পরাজয়ের সূচনা। কিন্তু ইহার পর হইতেই যদু মুখুজ্যের এই কন্যাটির হৃদয় রমেশের নিকট দুর্ভেদ্য হেঁয়ালীতে পরিণত হইয়া গেল। মাষ্টার মহাশয়ের নিকট রমেশ শুনিয়াছিল, যদু মুখুয্যে মহাশয়ের কন্যা সতীলক্ষ্মী। একমাত্র তাহার দয়াতেই স্কুলটি টিঁকিয়া আছে। শুনিয়া রমেশের চিত্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া গিয়াছিল। এই জন্যই মাছের ভাগ চাহিতে ভজুয়াকে সে রমার নিকট পাঠাইয়াছিল। দৃঢ় বিশ্বাস তাহার ছিল—"আমি নিশ্চয়ই জানি, মালীর জবান থেকে কখনো ঝুটা বাত বের হবে না।" কিন্তু রমেশ তখন জানিত না, রমার অন্তরে এক পল্লীসমাজ বাস করে, রমেশের অকপট বিশ্বাস সেখানে গিয়া আঘাত করিবে, ব্যথা দিবে কিন্তু প্রতিষ্ঠা পাইবে না।

রমার ভয় ছিল রমেশের জন্য কোন প্রকার সহানুভূতির ফাঁক দিয়া তাহার আপন অন্তরটি পল্লীসমাজের নিকট পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে! এই জন্যই সমস্ত দিক সে শক্ত করিয়াই বাঁধিতে চাহিয়াছিল। তাই রমেশের বিশ্বাস সেখানে টিঁকিল না, রমেশ যাহা অসম্ভব মনে করিয়া ছিল, তাহাই সম্ভব হইল। রমা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই পল্লীসমাজের মর্যাদা রক্ষা করিল। তাহার আপন গৌরব, তাহার হৃদয় যে তাহার পায়ের নীচে লুটাইয়া গেল, নিষ্ঠুর পল্লীসমাজ তাহা দেখিয়াও দেখিল না। একটা দীর্ঘশ্বাসই হয়ত তাহার অন্তরের অপরিসীম বেদনার চিরসাক্ষী হইয়া রহিল।

জ্যাঠাই মা বিশ্বেশ্বরী একদিন রমাকে কহিয়াছিলেন, "বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক না, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশী।" কিন্তু রমেশের প্রাণের দাম যে কি, তাহা রমা অপেক্ষা বেশী কে জানে? হৃদয় যাহার জন্য কাঁদে, তাহার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনে জীবনকে সার্থক করিয়া তোলা আজ তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, ইহা সে নিঃসংশয়েই বুঝিয়াছিল। তবুও ত তাহার দুঃখ দূর করিয়া, তাহার চোখের জল মুছাইয়া কিছুটা সান্ত্বনা সে লাভ করিতে পারিত; এর জন্য চরম আত্মত্যাগ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এর পরেও পল্লীসমাজ তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। চতুর্দিকে সকলেই যখন রমেশের অনিষ্টপ্রয়াসী, সেই সর্বনাশের মুহূর্তে রমা তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, একটু সান্ত্বনা দিতে পারিল না। আর শুধু ইহাই নয়, পল্লীসমাজের দাবী মানিয়া লইয়া প্রিয়তমের দুঃখের মাত্রা সে আপনি বাড়াইয়া দিতেছে, ইহা অপেক্ষা বড় অভিসম্পাত তাহার জীবনে আর কি হইতে পারে? সমগ্র জগৎ জানিয়া রাখিল রমাই রমেশের সবনাশের মূল। রমেশ নিজেও জানিল, রমা অপেক্ষা তাহার জীবনে আর বড় অমঙ্গল কিছুই নাই। কিন্তু রমা জানে, ইহা অপেক্ষা অধিক মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। অসহায়া রমাকে আমরা এই সময়ে দেখি পল্লীসমাজ তাহাকে আঘাত করে, বিশ্বেশ্বরীর উপদেশ তাহাকে আঘাত করে, রমেশের বিশ্বাস তাহাকে আঘাত করে!

তারকেশ্বরে রমার সঙ্গে রমেশের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সঙ্গে করিয়া আপন গৃহে লইয়া গিয়াছিল। ভোগ্য এবং পেয় অতি সাধারণ হইলেও এই অল্পতার ত্রুটি রমা আপনার যত্ন দিয়াই সেদিন পূর্ণ করিয়াছিল। রমেশ সেদিন জানাইয়াছিল—"খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে; আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম, রমা।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিয়াছিল। হৃদয় হয়ত তাহার আকুল আবেগে বলিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল, ইহাই তাহার জীবনের মধুরতম ক্ষণ। আমরা জানি, রমেশের পক্ষে ইহা প্রাণভরা পরিতৃপ্তির বাণী ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। কিন্তু তীক্ষ্ণ শরের মতই ইহা এক নিরীহ প্রাণীকে আঘাত করিবে, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই মধুর বিষাক্ত শর রমা নীরবেই সহ্য করিয়াছিল। নির্জন গৃহের মধ্যে তাহার নীরব অশ্রুপাতের কোন সাক্ষীই সেদিন ছিল না। রমা বুঝিয়াছিল, জীবনে সে অভিশপ্ত, যাহা কিছু তাহার প্রিয়, তাহাই তাহার

নিকট বিষ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত শর পল্লীসমাজের তূনীরে সঞ্চিত ছিল। তারকেশ্বরে রমেশের পরিতৃপ্তির বাণী তাহার কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়াছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া তাহাকে যে জেলে পুরিতে হইল,—আমরা জানি, তাহা পল্লীসমাজের কঠোর শাসনেই সম্ভব হইয়াছিল। রমা জানিত, পল্লীসমাজের এই নির্দেশ তাহার পক্ষে যতই কঠিন এবং যতই মর্মান্তিক হউক না কেন, ইহা মানিয়া না লইলে তুই দিন পরে তাহার গৃহে মহামায়ার পূজায় কেহ আসিবে না, যতীনের উপনয়নে তাহার গৃহে কেহ অন্ন গ্রহণ করিবে না।

রমা রমেশকে জেলে পাঠাইয়াছিল মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে, লাঠিয়াল আকবরকে পাঠাইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে বাঁধ কাটিতে, মাসীও ছোটখাট উপায়ে তাহাকে সাহায্যই করিয়াছিল। তাই বাহিরের দিক হইতে দেখিলে পল্লী সমাজের সঙ্গে রমা কখনও প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় নাই। ইহার একটি কারণ এই যে রমার হৃদয়ে পার্বতীর শক্তি ছিল না। তাই সকল দিক হইতেই সে কেবল আঘাতই সহ্য করিয়াছে। সমাজকে উপেক্ষা করিবার বা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার কোন ক্ষমতাই তাহার ছিল না, সে প্রবৃত্তিও তাহার হয় নাই। পল্লীসমাজের অকুণ্ঠ মর্যাদা রমা রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু পল্লী সমাজের একান্ত অনুগত হইয়াও রমা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই! তাহার অন্তরে যে দ্বন্দ্ব ছিল, তাহার জন্য পল্লীসমাজ তাহাকে ক্ষমা করে নাই। তাহাকে পল্লীসমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল ঐ সমাজই। সমাজই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীই ছিল তাহার সান্ত্বনার স্থল। জ্যেঠাইমাকেই রমা জানাইয়াছিল, তাহার হৃদয়ের কথা। মৃত্যুর পরে রমেশকে সে জানাইতে বলিয়াছিল—যত মন্দ বলিয়া রমেশ তাহাকে জানিয়াছিল, তত মন্দ সে ছিল না, যত দুঃখ সে রমেশকে দিয়াছে তার অনেক বেশী দুঃখ সে নিজেও পাইয়াছে। কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই কাশীযাত্রার পূর্বে তাঁহার মুখে একটি প্রশ্ন আমরা শুনি,—"কেন ভগবান তাহাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড একটা প্রাণ দিয়া সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়া আবার সংসারের বাহিরে ফেলে দিলেন।" একি অর্থপূর্ণ এমন অভিপ্রায় তাঁরই, না শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলাই? আমরা জানি, প্রশ্নটি শুধু বিশ্বেশ্বরীর নয়, প্রশ্নটি শরৎ-সাহিত্যের। সমস্ত রূপ-গুণ থাকা সত্ত্বেও, সমাজের সর্ববিধ নির্দেশ মানিয়া

কোরেচেন। কিন্তু আমার তাও হাতে নেই।" স্বামীর কাছে অভয়া পাইয়াছিল লাঞ্ছনা এবং অপমান। শুদ্ধমাত্র এই সম্বল লইয়াই অভয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। অন্নদা দিদি যাহা পারে নাই; অভয়া তাহাই পারিয়াছে। অভয়া সমাজকে উপেক্ষা করিয়া সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াও সমাজে বাঁচিয়া থাকিবার সাহস সঞ্চয় করিয়াছিল। সমাজের বিচারে বড়দিদিও পতিতা, কারণ সে সুরেন্দ্রনাথকে স্নেহ বিতরণ করিয়াছিল। মনোরমার পত্রের উত্তরে তাহার স্বামী তাহাকে লিখিয়াছিল—'মাধবীলতা রসালকে অবলম্বন করে ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি করিতে পারি? তবুও মনোরমা যখন লিখিয়াছিল—মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ সে বিধবা এবং বিধবাকে যাহা করিতে নাই সে তাহা করিয়াছে, সে মনে মনে আর একজনকে ভালবাসিয়াছে, সে তখন সমাজের মুখ চাহিয়াই ইহা লিখিয়াছিল। আমরাও জানি, সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ তাহার হৃদয় আছে, সে দয়ার পাত্রকে দয়া করে, করুণা বিলায়, ভালবাসা দেয়। মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ বিধবার হৃদয় থাকিতে নাই, ভালবাসিয়া কাহাকেও দয়া করা অপরাধ, সমাজের এ কঠোর নির্দেশ সে জানে না। ষোল বছর বয়সে বিধবা হইয়া মাধবী যেদিন পিতৃগৃহে আসিয়াছিল, সবাই তাহাকে ডাকিয়াছিল বড়দিদি, পিতা ব্রজবাবু ডাকিয়াছিলেন, মা; আর মাধবীও এক দিনেই ষোল হইতে ছাপান্নতে পা দিয়াছিল।' শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, ব্রজবাবুর গৃহে মাধবী ছিল কল্পবৃক্ষ, তলায় গিয়া হাত পাতিলেই হইল, অভীষ্টলাভে কেহই বঞ্চিত হইত না; সকলেই হাসিমুখ লইয়া ফিরিত।

কিন্তু আমরা জানি, এই মাধবীর জীবনেও আশা ছিল, আকাঙ্খা ছিল, জীবনে সে সার্থকতা চাহিয়াছিল, মাধবীর হৃদয়ে অনেক ফুলই ফুটিত। শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, যখন স্বামী ছিল, মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া তৃপ্তিলাভ করিত। কিন্তু স্বামী নাই বলিয়া যে সে গাছাটি কাটিয়া ফেলিয়া দেয় নাই, যে ফুলে একদিন সে প্রিয়তমের জন্য মালা গাঁথিত, আজ সে তাহাই অঞ্জলি ভরিয়া দীনদুঃখীকে বিলাইয়া দিতেছে, একি তাহার অপরাধ? স্বামী যোগেন্দ্রনাথও মাধবীকে মৃত্যুকালে সেই নির্দেশই দিয়াছিল—মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সে জীবন সকলের সুযোগের জন্য সমর্পণ করিও। মাধবী সেদিন তাহার উদ্বেলিত অশ্রু নিরুদ্ধ রাখিয়া হৃদয়-দেবতার অন্তিম কথা কয়টি হৃদয়ের মধ্যে গাঁথিয়া লইয়াছিল। আমরা

দেখি, যে-আসনে একদিন সে যোগেন্দ্রনাথকে বসাইয়াছিল, মৃত্যুর পরে তাহারই অন্তিম ইচ্ছা সে-আসন অধিকার করিয়াছিল। এইজন্য দীনদুঃখীর সেবাই মাধবীর দৈনন্দিন জীবনের একমাত্র ব্রত; এই জন্যই মাধবী তাহার বড়দিদি, এই জন্যই সে কল্পতরু।

পিতৃগৃহে আসিয়া মাধবী তাহার অপরিমিত স্নেহমমতা অকাতরে সকলকে দান করিতেছিল। দীনদুঃখী মাত্রেরই সে-দানে অধিকার ছিল। সুরেন্দ্রনাথও এই দীনদুঃখীর অধিকার লইয়াই সেদিন এই কল্পবৃক্ষের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের রিক্ততাই সেদিন মাধবীর হৃদয়কে বেদনার্দ্র করিয়াছিল; তাই কিছু না চাহিতেই এক অজ্ঞাত ব্যথিত হৃদয়ের দানে সুরেন্দ্রনাথের অন্তর-বাহির পরিপূর্ণ হইতেছিল। পিতা ব্রজবাবু মাধবীকে জানাইয়া ছিলেন, মা, একজন দুঃখীলোককে স্থান দিয়াছি। ব্রজবাবু জানিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ দুঃখী; কিন্তু তাহার দুঃখের পরিমাণ যে কত তাহা জানিয়াছিল বড়দিদি মাধবী। যাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোটছেলে বলিলেও হয়, যে খাইতে দিলে খায়, না দিলে উপবাস করে, সেই অকর্মণ্যের অপেক্ষা বড় দুঃখী সংসারে কে আছে? এই সৃষ্টিছাড়া উদাসীনের জন্য একজন বড়দিদি নিতান্তই আবশ্যক। এই জন্যই সুরেন্দ্রাথ আসা অবধি মাধবীর অর্ধেক সময় কাড়িয়া লয়।

বড়দিদি কল্পবৃক্ষ, সুরেন্দ্রনাথকে সে করুণা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের সাথে করুণার যে সম্বন্ধ, করুণা যে হৃদয়হীন হয় না, ইহা মাধবী তখনও বুঝিতে পারে নাই। মাধবী বুঝিতে পারে নাই, যাহার হৃদয় আছে, সেই শুধু করুণা করিতে পারে, হৃদয়হীন শুষ্ক করুণা বিতরণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। মাধবী তাহার হৃদয় দিয়াই সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের বেদনা অনুভব করিয়াছিল, এই জন্যই সে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে গিয়াছিল। কিন্তু এই অযাচিত করুণার মধ্য দিয়া আপনার অগোচরে সুরেন্দ্রনাথ কখন যে আসিয়া মাধবীর সম্পূর্ণ হৃদয়টি অধিকার করিয়াছিল, বড়দিদি তাহা প্রথমে বুঝিতেই পারে নাই। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলে তাহারই অশরীরী মূর্তি মাধবী-হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়াছিল, ইহা সে বুঝিতে পারিল। তখন মাধবী দেখিল, তাহার আপন হৃদয় শূন্য। মাধবীলতা শুকাইয়া গেল; কল্পবৃক্ষ সাজিয়া করুণা বিতরণ করিবার সকল আশা-আকাঙ্খা তাহার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেল। শত চেষ্টা করিয়াও মাধবী সেদিন আপন অন্তর তাই গোপন করিতে পারে নাই। মনোরমার নিকট সে চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

মনোরমা যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মাধবী-হৃদয় যে কত নিরুপায়, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই।

কিন্তু একদিন মাধবী বহির্বিশ্ব হইতে চক্ষু ফিরাইয়া আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিল। দেখিল,—"তথায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে, একান্ত অগোচরে, তাহারই করুণা কৌতুকের ভিতর দিয়া সুরেন্দ্রনাথ সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে। মাধবী ভীত হইল, পাছে তাহারই কোন আচরণে নিভৃত হৃদয়ের এই গোপন অংশটি প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে দেখিল, কল্পবৃক্ষ বড়দিদির মধ্যে মাধবী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তাই সুরেন্দ্রনাথের জন্য তাহার অসীম ভাণ্ডার একেবারে সীমাবদ্ধ হইল। সুরেন্দ্রনাথও ইহা অনুভব করিল। ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহস্পর্শ, যেন তাহার গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।" তাই একদিন বড়দিদির দেওয়া আঘাত যেন তাহারই দেওয়া দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাহার বড়দিদির আশ্রয় ত্যাগ করিল।

কলিকাতার রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ আপন গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, সুরেন্দ্রনাথ জমিদার সুরেন রায় হইল। বড়দিদির হৃদয়ের গোপন ব্যথা হয়ত ইহার পরে গোপনই থাকিত। কিন্তু সমস্ত পরিবর্তিত হইল মাধবীর সোনা--গাঁয়ে প্রত্যাবর্তনে। জমিদার সুরেন রায়ের গোমস্তা মথুরবাবুর পরওয়ানা বলে একদিন স্বামীর ভিটামাটির উপর হইতে শেষ অধিকারটুকুও মাধবীর উঠিয়া গেল। মাধবী সেদিনও ভাবিয়াছিল সুরেন রায়, বড় পরিচিত নাম। কিন্তু তখনও সে ভাবিতে পারে নাই, এই সুরেন রায় আবার তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বের মাষ্টার মহাশয় হইয়া পুরাতন স্মৃতির উপর নূতন ব্যথা দিবার জন্যই ফিরিয়া আসিবে, আপনার প্রাণ দিয়া তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য। বড়দিদির স্নেহের দানে পাঁচ বৎসর পূর্বে যাহাকে বিমুখ করিয়া মাধবী আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিতেছিল, সেই সুরেন্দ্রনাথ আবার আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল একেবারে মৃত্যুপথযাত্রী সাজে সাজিয়া। তাহার দীর্ঘদিনের চিন্তা, তাহার পাঁচ বৎসরের ধ্যান আজ মৃত্যুপথগামী। তাই আজ আর কোন বাধা কোন সঙ্কোচ, কোন লজ্জাই তাহার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না; হৃদয়ের সমস্ত করুণা, সমস্ত স্নেহ নিঃশেষ করিয়া দিয়া মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম আকাঙ্খাকে মাধবী পূর্ণ করিল। সে সুরেন্দ্রনাথের মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, বিশ্বের আরাম যেন ওই ক্রোড়ে লুকাইয়াছিল। এতদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ যেন তাহা খুঁজিয়া পাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ মাধবীকে জিজ্ঞাসা

করিল,—"তুমি বড়দিদি?" মাধবী উত্তর করিয়াছিল,—"আমি মাধবী?" আমরা জানি, আজ সে সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচের অতীত, তাই সে মাধবী।

সমস্ত জীবন ধরিয়া মাধবীলতা কেবল যে লতাইয়া পদদলিত হইল, পত্র-পুষ্পে অঙ্কুরিত হইবার সৌভাগ্য তাহার হইল না, ইহাতে তাহার আপনার জীবনেরই বা কি সার্থকতা হইল, সমাজেরই বা কি অভীষ্টলাভ হইল, ইহাই শরৎ-সাহিত্যের প্রশ্ন।

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে একমাত্র (অচলাই এমন একটি নারী, আমাদের সহানুভূতির কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বাঁচিবার কোন তাগিদই যে অনুভব করে না।) শরৎ-সাহিত্যে অচলাও পতিতা, সমাজে তাহার স্থান নাই; কিন্তু তাই বলিয়া এই নারী বিজলী বা চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী বা অভয়া, কিরণময়ী বা পার্বতীর মত পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না।

ইহার কারণ, বিজলী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী বা অভয়া শরৎ-সাহিত্যে জীবন্ত চরিত্র, কিন্তু অচলা এক কঠিন প্রশ্ন—কমল চরিত্রে যাহা শেষ প্রশ্ন; তাহারই প্রথম অবতারণা দেখি, আমরা অচলার জীবনে। অচলার জীবন অবলম্বন করিয়া শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, নরনারীর পরস্পর আকর্ষণ চিরন্তন, ইহা ভালমন্দ বিচারনিরপেক্ষ, সমাজের সকল আইন, সমস্ত বিধি-নিষেধের গণ্ডী বহির্ভূত। শরৎ-সাহিত্যে আমরা অচলাকে দেখি—তাহার একদিকে মহিম, একদিকে সুরেশ, একদিকে নির্বিকার উদাসীনতা, আর একদিকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, একদিকে নীরব তপোময় জীবন, আর একদিকে রাসহীন পুরুষ; আর মাঝখানে অচলা eternal Eve, উভয়কেই সমানভাবে আকর্ষণ করিতেছে এবং উভয়দিক হইতেই সমানভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। এই দুইদিকের আকর্ষণে অচলা গতি--শক্তিহীন, সে সত্যই অচলা, চলিবার শক্তি সে হারাইয়া ফেলিযাছে। জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনা ও বহু উৎপাতের মধ্যে কখনও সে মহিমের অনুসরণ করিয়াছে, কখন সুরেশের উদ্দাম গতিবেগ তাহার মধ্যে চলিবার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে। তাই মহিমের উন্মুক্ত আকাশের মত উদারতা তাহার জীবনের পক্ষে যেমন সত্য, তেমনই সত্য সুরেশের দুর্দাম আবেগ ও আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণও। কোনটাকেই সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, দুই বিরাট বিপরীত শক্তির আঘাত ও আকর্ষণে আহত ও তাড়িত হইনাই অচলা গৃহদাহ ঘটাইয়াছে।

অচলা সমাজে চলে না। এইজন্য শরৎচন্দ্র বোধহয় সমাজের মুখ চাহিয়াই এই নামকরণ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র সমাজে লাঞ্ছিতা, নিপীড়িতা রমণীদের জন্য সাহিত্যে অশ্রুর অবারিত বন্যা বহাইয়াছেন, তাই সমাজে যাহারা পতিতা, তাহারাও সহজেই শরৎ-সাহিত্যের পাঠকসমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে। সমাজে অচলাও পতিতা, কিন্তু তাই বলিয়া সে অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী ও পার্বতীর সঙ্গে একাসনে বসিবার স্পর্ধা করিতে পারেনা। এমনকি চন্দ্রমুখী এবং বিজলী বাঈজী সমাজ পরিত্যক্তা হইলেও তাহারাও যেন অচলা অপেক্ষা বেশী আপনার।

প্রকৃতপক্ষে শরৎ-সাহিত্যের সকল চরিত্রের সঙ্গেই আমরা একটি সহৃদয় আত্মীয়তাবোধ অনুভব করি। মনে হয় সকলেই যেন আমাদের একান্ত আপনার, সকলেই যেন আমাদের পরিচিত; দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের সাক্ষাৎ যেন আমাদের চিরন্তন। আমরা চিনি শ্রীকান্তকে এবং তাহার বন্ধু ইন্দ্রনাথকেও। রোমাঞ্চকর রাত্রির গভীর অন্ধকারে ততোধিক রোমাঞ্চকর মাছ চুরির ইতিহাস, বাঁশবনে বাঁশী বাজানোও যেন আমাদের অপরিচিত নয়। আমরা চিনি তালসোনাপুরের দেবদাসকে; আমবাগানের মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র সংসারও আমাদের অজানা নয়।

স্বেচ্ছাকৃত বনবাসে নির্বাসিতা অন্নদা দিদি, পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে বিজয় গৌরবে অধিষ্ঠিতা বিজয়া, নিঃসম্পর্ক অনাথভাই কেষ্টকে নিয়া বিব্রত চিরকল্যাণ বুদ্ধি মেজদিদির প্রাণ, চতুর্দিকে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রামরত সমগ্র বিশ্বের কল্যাণময়ী মাতা বিশ্বেশ্বরীর দল, নীরব আত্মদানে রমার আত্মবিলোপ, রমেশের প্রাণ, ধর্মধ্বজী রাসবিহারীর ক্রূর চক্রান্ত, বিলাসের হীনতা—এই সমস্ত যেন আমাদের কতদিনের চেনা, সকলের সঙ্গেই যেন আমাদের হৃদয়ের বহুদিনের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। রাসবিহারীর কূটবুদ্ধিপূর্ণ স্বার্থপরতা, বিলাসের নির্বুদ্ধিতা ও হীনতা, রমার মাসীর জিহ্বার অকারণ বিষোদ্গীরণ—সকলই আমরা দেখি। অন্তরে ইহারা বিরোধিতা জাগায়, আমরা হৃদয়ের কোণে ইহাদের স্থান দিতে কুণ্ঠিত হই। উপন্যাস-রাজ্যে আপনাদের চলার গতিতে ইহারা এমন এক সাহারার সৃষ্টি করে, যেখানে সহানুভূতির সামান্য বাষ্পটুকুও সঞ্চিত হইবার অবকাশ পায় না। কিন্তু তবুও ইহারা অপরিচিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। চলার পথে ইহাদের প্রতিটি গতিভঙ্গী, প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে পরিচয় যেন আমাদের শুধু এ জীবনের নয়, যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে অচলা যেন ইহাদের সকলের হইতেই আলাদা। আমরা দেখি, অচলার একদিকে বীর্যবান পৌরুষ, আর একদিকে উদাসীন মহত্ত্ব—এই উভয় আকর্ষণে বিশ্বের চিরন্তন নারী

অচলা অসহায়। কিন্তু তবুও পাঠকের সহানুভূতি সে সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করে; পাঠক সমাজের নিন্দাবাদের প্রতি সে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না, নিঃসঙ্কোচে এবং দ্বিধাহীন চিত্তেই আপনার সাহিত্যিক আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারে। এই শক্তি দিয়াই শরৎচন্দ্র অচলাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠকের সহানুভূতি বা নিন্দা অচলা সমানভাবেই উপেক্ষা করে।

সুরেশ অচলার অন্তরের স্বাভাবিক নারীকে চিনিয়াছিল, তাই তাহার সমস্ত মঙ্গল এবং অমঙ্গলকে সমান ভাবেই উপেক্ষা করিয়া এক অনিবার দুর্বার আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছিল, অচলার স্বাভাবিক দুর্বলতারই সে সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। এক দুঃসহ শক্তির নিকটই অচলা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু জীবনে তাহার আকর্ষণ শুধু সুরেশই নয়। তাহার অন্যদিকে আছে মহিম—উদাসীনতা তাহার নিস্তরঙ্গ সাগরের মত এবং মহত্ত্ব তাহার হিমালয় অপেক্ষাও মহান। আকর্ষণে তাহার সুরেশের আবেগের তীব্রতা না থাকিতে পারে, কিন্তু সে নীরব আকর্ষণের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপেক্ষা করিবার সাধ্যও অচলার নাই। শরৎচন্দ্র অচলাকে মানব-হৃদয়ের এক গভীর সত্যরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। দুই বিপরীতশক্তির আঘাত ও আকর্ষণে ক্রমাগত আহত ও তাড়িত হইয়া অচলারা চিরদিনই গৃহদাহ ঘটায় এবং এই গৃহদাহ রাজপুরের একখানি মেটে ঘরই পোড়েনা, মহিমের যথাসর্বস্বই তাহাতে ভস্মীভূত হয়না, অচলার যথাসবস্ব—তাহার ইহকাল, তাহার অতীত, ভবিষ্যৎও এই আগুনে দগ্ধ হইয়া যায়। যথাসময়ে মহিম যদি তাহার নির্বিকার উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া অচলার বিপদে তাহাকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইয়া দিত, আমরা জানি, অচলা এই হাত ধরিয়াই আগুনের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত। অচলাও ইহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু মহিম তাহা করে নাই। সে তাহার আত্মসমাহিত উদাসীনতা লইয়া অচলার জীবনের একপাশে সরিয়া রহিল। মহিম মনে করিয়াছিল, গৃহদাহে তাহার নিজেরই গৃহ পুড়িয়াছে, ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা তাহার নিজেরই। এই নীরব উদাসীনতা লইয়া দূরে সরিয়া থাকিয়া সে তাহার নামের মহিমাকেই রক্ষা করিয়াছিল। মহিম মনে করিয়াছিল, তাহারই গৃহদাহ করিয়া আগুন সেদিন নিভিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিভিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আগুনের দহনশক্তি ইহার পর ক্রমেই যে বাড়িয়া যাইবে, ইহা যে বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। তাই অচলার জীবন, তাহার অতীত, তাহার ভবিষ্যৎ এই আগুনে পুড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে অচলাও পুড়িয়া মরিল। কিন্তু এই

অচলার দল কোন সমাজ বিশেষ বা কাল বিশেষের নয়, ইহার চিরন্তন মানব সমাজের। তাই ইহারা—মরিয়াও মরে না। ইহারা রাজলক্ষ্মী বা অন্নদা দিদি নয়—সমাজ যাহাদের তাহার গণ্ডীর বাহিরে নির্বাসন দিতে পারে। ইহারা রমা কিংবা পার্বতী নয়—সমাজ যাহাদের নির্বিচারে আপনার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারে। সমাজে ইহারা অচলা হইতে পারে; কিন্তু মানবেতিহাস ইহাদের উপেক্ষা করিতে পারে না। সমাজ যত শক্তিশালীই হউক না কেন, অচলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

শরৎ-সাহিত্যে অভয়াকে আমরা দেখিয়াছি, সে সমাজের ভয়ে ভীত নয়, সমাজকে সে উপেক্ষা করে। কিরন্ময়ীকেও আমরা এই সাহিত্যে দেখি—শক্তির দম্ভে ও উগ্রতায় সে সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের কাহারও মধ্যে অচলাকে দেখিনা। সমাজকে উপেক্ষা করিবার, উপহাস করিবার ক্ষমতা অচলার নাই। শরৎ-সাহিত্যে আমরা কখন দেখি,—বর্তমান সমাজের ধ্বংসের উপর নূতন সমাজ গড়িবার প্রয়াসী সে, কিন্তু সমাজকে ভাঙিবার বা নূতন করিয়া গড়িবার শক্তি তাহার ছিল না। এদিক হইতে কমলের সাথেও তাহার কোন মিল নাই। শুধু একটি মাত্র বিষয়ে আমরা উভয়ের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাই। প্রেমের দেবতার আকর্ষণে উভয়েই আত্মসমর্পন করে—কমল ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগের জন্য, কিন্তু অচলা একান্ত অসহায়ভাবে।

অচলাকে আমরা দেখি, কলিকাতার আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে সে গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন অপেক্ষা রাজপুরের উত্তরপাড়ায় একখানি মেটে ঘরের প্রতিই ছিল তাহার বেশী আকর্ষণ। একদিন সে এই রাজপুরের মেটে ঘরের স্বপ্নেই বিভোর ছিল এবং এই স্বপ্নসূত্র অবলম্বন করিয়াই এখানে সে স্থান পাইয়াছিল। হয়ত একদিন এখানেই সে আত্মস্থ হইতে পারিত কিন্তু সহসা এক প্রবল ভূমিকম্প রূপে জীবনে তাহার সুরেশের আবির্ভাব ঘটিল, আঘাতে তাহার অচলার সুস্থির ভবিষ্যতের সুদৃঢ় ভিত্তির সমস্ত গাঁথুনি-গুলিই যেন কাঁপিয়া উঠিল। অচলার জীবনে একদিনেই ভূমিকম্পের অবসান ঘটিল না। ধূমকেতুর মতই সে তাহার পশ্চাতে লাগিয়া রহিল এবং পুচ্ছে জড়াইয়া টানিয়া লইয়া গিয়া এমন এক বিরাট বিপ্লবের মধ্যে ফেলিয়া দিল যেখানে তাহার অতীত, ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। ধূমকেতুর এই পুচ্ছ তাড়নায় অচলা নিরন্তর আহত হইয়াছে, তাই আপনার জীবন হইতে ইহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মুক্ত হইবার সে যে চেষ্টা করে নাই

তাহা নয়। মহিমের প্রতি তাহার মনোভাব যে কিরূপ ইহা সে সুরেশকে অকপট এবং অনাড়ম্বরভাবেই জানাইয়া দিয়াছিল। অচলা সুস্পষ্টভাবেই সুরেশকে জানাইয়াছিল, সুরেশ তাহাকে যতই আকর্ষণ করুক না কেন, তাহাদের মিলনের সম্ভাবনা কোনদিনই অচলার নিকট প্রশ্রয় পাইবে না। অচলার এ উক্তি অস্পষ্ট নয়, এখানে দৃঢ়তারও কোন অভাব আমরা দেখিনা। কিন্তু শত্রুতা সাধন করিল তাহার পরিবেশ। পিতার ঋণ, পিতার ইচ্ছা, সুরেশের ঐশ্বর্য এবং উদ্দাম আবেগ এবং সর্বোপরি মহিমের জীবনের নিস্তরঙ্গ গাম্ভীর্য ও সীমাহীন উদাসীনতা একসঙ্গে অচলার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। সুরেশ তাহার পিতার ঋণ পরিশোধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু হাত পাতিয়া সে-অর্থ গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পিতার কাতর করুণ আঁখি এবং বিষণ্ণ মুখ তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। এই পিতৃঋণ পরিশোধের মধ্য দিয়াই সুরেশ তাহার জীবনে দৃঢ় আসন পাতিয়া বসিল। এই সময়ে মহিমের সান্নিধ্যই অচলাকে সাহায্য করিতে পারিত। মহিম যদি তাহার স্বামীত্বের স্বাভাবিক অধিকার লইয়া অচলার নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইত, অচলার জীবনাকাশের এই ক্ষুদ্র কালোমেঘখানি সেদিন শরতের মেঘের মতই দূর হইয়া যাইত, জীবন আলোর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইত, সময়ে চাঁদের হাসিও খেলিত। কিন্তু অচলার অতি বড় প্রয়োজনের মুহূর্তেও মহিম তাহার কাছে আসিয়া একবার দাঁড়াইল না, পর্বতের উচ্চতা, সাগরের গভীরতা এবং ক্ষমার বিপুল গৌরব নিয়া সে দূরেই দাঁড়াইয়া রহিল। অচলা হাত বাড়াইয়াও তাহার নাগাল পাইল না। মহিমের নির্লিপ্ত নীরব উদাসীনতাই অচলার জীবনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতি করিয়াছিল। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড পীড়নে অচলা যখন কাঁপিতেছিল, মহিমের উচিত ছিল, আপনার সবল হাতখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দেওয়া। মহিম তাহার কর্তব্য করে নাই। অক্ষমকে সাহায্য না করিয়া ক্ষমা ও উদারতার ব্যর্থ অভিনয়ে পাশে দাঁড়াইয়া অচলাকে সে গৃহদাহের পথেই তিলে তিলে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছে। মহিমের এই হাতখানি অচলার পক্ষে কতবড় প্রয়োজন ছিল তাহা ইহার পরে একদিন আমরা দেখি। মাজুলি হইতে ফিরিবার পথে অচলা পা টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল এবং মহিম কিছু না বুঝিয়াই হঠাৎ তাহার দিকে হাতখানা বাড়াইয়া দিয়াছিল। অচলাও সেদিন আকুল আগ্রহে সে হাতখানি সজোরে চাপিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, হঠাৎ হাত বাড়াইয়াই মহিমের মন ঘৃণা

লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল, হাতখানি সে পুনরায় টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেদিনের জন্য যাওয়া বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখি, মহিম হাত ছাড়াইতে চাহিলেও অচলা তাহা ছাড়ে নাই। জীবনে আকুল আগ্রহে কতদিন সে এই হাতখানিকেই যে চাহিয়াছে। আজ একবার যখন সে ইহা পাইয়াছে, তখন আর তাহা ছাড়িবে না। তাই মহিমের যাত্রা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবে সে সম্মতি দিল না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "সে মাথা নাড়িয়া কহিল—না, চল। আর আমি দুর্বল নই। তোমার হাত ধরে যতদূর যেতে বল যেতে পারব।" আমরা জানি, ইহাই অচলার যথার্থ চিত্র। ইহাই তাহার অন্তরের তীব্র সত্য। এই সত্য আরও একদিন তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। মহিমকে ডাকিয়া সে কহিয়াছিল, "তুমি কি তোমার কসাই বন্ধুর হাতে জবাই করার জন্য আমাকে রেখে গেলে? যে তোমার উপর এত কৃতঘ্ন হতে পারল তার হাতে আমাকে ফেলে যাবে কি বলে?" ইহার পর অচলার জীবনে এক প্রবল ঝড় উঠিল, বিরুদ্ধ বায়ুর তাড়নায় মেঘের পর মেঘের রাশি আসিয়া অচলার জীবনাকাশ অধিকার করিল। তাহার তীব্র কালীমা ভেদ করিয়া অচলার জীবনের শুভ্র স্বচ্ছ রূপরেখা ফুটিয়া উঠিবার আর কখনও অবকাশ পায় নাই। মহিমের দক্ষিণ হাত টানিয়া লইয়া নিজের অঙ্গুল হইতে সোণার আংটিটা খুলিয়া তাহার আঙ্গুলে পরাইয়া দিতে দিতে সে কহিয়াছিল, "আমি আর ভাবতে পারিনে। এইবার যা করবার তুমি কর।"

অচলা তাহার জীবনে এক প্রবল ভূমিকম্প অনুভব করিয়াছিল। তাই, সমস্ত চিন্তা ভাবনার ভার মহিমের উপর দিয়া সে তাহার দুর্লঙ্ঘ্য মহত্বের নীচেই আশ্রয় লইতে চাহিয়াছিল। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় সে মহিমকেই অবলম্বন চাহিয়াছিল। তাহারই আড়ালে সে আত্মরক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখি, মহিম উদার, মহিম ধীর, মহিম শান্ত এবং শক্তিশালী কিন্তু অচলার জীবনের অতি বড় প্রয়োজনেও সে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না। আর মহিমের এই অনাড়ম্বর উদাসীনতার সুযোগ লইয়া একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকণা রাজপুরের মেটে ঘরের কোণে আসিয়া দেখা দিল। সে অগ্নিকণা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, তাহা মহিমের দৃষ্টি এড়ায় নাই এবং এ আগুন বর্ধিত হইয়া একদিন বিরাট দাবানলের সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে, ইহাও সে যে জানিত না তাহা নয়। কিন্তু ইহা সত্বেও সে-যে প্রতিকারের কোন চেষ্টা করে নাই, তাহার কারণ, ইহা ছিল তাহার আত্মনিগ্রহের গৌরব। মহিমের দৃষ্টি

ছিল এসময়ে আত্মকেন্দ্রিক, গৃহদাহের সমস্ত দুঃখ সে শুধু নিজের দিক হইতেই চিন্তা করিতেছিল। অচলার জীবনে ইহা কতবড় দুঃখ, কতবড় সর্বনাশ আনিবে ইহা সে ভাবিতে পারে নাই, তাহা না হইলে তাহার পক্ষে ঐরূপ নির্লিপ্ত, নির্বিকার এবং উদাসীন থাকা সম্ভব হইত না। আমরা দেখি, মহিম তাহার সুখ-দুঃখের অংশ কোনদিন কাহাকেও দেয় নাই। পাঠ্যজীবনে কতবার সুরেশ বন্ধুর দুঃখের অংশ নিতে চাহিয়াছে কিন্তু মহিম কৃপণের ধনের মতই তাহাকে অন্যের স্পর্শ হইতে আগলাইয়া রাখিয়াছে! মহিমের যথাসর্বস্ব আগুনে পুড়িয়া গেলে অচলা ব্যথিত স্বামীকে নিকটে টানিতে চাহিয়াছিল, তাহার ব্যথার অংশ নিতে আগাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্যর্থ হইয়াই সেখান হইতে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অচলা তাহার নির্মম উদাসীনতাকে ভেদ করিতে পারে নাই। মহিমের কোন কাজেই সে লাগিতে পারিল না ; তাহার গহনার বাক্স কেবল মাত্র তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্যই রহিয়া গেল এবং মহিমের দুঃসময়ও রহিয়া গেল একান্ত ভাবেই তাহার নিজের। স্বামীর অতি দুঃসময়েও অচলা তাহার ব্যথিত হৃদয়ের নিকটে পৌঁছিতে পারিল না। অচলার বেদনাতুর হৃদয়ে যে তীব্র আকুলি-ব্যাকুলি চলিতে ছিল, পত্নীর স্বাভাবিক অধিকার বলে ব্যথিত স্বামীর পাশে বসিয়া শান্তির প্রলেপ--হস্ত দিয়া হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার ব্যাকুল আগ্রহ যে প্রায় সংগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল, মহিম তাহা দেখিতে পায় নাই। দেখিবার চেষ্টাও সে করে নাই। তাহা না হইলে অমন করিয়া সে হয়ত তাহাকে পরাজয়ের খাদে ঠেলিয়া দিত না।

অচলার প্রতি মহিমের অবিচার এখানে শেষ হয় নাই। যে সমাজে অচলার জন্ম, জ্ঞান লাভ করিবার পর দীর্ঘদিন যেখানে সে বর্ধিত হইয়াছিল, রাজপুরের সমাজ ছিল তাহা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। মহিম তাহাকে তাহার সেই আজন্মের সমাজ হইতে টানিয়া আনিয়া রাজপুরের মেটেবাড়ীর নির্জন এবং নিরানন্দ কক্ষে স্থাপন করিয়াছিল। নববধূর অভ্যর্থনার ঘটা, পল্লীবাসীদের অস্ফুট কলরবে সুমিষ্ট চাপা ইঙ্গিত, অচলার বিবাহিত জীবনের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত স্বাদ অন্তর্হিত করিয়া দিয়াছিল। ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়া পল্লীর অপরূপ কবিত্বের সঙ্গে যাহাদের পরিচয়, তাহাদের ভাগ্যে ইহাই ঘটে। পল্লীজীবনের কবিত্বের পাশে স্বামীর দারিদ্র্যকে স্থাপন করিয়া অচলা তাহাকেও কল্পনার মাধুর্য দিয়া এক অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পল্লীজীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে সে যখন ইহার মধ্যে কোন আকর্ষণই পাইলনা, তাহার জীবনে হঠাৎ

যেন এক অন্ধকারময় নৈরাশ্য দেখা দিল। বঞ্চিত জীবনে এই নৈরাশ্যময় অন্ধকারে মধ্যে একমাত্র মহিমই ছিল তাহার আশার আলো। অচলা পল্লী--সমাজের মধ্যে একমাত্র মহিমকেই চিনিত, মহিমই ছিল এখানে তাহার একমাত্র আকর্ষণ। মহিমই ইচ্ছা করিলে পল্লীসমাজের সহিত অচলার সহৃদয় অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাইতে পারিত। কিন্তু নারীর প্রতি উদাসীনতার গৌরব হইয়া এখানেও মহিম অচলার নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিল; এবং এই অবসরেই অচলা তিলে তিলে পল্লীসমাজের প্রতি, পল্লীর নিরানন্দ জীবনের প্রতি সহানুভূতি হারাইতে লাগিল। ইহারই ফলে অতিবড় ভুলকেই সে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। সে স্থির করিয়া ফেলিল—স্বামীকে সে ভালবাসে না, ভুল করিয়াই সে বিবাহ করিয়াছে। মহিমের একান্ত অলক্ষ্যে, তাহার উদাসীনতার সুযোগ লইয়াই গৃহদাহ আরম্ভ হইয়া গেল।

মহিম বুঝিয়াছিল অচলা যে পথে চলিতেছে তাহা ভুল পথ, এবং সুরেশ যে পথে টানিতেছে তাহা অন্যায়ের পথ। কিন্তু একদিনের জন্যও সে তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায় নাই। অচলার পক্ষে সুরেশ যে কি, তাহার মহিম যে কি কোনদিন মহিম তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং বুঝিবার চেষ্টাও কখন করে নাই। অচলার নিকট সুরেশ ছিল এক বিরাট ভূমিকম্প। অচলার অন্তর-বাহির কাঁপাইয়া দিয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইত। সেই বিরাট অশান্তিকে অস্বীকার করিবার শক্তি অচলার ছিল না। সুরেশ ঝড়ের মত আসিত এবং আপনার দুর্দান্ত দুঃসহ তেজে অচলার অস্তিত্বের সমস্ত ভিত্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিত এবং তাহারই ভিতর দিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া উন্মত্ত আবেগে দুর্বলা অসহায়া লুণ্ঠিতা অচলাকে সে পথে টানিয়া বাহির করিত তাহা স্বর্গের কি নরকের পথ তাহা ভাবিয়া দেখিবার উপায় অচলার থাকিত না। অচলার জীবনের এই সময়ে বড় প্রয়োজন ছিল মহিমের। কিন্তু বিপন্ন হৃদয়ের এই অসহায় অবস্থা মহিম একদিনের জন্যও দেখিতে পায় নাই।

কিন্তু গৃহদাহের জন্য অচলার আপন অন্তরের দুর্বলতাও কম দায়ী নয়। সুরেশের অন্তরে যে উন্মত্ত আবেগ ছিল, অচলার দুর্বলতাই তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে, বিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছে। পিতার ইচ্ছাকে অচলা উপেক্ষা করিয়াছিল, কারণ এখানে ছিল তাহার স্বার্থত্যাগের মহান এবং গৌরবময় চিত্র। তাহার একদিকে ছিল সুরেশের ঐশ্বর্য এবং অন্যদিকে ছিল মহিমের দুর্ভেদ্য উদাসীনতা। ঐশ্বর্য ফেলিয়া অচলা সেদিন উদাসীনতাকেই জয়

করিতে গিয়াছিল। জীবনে সুরেশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াই অচলা সেদিন তাহাকে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার অন্তরের দুর্বলতার মধ্যেই সুরেশ যে সেদিন আত্মগোপন করিয়াছিল, অচলা তাহা দেখিতে পায় নাই। সুরেশকে একদিন সে শান্ত, দৃঢ়, অথচ অবিচলিত কণ্ঠেই জানাইয়া দিয়াছিল, অচলার জীবনে মহিমের আসনে কোনদিন তাহাকে বসান সম্ভব নয়। কিন্তু এই সুরেশই ফয়জাবাদ হইতে যখন আত্মপ্রত্যয়ের উজ্জ্বল ছাপ লইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে দিতে অচলার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এই দুর্বলতাই অচলার একমাত্র পরিচয় নয়। পরিচয় তাহার পাইয়াছিল সুরেশের পিসী, পরিচয় পাইয়াছিল মৃণাল। তাহার অন্তরকে চিনিয়া-ছিলেন রামবাবু এবং রাক্ষুসীও কতকটা বুঝিয়াছিল। অচলাকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল কেদারবাবুর কন্যা বীণাপাণি। কিন্তু বুঝিবার মত কোন অচলাকেই সেখানে সে খুঁজিয়া পায় নাই। তাই একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে বসিয়া চুপি চুপি অচলাকে সে কহিয়াছিল, "ওপারের এই চরটার পানে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হচ্ছিল জান দিদি? মনে হচ্ছিল যেন ঠিক তুমি, অন্ধকার দিয়ে ঘেরা একটুখানি—" শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, শুনিয়া অচলা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। জীবনে এর চেয়ে সত্য কথা সে শুনে নাই।

জীবনের পরিহাসের পালা শেষ করিতে মাজুলিতে মহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—এখন তুমি কি করবে? অচলা স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিয়াছিল—আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি যা হুকুম করবে, তাই করব। মহিম জানিতে চাহিয়াছিল, সে কেন হুকুম করিবে এবং অচলাই বা তাহা শুনিতে বাধ্য হইবে কেন। কিন্তু অচলা উত্তর করিয়াছিল—"তুমি ছাড়া আর কেউ আমার নেই, কেউত আমার সঙ্গে কথা কবেনা।" এই একান্ত নিরভিমান নিঃসঙ্কোচ উক্তির মধ্য দিয়া যে গভীর নিঃসহায়তার সুরটি বাজিয়া উঠিল, তাহারই ভিতর দিয়া অচলার অজ্ঞাত জীবনেতিহাসের সমস্ত অধ্যায়গুলি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহাই অচলার যথার্থ পরিচয়। কিন্তু তবুও সমাজের দৃষ্টিতে অচলা পতিতা। জীবনে ঘটনার পর ঘটনা পুঞ্জীভূত হইয়া চলার পথে তাহার দুর্গম্য বাধার সৃষ্টি করিতেছিল, পরিবেশ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল; কিন্তু সমাজ ইহা দেখিল না। সমাজ জানে, অচলা সমাজের বিধিবদ্ধ আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। সুতরাং সে পতিতা। সমাজে তাহার মর্যাদার আসন নাই।

কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে ইহারা পতিতা হইলেও শরৎ-সাহিত্যে ইহারা পতিতা নয়। শরৎ-সাহিত্যে সর্বোপরি ইহাদের পরিচয় ইহারা নারী। অন্যান্য নারীদের মতই ইহাদের হৃদয়ে আছে এবং সে-হৃদয়ে ব্যথা-বেদনা আছে। যে বেদনা জীবনে ইহারা বহন করে, তাহাই পাঠকের অন্তরে—ইহাদের সমবেদনার আসনে বসাইয়া দেয়।

শরৎ-সাহিত্যে নারী

সাহিত্যিক আপন প্রয়োজনবশেই সাহিত্যে আপন ইচ্ছামত নরনারী চিত্র অঙ্কন করিয়া থাকেন। উপন্যাসের সকল নরনারীর কাজ ঔপন্যাসিকের হুকুম তামিল করা। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ ইহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। ঘটনার বিকাশেই চরিত্রের বিকাশ এবং চরিত্রের বিকাশেই ঘটনার বিকাশ। সুতরাং 'শরৎ-সাহিত্যে নারী' বিচার-বিবেচনা করিলে একথার বাস্তবিক কোন অর্থ হয় না।

সাহিত্যে আমরা সীতাকে দেখি, কিন্তু তাহারই পাশে দেখি শূর্পণখাকে। কৌশল্যা এবং সুমিত্রার পাশেই দেখি কৈকেয়ী ও মন্থরাকে। সাহিত্যে যেমন ডেসডেমনা আছে, তেমনই লেডী ম্যাকবেথও আছে, যেমন ভ্রমর আছে, তেমনই রোহিণীও আছে, যে সাহিত্যে সূর্যমুখী আছে, কুন্দনন্দিনী আছে, সেই সাহিত্যে হীরা মালিনীও আছে। এই দুই পরস্পর বিপরীতমুখী চিত্র আপন আপন চলার পথে যা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাহারই বিকাশে সাহিত্যের বিকাশ। কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য সর্বত্র যে পক্ষপাতশূন্য তাহা বলাও ভুল হইবে। সাহিত্য আদর্শ নারী সৃষ্টি করিল সীতাকে, কিন্তু জীবনে একমাত্র দুর্বহ দুঃখভার এবং আজীবন ক্রন্দন তাহার চিরসঙ্গী হইয়া রহিল। পুরুষ সাহিত্যে আদর্শ রাজা কিন্তু অসহায় নারীর স্কন্ধে চাপিল অপরাধের বোঝা। নারী বিনা প্রতিবাদে এই অপবাদ মাথায় পাতিয়া লইল—ইহাই বৃদ্ধি করিল তাহার গৌরব, এইজন্যই পুরুষের বিচারে সে আদর্শ নারী। নারীর গুণ—সে সহনশীল।

ভারতীয় সাহিত্যে নারী সর্বত্রই সহনশীল। কিন্তু তবুও সাহিত্যে নারীর প্রতি সর্বত্র যে সুবিচার হইয়াছে তাহা বলা চলে না। নারীর প্রতি সহানুভূতির একটি বাণীও সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধদেব আসিয়াছিলেন—কিন্তু নারীর জন্য তাঁহার রাজ্যেও অন্য ব্যবস্থা। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত সাহিত্যে আমরা নারীর চিত্র দেখি—

স্বজনঃ স্বজনেন ভিদ্যতে
সুহৃদশ্চাপি সুহৃজ্জনেন যৎ
পরদোষ বিচক্ষণাঃ শঠা
স্তুদনর্থ্যাঃ প্রচরন্তি যোষিতঃ।

নারী পরদোষ দর্শনে তৎপর, নারী শঠ। নারী স্বজন হইতে স্বজনকে দূরে রাখে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনে। কেবলমাত্র ইহাই নয়—

বচনেন হরন্তি বল্গুনা
নিশিতেন প্রহরন্তি চেতসা।
মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং
হৃদি হলাহল মহদ্বিষম।

নারী মধুর কথায় চিত্তহরণ করে। নারীর মুখে মধু হৃদয়ে বিষ।

সংস্কৃত যুগে নারীর আদর্শ সীতা, নারার আদর্শ সাবিত্রী, নারীর আদর্শ দময়ন্তী। দুঃখের ভিতর দিয়াই ইহারা আমাদের হৃদয়ে আসন পাতিয়াছে। জীবনে ইহাদের অশ্রুর বান ডাকিয়াছে, ইহাদের ভাগ্য কপালে দুঃখের চরম চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে; আর ইহারা তাহাই মাত্র সম্বল করিয়া সাহিত্যে এবং কাব্যে অমর হইয়া আছে। ইহারই ফলে এই সাহিত্যে নারী গৃহিণী, সচিবঃ, সখি, প্রিয় শিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ। কিন্তু সাহিত্যের এই চিত্র সমাজে বেশীদূর প্রতিফলিত হয় নাই।

শুধু ভারতীয় সাহিত্যেই নয়, ইংরেজী সাহিত্যেও নারীজাতি সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য মনীষার অভিমত—Frailty thy name is woman, নারীজাতি সম্পর্কে শেক্সপীয়রের উক্তি এখানেই শেষ হয় নাই। তিনি Two gentlemen of Verona' নামক নাটকে বলিয়াছেন,

"The man who hath a tongue, I say, is no man,
If with his tongue he cannot win a woman,"

তাঁহার Othelo নাটকের ৪র্থ অঙ্কে নারী সম্পর্কে তাঁহার উক্তি আমরা দেখি—

It that the earth could team with woman's tears.
Each drop she falls would prove a crocodile.

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্যে শোপেন হাউয়ের মতে "Woman are a undersized, marrow-shouldered, boroad-hipped and short-legged race."

শ'এর Man & Superman নাটকে আমরা নারী চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার অভিমত দেখি,

Octovius—Dont be ungenerous Jack, They take tenderest care of us.

Tanner—Yes, as a soldier takes care of his rifle or a musician of his Violin.

টলষ্টয়ের ন্যায় মহর্ষি পুরুষও নারীবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

সংস্কৃত নীতি শাস্ত্রে মনু বলিয়াছেন,

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—স্ত্রীর স্বাধীনতা পাওয়া উচিত নয়; অর্থাৎ পুরুষের মুখাপেক্ষিতাই নারীর একমাত্র গতি।

হিন্দীকবি তুলসীদাসের রামনাম তরণীতে জগতের সকল পাপী স্থান পাইয়াছে, জগতের পাপ-সমুদ্র পার হইয়া পুণ্যরাজ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহারা ধন্য হইয়াছে; কিন্তু সে তরণীতে তিনি নারীর জন্য একটু সঙ্কীর্ণ স্থানও রাখেন নাই। হিন্দীকবির মতে—

ঢোল গঁবার শূদ্র পশুনারী।
ইয়ে সব তাড়নকে অধিকারী॥

কবি—নারী স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন,

নারী স্বভাব সত্য করি কহহি।
অবগুণ আট সাদা উর রহহী॥
অজ্ঞান অনৃত চপলতা মায়া।
ভয় অবিবেক অশোচ অদায়া॥
বিধি হু ন নারী হৃদয় ভাতিজানি।
সকল কপট অর্ঘ অবগুণ খানী॥

আমরা দেখি, বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া নারী সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। বঙ্কিম সাহিত্যে আমরা দেখি, স্ত্রী ধর্মপথে বিঘ্ন, দেশসেবার পথে কণ্টক। আনন্দমঠে স্বপ্নাগতা দেবী কল্যাণীকে দেখাইয়া বলিয়াছেন,—"ইহারই জন্য মহেন্দ্র আমার কাছে আইসে না।" আনন্দমঠের মুখবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র এই আভাসই দিয়াছেন—"বাঙ্গালী স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায় অনেক অবস্থায় নয়।"

সত্য কথা, এই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখেই আমরা শুনি—

"রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তি। রমণী চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।"

—কৃষ্ণকান্তের উইল

কিন্তু ভবানন্দের সঙ্গে কল্যাণীর কথোপকথনে ঔপন্যাসিক যেন কল্যাণীর উক্তিরই সমর্থক বলিয়া আমাদের মনে হয়।

"কল্যাণী—আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদা-পোরা কলসী বাঁধা, সেকি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসি, তুমি এ ছার জীবন রাখিয়া ছিলে?

ভবানন্দ—স্ত্রী সহধর্মিণী, ধর্মের সহায়।

কল্যাণী—ছোট ছোট ধর্মে, বড় বড় ধর্মে কণ্টক।"

রবীন্দ্র-উপন্যাস সাহিত্যে আনন্দময়ী, বিমলা, সুচরিতা প্রভৃতি চরিত্র জীবন্ত এবং গতিশীল সন্দেহ নাই। কিন্তু কেটী, সিসি, লিসি প্রভৃতিকে মোড়কে মোড়া প্যাকেট করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করিয়াছেন। অভিজাত বাঙালী সমাজের কৃত্রিম চাকচিক্যের মধ্যে কোথাও কোথাও ইহাদের দর্শন মিলিলেও বৃহত্তম বঙ্গ-সমাজে ইহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে সমাজের ওপর ইহাদের কোন প্রভাবও দেখা যায় না।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে নারী ইহার ব্যতিক্রম। শরৎ-সাহিত্যে সর্বত্র নারী দেবী নয়, একথা সত্য। আলোক-বর্তিকা হস্তে নারী এখানে স্বর্গের পথ দেখায় না, কিন্তু তাই বলিয়া জগৎটাকে টানিয়া নিয়া নরকের দ্বারেও পৌঁছাইয়া দেয় না। শরৎচন্দ্র নারীর যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার অবকাশ আছে, তবুও ঔপন্যাসিকের কল্পনালোকেই এখানে নারীর বাস নয়। সমস্ত রকম কল্পনার ভিতর হইতে সামাজিক নারীর রূপটিকে চিনিয়া লইতে আমাদের কোন কষ্টই হয় না। আমরা দেখি, শরৎ-সাহিত্যে নারীর রূপ না থাকিলেও হৃদয় আছে এবং সে-হৃদয়ে সুখদুঃখ আছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে এবং ব্যথা-বেদনা আছে।

শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, আমাদের সমাজে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শরৎ-সাহিত্যে নারীর জীবন শুধু তাহার আপন সুখদুঃখ এবং কতকগুলি ঘটনা সংঘাতের পরিচয় নয়। নারীর গৃহসংসার, নারীর মাতৃত্ব, নারীর গৃহিণীপনার ভিতর দিয়াই নারী তাহার এই স্থানটি অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই স্থান তাহার নির্বিবোধ নয়। নারীর জন্য অপরিসীম দুঃখ

রাজলক্ষ্মীর অন্তরের গর্বিতা নারী পুঁটুর নিকটই পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল—'যদি কখনো অসুখে পড়ো দেখবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরে আসবো তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে? তার পরেও বেঁচে থাকতে বলো নাকি?"

এতদিন রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল কিন্তু এবারে হারাইবার সম্ভাবনায় সে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহাকে কঠোর বন্ধনে বাঁধিতে চাহিল—"ভেবেচো বুঝি হঠাৎ আমি তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম? কুড়িয়ে পেয়েছিলুম অনেক তপস্যায়, অনেক আরাধনায়। তাই বিদায় দেবার কর্ত্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নাই।"

শ্রীকান্তের নিকট রাজলক্ষ্মী তাহার হৃদয় অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিল—"তুমি ভাবো গুরুদেব দিয়াছেন আমাকে মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র দিয়েছে পথের সন্ধান, সুনন্দা দিয়েছে ধর্ম্মের প্রবৃত্তি, আর তুমি দিয়েছো শুধু ভার বোঝা। এমনই অন্ধ তোমরা।"

রাজলক্ষ্মী আশা করিয়াছিল, পূজা-পাবন-ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়া একদিন তাহার পিয়ারী জীবনের সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইবে, আবার সে নিষ্পাপ হইয়া উঠিবে। শ্রীকান্তকে সে জানাইয়াছিল, এ লোভ তাহার স্বর্গের জন্য নয়, স্বর্গ সে চায় না। কামনা তাহার—"মরণের পরে আবার যেন এসে জন্মাতে পারে।" রাজলক্ষ্মী মনে করিয়াছিল, জলের যে-ধারা কাদায় ঘুলিয়ে গেছে তাহাকে আবার নির্মল করিয়া লইবে। "কিন্তু আজিকার চিন্তা—উৎসাহ যদি যায় শুকিয়ে তো থাকলো আমার জপতপ পূজা অর্চনা, থাকলো সুনন্দা, থাকলো গুরুদেব।"

দূর হইতে শ্রীকান্তের নিকট পত্র লিখিয়া রাজলক্ষ্মী ইহা জানাইয়াছিল। কিন্তু, তাহার পরও সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, শ্রীকান্তকে লইয়া যাইবার জন্য সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এবার সে যেন এক নূতন দৃষ্টি লাভ করিল, এক নূতন চোখে সে শ্রীকান্তকে দেখিতে পাইল—"এ যে এত সুন্দর এব আগে কেন চোখে পড়েনি? এতদিন কি কানা হয়েছিলুম? ভাবলুম এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই। এ যদি অধর্ম্ম তবে থাকলো আমার ধর্ম্মচর্চ্চা, জীবনে এই যদি মিথ্যা হয়, তবে জ্ঞান না হতেই একে বরণ করেছিলুম কার কথায়?"

রাজলক্ষ্মী নিজেই তাহার অবস্থা জানাইয়াছে। শ্রীকান্তকে বিদায় দিয়া তাহার চোখের জল থামে নাই, ইষ্টমন্ত্র সে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঠাকুর-

দেবতা অন্তর্ধান করিয়াছিল। তারপর যেদিন সে সত্যই শ্রীকান্তকে ফিরিয়া পাইল, শ্রীকান্তের মধ্যেই সে তাহার ঠাকুরদেবতাকে ফিরিয়া পাইল। শ্রীকান্তকে সে তাহার এই অবস্থার কথাই জানাইয়াছিল—"বাড়ী এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম, তুমি কেবল একাই ফিরে আসোনি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্ট দেবতা, আমার গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। চোখ দিয়ে আমার জল পড়তে লাগলো, সে রক্ত নেঙ্‌রানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে ভরা ঝরণার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে গেল।"

পরিপূর্ণভাবেই রাজলক্ষ্মী সেদিন শ্রীকান্তর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। অকুণ্ঠিতচিত্তে পিয়ারী বাইজীকে সেদিন প্রিয়তমের চরণতলে নিবেদন করিয়াছিল, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত গ্লানি, সমস্ত বেদনা ইহার পর দূর হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী বাঁচিল।

সমাজের সঙ্গে নারীহৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব দেখি রমার জীবনেও। শীতলাতলায় পাঠশালায় বসিয়া যখন রমেশের সঙ্গে তাহার শৈশব-হৃদয় বিনিময় করিয়াছিল, সমাজ তখন দূরে থাকিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল। রাণী যেদিন মাতৃশোকাচ্ছন্ন রমেশকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল—"কেঁদোনা রমেশদা; আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।"—ভবিষ্যৎ সেদিন সমাজের নির্মম নিষ্ঠুরতার দিকে চাহিয়া বোধহয় বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই নারীহৃদয়ের নীরব আকুল আবেদন দেখি রমার প্রতি দীর্ঘশ্বাসে। আপন ব্যর্থ জীবনের জন্য সমাজের এক কোণে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান সে চাহিয়াছিল। হৃদয়ের সমস্ত আশা-অকাঙ্ক্ষা, সমস্ত শুভ ইচ্ছা, আপনার সমস্ত মঙ্গলকে রমা সমাজের জন্যই দলন করিতেছিল। সমাজের প্রত্যেক আজ্ঞা এবং অনুজ্ঞা বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতই রমা পালন করিতেছিল। আমরা দেখি, সমাজের নিকট এই আত্মবিসর্জন, এই আত্মসমর্পণে হৃদয় তাহার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইতেছিল। এ যেন সমাজের পায়ে তাহার আত্মদান। সমস্ত ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য উপেক্ষা করিয়া রমার নারীহৃদয় সমাজেরই আশ্রয়ে একটু দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষালের পরিচালিত পল্লীসমাজ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না, নিতান্ত অকারণে, বোধহয় নারীহৃদয় বলিয়াই, তাহাকে দারুণ আঘাত করিয়া সমাজের ছায়া হইতেও বাহির করিয়া দিল। বিশ্বেশ্বরীর হাত ধরিয়া ভগ্নহৃদয়ে রমা সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার একান্ত নিঃস্ব, সর্বহারা,

অসহায় মুখশ্রীর দিকে একবারও কেহ চাহিয়া দেখিল না। সমাজ বুঝিল না; বুঝিতে চাহিল না—এই অসহায় আত্মদানে নারীহৃদয় আপনার কতখানি বিসর্জন করিয়াছে এবং একমাত্র সমাজের দিক চাহিয়াই ইহা সে করিয়াছিল।

সমাজের সঙ্গে নরনারীর হৃদয়ের দ্বন্দ্ব আমরা ইহার পূর্বে বঙ্কিম সাহিত্যেও দেখিয়াছি। শৈবলিনী এবং প্রতাপ দুইজনেই দুইজনকে একান্তভাবে ভাল বাসিযাছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল সমাজ। আমরা দেখি, রোহিনীর জীবনকে যে সার্থকতা দেয় নাই সেও এই সমাজ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে সমাজকে বিচারের মধ্যে টানিয়া আনেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্রে প্রতাপ শৈবলিনীকেই আমরা দেখি, কিন্তু যে সমাজের ছায়ায় তাহারা পরিবর্ধিত সে-সমাজকে আমরা দেখিতে পাই না। সমাজের বিচার না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিচার করিয়াছেন প্রতাপ ও শৈবলীনীর। বঙ্কিম-সাহিত্যে পাঠকের সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই না। কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে সমাজের শক্তি প্রত্যক্ষভাবেই অনুভূত হয়। শরৎ-সাহিত্যে সমাজ সম্পর্কে প্রশ্ন আছে, দ্বিধা-সঙ্কোচ আছে। কিন্তু সমস্ত বিচার-বিবেচনা করিয়াও শরৎচন্দ্র এখানে জয়মাল্য সমাজের গলায়ই পরাইয়া দিয়াছেন। সমাজের জন্য হৃদয়কে যে বলি দিতে হইবে—এই অলঙ্ঘ্য নিয়মকে শরৎচন্দ্রও মানিয়া লইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, হৃদয়ের পক্ষেই সত্যধর্ম হৃদয়ের পক্ষেই ন্যায়, তবুও আত্মসমর্পণ তাহার সমাজের নিকট চাই—তা সমাজ যত অন্যায় এবং অত্যাচারীই হউক না কেন। অবশ্য শরৎ-সাহিত্যে ইহার মঙ্গলময় পবিণতি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে; এ সম্পর্কে প্রশ্ন আছে এবং অভিযোগও যে নাই তাহা নহে। কিন্তু রমার জীবনে এই দ্বন্দ্বও ইহার পরিণতি সর্বাপেক্ষা করুণ। সমাজ অন্যায়ভাবেই তাহাকে দণ্ডিত করিয়াছে। সমস্ত অন্যায় দণ্ড মাথায় লইয়া সে দূরে থাকিয়া গেল, অথচ এক বিন্দু সহানুভূতির অশ্রুও সে কাহারও নিকট হইতে আশা করিতে পারিল না। বমার জীবনে ইহা মর্মান্তিক এবং হৃদয় বিদারক।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—শৈশব প্রেমে অভিশাপ আছে। প্রতাপ এবং শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় এইজন্যই তিনি অভিশাপাঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রমা এবং রমেশ সম্পর্কে ইহা যে আরও সত্য তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শীতলাতলা পাঠশালায় বাগ্‌দেবী তাহাদিগকে কতখানি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছিলেন আমরা জানিনা, কিন্তু মীনকেতু কন্দর্প দেবতা এই দুই শৈশব হৃদয়কে তাঁহার মন্দিরে সাগ্রহেই স্থান দিয়াছিলেন, এবং এখানে এক গভীর

দুঃখ তাহাদের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রমা সকলই রমেশের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইতে পারিত, এমন কি মাতৃস্নেহ পর্যন্ত এবং খুড়িমার হৃদয়ে যদু মুখুয্যের কন্যার জন্য একটু বিশেষ স্নেহই সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তবুও ঘোষাল গৃহে রমার বধূভাবে পদার্পণ সম্ভব হইল না। দীর্ঘ অদর্শন এবং ইতোমধ্যে রমা এবং রমেশের উভয়েরই জীবনে বিরাট ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে উভয়েই হয়ত উভয়কে কতকটা ভুলিয়াছিল। শীতলাতলায় রমা ভুলিয়াছিল। তাই রমেশের সঙ্গে পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে বেণীর নিকট সে গর্ব করিয়া বলিয়াছিল—"উত্তর দিবে বাইরে দারোয়ান।" কিন্তু ইহার পরেই রমেশ আসিয়া যখন ডাক দিল, 'রাণী কই রে?', আমরা দেখি, রমার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, এক মুহূর্ত পূর্বের তাহার সকল সংকল্প ওলটপালট হইয়া গেল; রমেশ যে আবার শীতলাতলার পুরাতন স্মৃতিকেই বহন করিয়া আনিবে ইহা সে মুহূর্ত পূর্বেও বুঝিতে পারে নাই। হৃদয় তাহার ছুটিয়া যাইতে চাহিল তাহার রমেশদার নিকট; কিন্তু বাধা দিল পল্লীসমাজ। পল্লীসমাজের বেণী ঘোষাল তাহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। হয়ত পল্লীসমাজের মর্যাদা সেদিন রক্ষা নাও হইতে পারিত, কিন্তু যথাসময়ে মাসি আসিয়া রমেশের অত্যাচার হইতে শুধু পল্লীসমাজকে রক্ষা করিল না, রমাকেও রক্ষা করিল।

রমেশ সেদিন ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গিয়াছিল, তবে রমা সম্পর্কে তখনও হয় ত তাহার সম্পূর্ণ কোনরূপ ধারণা হয় নাই। ইহার পর পাঠশালায় মাষ্টার মহাশয়ের নিকট সে যখন শুনিয়াছিল, যদু মুখুজ্যের কন্যা সতীলক্ষ্মী, একমাত্র তাহার দয়ায়ই স্কুলটি টিঁকিয়া আছে; আমরা দেখি, শুনিয়া রমেশের চিত্ত প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই মাছের ভাগের জন্য ভজুয়াকে সে আর কাহারও নিকট না পাঠাইয়া রমার নিকটই পাঠাইয়াছিল। রমার প্রতি বিশ্বাস তাহার তখনও অটুট ছিল। তাই ভজুয়ার নিকট সে বলিয়া পাঠাইয়াছিল—"আমি নিশ্চয় জানি, মা-জীর জবান থেকে কখনো ঝুটা বাত বা'র হবে না।" কিন্তু রমেশ তখন জানিত না, রমা কত নিরুপায়, পল্লীসমাজের বুকে সে কত অসহায়! পল্লীসমাজের সঙ্গে নীরব দ্বন্দ্বে এবং নিষ্ঠুর সংগ্রামে নারীহৃদয় যে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে,—এ সংবাদ রমেশ রাখিত না। রমেশ জানিত না, সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক পল্লীসমাজের সম্মান রমাকে রাখিতেই হইবে। তাই রমেশের বিশ্বাস রমাকে নিষ্ফল আঘাত করিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, বেদনা দিয়াছে কিন্তু প্রতিষ্ঠা পায় নাই। রমার ভয় ছিল, রমেশের জন্য সহানুভূতির

ফাঁক দিয়া তাহার আপন গোপন অন্তরটি কোনক্রমে লোকচক্ষুর নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে। তাই সমস্ত দিক সে শক্ত করিয়া বাঁধিতে চাহিয়াছিল। মাছ-ভাগ ভজুয়া আসার আগেই হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং রমেশের হইয়া আবার নতুন করিয়া মাছ ভাগের অনুরোধ সে কোনক্রমেই করিতে পারিত না। কিন্তু সে যাহা পারে না বলিয়া রমেশের বিশ্বাস এবং দুই দণ্ড আগেও তাহার নিজেরও বিশ্বাস ছিল, তাহাই সম্ভব হইল। রমা মিথ্যার আশ্রয় লইয়াই পল্লীসমাজের মর্যাদা রক্ষা করিল। তাহার আপন গৌরব, আপন হৃদয় যে এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার নিজেরই পায়ের নীচে লুকাইয়া গেল, একবার সেদিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না। হয়ত একটা দীর্ঘশ্বাসই তাহার এই সময়ের অন্তরের চিরসাথী হইয়া রহিল! শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—"ভজুয়ার কথা শুনিয়া তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়াই এমনি সাদা হইয়া গিয়াছিল, যেন কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।" বিশ্বেশ্বরীও একদিন তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। জ্যাঠাইমা তাহাকে জানাইয়াছিলেন, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও রমেশের কত বড় বিশ্বাস রমার উপরে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন "বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার যতই দাম হোক না, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক বেশী।" রমেশের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তে লিপ্ত হইতে তিনি রমাকে প্রকারান্তরে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরীও সেদিন রমাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি বুঝেন নাই যে রমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কত বড় মিথ্যা। ন্যায়পরায়ণ মাতৃহৃদয় ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তাই এখানে তিনি শুধু অত্যাচারই দেখিতেছিলেন এবং সে-অত্যাচারের সঙ্গে রমাকেও জড়িত দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহারই অন্তরালে আর একটি অসহায় প্রাণ যে ততোধিক অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া গুমরিয়া মরিতেছে, বিশ্বেশ্বরী তাহা দেখিতে পান নাই। তাই নারী হৃদয়ের প্রতি অত্যাচারের উপর তিনি অবিচারের বোঝাও চাপাইতেছিলেন। আমরা জানি, বিশ্বেশ্বরীর প্রত্যেকটি কথাই রমার হৃদয়ের কথা। জীবনে ইহা অপেক্ষা অধিক কাম্য তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই। হৃদয় যাহার জন্য কাঁদে, যাহার সামান্য দুঃখ দূর করিতে চরম আত্মদানও তাহার নিকট তুচ্ছ, যাহার পথের সম্মুখ হইতে কাঁটাটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য সে তাহার সমস্ত হৃদয় পাতিয়া দিতে পারে তাহার চরম সর্বনাশের মুহূর্তেও সে পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিল না, তাহাকে সান্ত্বনা

দিতে পারিল না, তখন তাহার অপেক্ষা দুঃখী, তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কে আছে? শুধু ইহাই নয়, যে তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, যাহার মঙ্গলাকাঙ্খা তাহার সর্বাধিক কাম্য, তাহার দুঃখের মাত্রা আজ নিজেই সে বাড়াইয়া দিতেছে। ইহা অপেক্ষা বড় অভিসম্পাত তাহার জীবনে আর কি হইতে পারে?

ঘটনাচক্র অতি নির্মম হইয়াই রমাকে আঘাত করিতেছিল। জগৎ জানিল, রমাই রমেশের সর্বনাশের মূল। রমেশ নিজেও জানিল, রমা অপেক্ষা তাহার জীবনে বড় অমঙ্গল আর কিছুই নাই। একমাত্র রমাই জানে, কতবড় মিথ্যা একথা। কিন্তু সে অসহায়, সে নিরুপায়। আমরা দেখি, সমাজ তাহাকে আঘাত করে, বিশ্বেশ্বরীর উপদেশ তাহাকে আঘাত করে, রমেশের বিশ্বাস তাহাকে আঘাত করে।

তারকেশ্বরে রমেশের সঙ্গে রমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রমেশ চিনিতে পারে নাই কিন্তু রমাই তাহাকে চিনিয়াছিল, সঙ্গে করিয়া আপন বাসভবনে লইয়া গিয়া পরম যত্নে নিজ হাতে তাহাকে খাওয়াইয়া এক অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। খাবার সময় রমেশ তাহাকে জানাইয়াছিল—"আমি ত তোমার কেউ নয় রমা, বরং পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী বলে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার তো মনে হয়, পরের দুঃখ কষ্ট দেখলে তারা পাগল হ'য়ে ছোটে।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, কথা শুনিয়া রমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানি, রমেশের পক্ষে ইহা প্রাণভরা পরিতৃপ্তির বাণী ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু নিরীহ এবং নীরব এক নারীহৃদয়কে ইহা তীক্ষ্ণ শরের মতই আঘাত করিতেছিল। এই নীরব আঘাত, এই মধুর বিষাক্ত শর রমা নীরবেই সহ্য করিয়াছিল। নির্জন গৃহের মধ্যে তাহার নীরব অশ্রুপাতের কোন সাক্ষীই সেদিন ছিল না। এই দিনই সে হয়ত প্রথম উপলব্ধি করিল—জীবনে অভিশপ্ত সে, যাহা কিছু তাহার ছিল, যাহা কিছু মধুর তাহাই তাহার নিকট বিষ। কিন্তু পল্লীসমাজের তূণে ইহা অপেক্ষাও কঠিন শর যে সঞ্চিত আছে রমা সেদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। তারকেশ্বরে যাহাকে কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ সে পাইয়াছিল, দুই দিন যাইতে না যাইতেই নিজের মিথ্যা সাক্ষ্যের বলে তাহাকেই জেলে পুরিতে হইল। পল্লী-সমাজের কঠোর শাসনে নারীহৃদয়ের ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। কেননা, তাহা না হইলে দুইদিন পরেই যে তাহার বাড়ীতে মহামায়ার পূজা,

সেদিন এ বাড়ীতে পল্লীসমাজের কেহই পদার্পণ করিবে না এবং তারপরেই আছে ছোট ভাই যতীনের উপনয়ন, সেদিন এ বাড়ীতে কেহ অন্নগ্রহণ করিবে না। পল্লীসমাজের কোলে লালিত-পালিত এবং পরিবর্ধিত এক অসহায় নারীহৃদয়ের পক্ষে এই ভীতি যে কত ভয়ানক, তাহা উপলব্ধি করা সহজ নহে। এইজন্যই রমা না পারিয়াছে রমেশকে উপেক্ষা করিতে, না পারিয়াছে পল্লীসমাজকে উপেক্ষা করিতে এবং ইহারই জন্যই ক্রমাগত সে কেবল আঘাতের পর আঘাতই সহ্য করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত পল্লীসমাজের নিকট নীরব পরাজয় বরণ করিয়াছে।

রমা রমেশকে জেলে দিয়াছিল মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে, লাঠিয়াল আকবরকে পাঠাইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে বাঁধ কাটিতে, মাসীও ছোটখাটো কাজে তাহাকে সাহায্যই করিতেছিল। তাই বাহিরের দিকে পল্লীসমাজের সঙ্গে তাহার কোন দ্বন্দ্ব আমরা দেখি না। পল্লীসমাজের সম্মান এবং মর্যাদা সে শুধু অক্ষুন্ন রাখিয়া চলে নাই, তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপ সে-ই অগ্রণী হইয়া রমেশকে দেখাইয়াছিল। কিন্তু ইহার পশ্চাতে ছিল বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর সমাজের প্রতি বনার ভয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রমেশের মঙ্গলাকাঙ্খা, রমেশের বিপদাশঙ্কা তাহাকে যে কখনও অভিভূত করে নাই, তাহা নয়। শুধু অন্তরেই রমা ইহা পোষণ করিতেছিল তাহা নয়, মাঝে মাঝে নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত রমেশের পাশে দাড়াইতে.ইহা প্ররোচিত করিয়াছে। বেণীকে একদিন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,— "আচ্ছা বড়দা, রমেশদা যদি জেলে যান, সেকি আমাদের কলঙ্কের কথা নয়?" আমরা জানি, অন্তর তাহার আরও কিছু বলিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু পল্লী--সমাজের ভয়ে সে-হৃদয় প্রকাশ করিবার তাহার উপায় ছিল না। কিন্তু তবুও দেখি, অন্তর তাহার এখানে থামিতে পারে নাই। পল্লীসমাজের হীন ষড়যন্ত্র হইতে রমেশকে রক্ষা করিবার জন্য সে তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়াছিল। রমেশের গৃহে একাকী রমেশের সহিত ধরা পড়িলে পল্লীসমাজের নির্মম দণ্ড তাহার জন্য সঞ্চিত আছে, ইহা সে জানিত; কিন্তু রমেশের আসন্ন বিপদাশঙ্কা তাহাকে যে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল এবং এইজন্যই আপনার বিপদাশঙ্কাকে সে জয় করিতে পারিয়াছিল। রমেশের গৃহে গিয়া পল্লীসমাজের বিরুদ্ধে এবং তাহার নিজের বিরুদ্ধেও সে রমেশকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। এই অবস্থায়ই যখন হঠাৎ পুলিশ আসিয়া পড়িল, রমা বিপদের মুখে রমেশকে ফেলিয়া দিয়া পলাইতে পারে নাই। রমেশের গৃহে পুলিশ তাহাকে দেখিলে এ ব্যাপার পল্লীসমাজের অজানা থাকিবে না, ইহা সে জানিত এবং ইহার পরিণতি কি হইবে, তাহাও

তাহার অবিদিত ছিল না; কিন্তু তবুও রমেশের বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া সে আপনার বিপদ ভুলিয়া গিয়াছিল। রমেশ তাহাকে কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু রমা কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"আমি যাবো না।" শেষ পর্যন্ত রমা থাকিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, রমেশ জোর করিয়াই দুইটি ভাই-বোনকে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিল। রমেশের গৃহে সেদিন ধরা পড়িলেও রমা সেদিন তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না তবুও সে-যে যাইতে চাহে নাই, হৃদয়ের একান্ত উত্তেজনা বশেই তা সম্ভব হইয়াছিল। এইরূপ উত্তেজনার মধ্য দিয়া তাহার হৃদয় যে মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়িত না তাহা নয়। লক্ষ্মীর কথায় প্রতিবাদ জানাইয়া একদিন সে বলিয়াছিল,—"লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা; আজ মারা পড়লে তোর বাবা স্বর্গে যেতে পারত।" আমরা জানি, রমার হৃদয়ের গভীর সত্যই ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পল্লীসমাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রমা তাহার সাধ্যাতীত করিতেছিল; কিন্তু তবুও সে-সমাজে সে থাকিতে পারিল না। পল্লীসমাজ তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল না; বরং সমাজই তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিল। একমাত্র বিশ্বেশ্বরীর নিকটই রমা তাহার হৃদয় প্রকাশ করিয়াছিল। মৃত্যুর পরে রমেশকে সে জানাইতে বলিয়াছিল—যত মন্দ বলিয়া রমেশ তাহাকে জানিয়াছিল, তত মন্দ সে ছিল না, যত দুঃখ সে রমেশকে দিয়াছে, তাহার অনেক বেশী দুঃখ সে নিজেই পাইয়াছে। বিশ্বেশ্বরী রমাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন। যাবার পূর্বে রমেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?" বিশ্বেশ্বরী উত্তর করিয়াছিল—'সংসারে তার স্থান নেই। তাই তাহাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্চি। সেখানে গিয়াও সে বাঁচে কিনা জানি না। যদি বাঁচে, সারা জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাহাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়া সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়া আবার সংসারের বাহিরে ফেলে দিলেন। একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা।"

সমাজের খেয়ালের আর এক খেলা দেখি আমরা পার্বতীর জীবনে। কিন্তু রমা ও পার্বতীর হৃদয় এক বস্তু দিয়া গড়া নয়। রমার ন্যায় পার্বতীর জীবনেও সমস্ত কামনা-বাসনা, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল সমাজ।

সমাজই দেবদাসের পিতা নারায়ণ মুখুজ্যেকে কুল হাসাইতে নিষেধ করিয়াছিল এবং পার্বতী যে 'বেচাকেনা চক্রবর্ত্তী ঘরের মেয়ে,' মুখুয্যে গৃহিনীকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

আমরা দেখি, রমা অপেক্ষা পার্বতী শক্তিশালিনী। সমাজের দারুন আঘাতে রমার হৃদয় যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, পার্বতীর হৃদয় সেরূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। হাতীপোতা গ্রামের সে জমিদার গৃহিনী, সে মহেন্দ্রের মা এবং যশোদা তাহার কন্যা। তের বৎসরের পার্বতী যে হৃদয়ে এক বিরাট আগ্নেয়গিরি পোষণ করিতেছে, বাহির হইতে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। ভূমিকম্পে ফাটিয়া চৌচির হইয়া গলিত উত্তাপ তাহার বিপুল বেগে বাহিরে আসে নাই সত্য, কিন্তু প্রবল কম্পন তাহার কিছু যে অনুভব করা যায় না তাহাও নয়। নীরব অশ্রুবিন্দু তাহার কোষাকুষির জল বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু উহাতে যে বন্যার বেগ নিহিত আছে তাহা আমাদের অজানা নাই।

কিন্তু তবুও পার্বতী ভাগ্যহীনা। একদিনের জন্যও আপনার জীবনকে সে স্বকীয় জীবনরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাকে চিরজীবন অভিনয় করিয়াই কাটাইতে হইয়াছে এবং ভাগ্য তাহাকে পরাজয়ের খাদেই ঠেলিয়া দিয়াছে। জীবনের তীব্রতম অভিশাপ, তাহার হৃদয়ের অসহ্য দুঃখ দহন একদিনের জন্যও কাহারও নিকট সে প্রকাশ করিতে পারে নাই। আপনার কল্যাণহীন, অভিশপ্ত জীবনকে স্মরণ করিয়াও একবিন্দু অশ্রু মোচন করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

পার্বতী আশৈশব জানিয়া আসিয়াছে দেবদাদা তাহারই এবং একান্তভাবে উহাই বিশ্বাস করিয়াছে। তাহার হৃদয়ের সাধ ছিল, একদিন এই দেবদাদারই 'পারু' হইয়া তাহার ভালমন্দ মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই নিজ হাতে তুলিয়া লইবে। কিন্তু হঠাৎ ঝড় উঠিল, আশালতা তাহার ছিন্নভিন্ন হইয়া ঝটিকাবেগে কোথায় উড়িয়া গেল; চক্রবর্তী গৃহের তের বছরের পারু একদিনেই পার্বতী সাজিয়া বসিল। বি-এ পাশ করা মহেন তাহার ছেলে এবং স্বামী-পুত্র-কন্যাসহ যশোমতী তাহার মেয়ে। শুধু একদিন নয়, সমগ্র জীবন ধরিয়া পার্বতী এই অভিনয়ই করিয়াছে।

আমরা দেখি, পারুর পিতা নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী মধ্যবিত্ত গৃহী, আর তাহার দেবদা জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের পুত্র। দুইটি বাল্যহৃদয় একই পথ বাহিয়া চলিতেছিল। সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে কাহারও কোন ধারণাই ছিল না। পার্বতীর বয়স আট এবং দেবদাস বার বছরের; কিন্তু ইহার মধ্যেই উভয়ের উপর উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে দুইজনের মধ্যে কাহারও মনেই কোন প্রকার সন্দেহ

ছিল না। আমরা দেখি, শিশুসুলভ অপরাধ করিয়া দেবদাস আমবাগানে ঢুকিয়া পড়িতেছে এবং অনাহারে অনশনে হুঁকাকল্কি মাত্র সম্বল করিয়া সেখানে পড়িয়া আছে। তখন দেবদাপরায়ণ পারুই তাহাকে মুড়ি যোগায় এবং সঙ্গে করিয়া সন্দেশ ও জল না আনার জন্য প্রহারও খায়। রাগের মাথায় দেবদার নামে আসিয়া সে নালিশ করে কিন্তু পরক্ষণেই দেবদার পক্ষে ইহার ফল কি হইবে মনে করিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। সে রাত্রে তাহার আহার হয় না। বিছানায় পড়িয়া সে অনুতাপের অশ্রুপাত করে এবং সমস্ত রাত্রিই তাহার ঘুম হয় না। আর পরদিন পারুর গায়ে নিজের প্রহারের চিহ্নাঙ্কন দেখিয়া দেবদাসের মুখ হইতেও আহাসূচক দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে। পারু জানিত, দেবদাসের অর্থে তাহার অবাধ অধিকার। তাই মণকষা না জানা তিন ভিক্ষুককে সে তিনটাকা দিয়াই তাহাদের ভাগাভাগির সমস্যার সমাধান করে। দেবদা মণকষা জানে, সেও তাহারই গৌরব, সমস্ত শিশুহৃদয় দিয়া সে এই গৌরবকে অনুভব করে।

শৈশব-হৃদয় দেনা-পাওনার হিসাব রাখিত না। পার্বতী জানিত, দেবদা চিরদিনই তাহাকে এমনি করিয়া টাকা আনিয়া দিবে এবং সে যেমন খুশি ব্যয় করিবে। আর দেবদাস জানিত, চিরদিনই তাহার পারু আমবাগানে তাহাকে মুড়ি যোগাইবে, ইহাই তাহার কাজ। কিন্তু দুইজনের মাঝখানে কঠিন শাসনদণ্ড হাতে লইয়া সমাজশক্তি যে দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটি করিতেছে, তাহাকে ইহাদের কেহই দেখিতে পায় নাই।

দুই বাল্যহৃদয় পরস্পরকে একান্ত নিবিড় করিয়াই ভালবাসিয়াছিল। অজ্ঞান শিশুহৃদয় মনে করিয়াছিল, এইভাবেই তাহাদের চিরদিন কাটিবে। দেবদাসকে না দেখিলে পারু অস্থির হইয়া তাহার সন্ধান করিবে এবং পারুকে না পাইলে দেবদাস চক্রবর্তী-গৃহের জানালার নীচে আসিয়া 'পারু ও পারু' বলিয়া ডাকিতে থাকিবে। কিন্তু মিলনের এই নিবিড় আনন্দ বিচ্ছেদের ছায়াপাতে কোনদিন যে ম্লান হইতে পারে, এ সম্ভাবনার কথা একদিনের জন্যও কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু সংসারের এক স্বাভাবিক নিয়মেই এই মিলনে ছেদ পড়ে, স্বাভাবিক নিয়মেই শিশুহৃদয় বড় হয়। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহাদের জীবনের সুর কখনও খাদে, কখনও চড়ায় বাজিতে থাকে এবং ইহারই ফলে তাল মান লয় সকলই তাহারা হারাইয়া ফেলে। এই নিয়মের বশেই দেবদা হইয়া পড়ে কলিকাতার শহুরে জীব। রাজনীতি, সভা-সমিতি, ক্রিকেট ও ফুটবল রাজ্য

অতিক্রম করিয়া কিশোর মন তাহার তালসোনাপুরের আমবাগানে বা চাঁপা গাছে পৌছিতে পারে না। আর—আট বছরের পার্বতীও বারতে পা দেয় এবং রূপ ও দেহশ্রী তাহার মনে এক অনিশ্চিত ভাবনা আনে। দেবদাসের মন তালসোনাপুরের সন্ধান আর রাখিত না সত্য; কিন্তু পার্বতীর মন চিরদিনই এক অজানা কলিকতায় পড়িয়া থাকিত। ইহার মধ্যে সে যে দেবদাসের সাক্ষাৎ দুই-একবার পায় নাই, তাহা নয়; কিন্তু সে তখন আর তাহার তালসোনপুরের দেবদা নয়। পার্বতীর মন জুতা জামা কাপড়, ছড়ি, ঘড়ি এবং বোতাম ভেদ তাহার অভীষ্ট স্থানে আর পৌছিতে পারে নাই। শরৎচন্দ্র ইহার পূর্বে আট বছরের পার্বতীর কথা বলিয়াছেন—"যেদিন দেবদাসের পত্র আইসে, সেদিনটি পার্বতীর বড় সুখের দিন। সিঁড়ির ঘরে চৌকাঠের উপরে কাগজখানি হাতে লইয়া সে সারাদিন তাহাই পড়িতে থাকে।" কিন্তু আমরা জানি, আট বৎসরের পারু সেদিন শুধু চিঠিই পড়িত না ঐ চিঠির রূপ ধরিয়া ধ্যানমগ্ন মন তাহার সুদূর কলিকাতায় দেবদারই পাশে চলিয়া যাইত। দীর্ঘ তের বছর তাহার দেবদারই ধ্যান করিয়া কাটিয়াছে, আজ তাহাকে হারাইতে হইবে, এই কথা মনে হইতেই সমস্ত হৃদয় ভরিয়া এক ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল। আমরা জানি, হৃদয়ের এই উত্তাল তরঙ্গই তাহাকে জমিদারীর দেউড়ী পার করিয়া গভীর রাত্রে দেবদাসের কাছে লইয়া গিয়াছিল। এ কাজে সখি মনোরমা তাহার সঙ্গে একমত হইতে পারিতেছিল না; কিন্তু পার্বতী তাহাকে কহিয়াছিল—তুই সই, আমার আপনার কিন্তু তিনি কি পর? যে কথা তোকে বলতে পারি সে কথা কি তাকে বলা যায় না? এইখানেই আমরা পার্বতীকে প্রেমে আত্ম--প্রতিষ্ঠ দেখি। পদ্মপাত্রে জলের মত সে-প্রেম টলমল করে নাই, সে একানষ্ঠ। কোনদিনই সে দেবদাসকে আপনার হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে পারে নাই, এমনকি হাতীপোতা গ্রামে গিয়াও নয়। পার্বতীর কথা শুনিয়া মনোরমা সেদিন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল কিন্তু পার্বতী তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়াছিল—"মনো দিদি, তুই মিছিমিছি মাথায় সিঁদুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই জানিস নে।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, একথা সত্য। ইহারা অনর্থক সিঁদুর পরে; হাতে নোয়া দেয়। কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের এই দিকটা যত উজ্জ্বল, যত গৌরবময়ই হউক না কেন, অপ্রার্থিত আত্মসমর্পণ কোনকালেই মিলনের গৌরবে পৌছিতে পারে না। হৃদয় চায় হৃদয়কে জয় করিতে, অযাচিত আত্মদানকে কোনকালেই সে প্রতিষ্ঠা দেয় না।

তাই পার্বতীকে বিফল হইয়াই সেদিন ফিরিতে হইয়াছিল। নদীতে কত জল ছিল আমরা জানিনা, পার্বতীর কলঙ্ক সে জলে চাপা পড়িল কিনা, তাহারও সন্ধান রাখিনা। কিন্তু তরঙ্গ তাহার দেবদাসের হৃদয়ে যে পৌছিতে পারে না, ইহা আমরা দেখি। কিন্তু ভুল যখন কাটিল তখন সময় আর নাই। অভিমানী নারী হৃদয় ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিয়া আরও অভিমানী হইয়া উঠিয়াছে। ফলে 'চাঁদের উপর কলঙ্কের দাগ' লইয়াই পার্বতীকে গৃহে ফিরিতে হইল এবং তালসোনাপুর ছাড়িয়া নববধূ সাজে হাতীপোতা গ্রামের জমিদার গৃহে আশ্রয় লইতে হইল। দুইটি কিশোর হৃদয়ের অন্তরের মিলন সার্থকতা পাইল না, বাহিরের বিচ্ছেদই সত্য হইল, হৃদয়ের অকৃত্রিম সত্য মিলনের নিবিড়তায় পৌছিল না।

তের বছরের পারু একদিনেই চল্লিশ বছরের জমিদার গৃহিনী সাজিয়া বসিল, তিলে তিলে অভিনয়ের মধ্য দিয়া আত্মহত্যা করিতে লাগিল। পার্বতীর এই আত্মহত্যা দেবদাস হয়ত মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল। তাই সেও চন্দ্রমুখীর নিকট বসিয়া অমন করিয়া নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করিয়াছে। আমরা দেখি, চন্দ্রমুখী তাহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার স্পর্শ এড়াইয়া চলিয়াছে। চন্দ্রমুখীর নিকট দেবদাস বলিয়াছিল—"স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল, বড় অবিশ্বাসী।" কিন্তু আমরা জানি, ইহা দেবদাসের অন্তরের কথা নয়, অন্ততঃ পার্বতীর সম্পর্কে সে একথা বলে নাই। তালসোনাপুর গ্রামে পার্বতী একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে দেবদাসের নিকট বলিয়াছিল—"দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট, আমি যে মরে যাচ্ছি; কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার যে আজন্মের সাধ।" দেবদাস সেদিন পার্বতীর কথা একটুও অবিশ্বাস করে নাই। পার্বতীর কথা শুনিয়া তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু নামিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকারে চোখ মুছিয়া সে শুধু কহিয়াছিল—"তারও সময় আছে;" হয়ত তখনও দেবদাস পার্বতীকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। চন্দ্রমুখীই দেবদাসের নিকট পার্বতীর সত্যিকার পরিচয় করিয়া দিয়াছিল। চন্দ্রমুখীই দেবদাসকে বলিয়াছিল—"কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে বলেইত, যে যথার্থ ভালবাসে সে সহ্য ক'রে থাকে। শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি, যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি—আনতে চায় না।"

সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের দ্বন্দ্বের আর এক অভিব্যক্তি দেখি আমরা সাবিত্রীর জীবনে। সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিয়াছিল, এবং সতীশও

সাবিত্রীকে চাহিয়াছিল। কিন্তু সমাজবিধান তাহাদের এই মিলনকে অনুমোদন করিল না। সমাজে ইহার অনুমোদন নাই, সাবিত্রী তাহা জানিত। সাবিত্রার সামান্য একটু ইঙ্গিত পাইলেই সতীশ সমাজকে উপেক্ষা করিয়াই সাবিত্রীকে বিবাহ করিতে পারে, একথা সাবিত্রীর অজানা ছিল না। সাবিত্রী জানিত, তাহার সম্মতি পাইলেই সতীশের হৃদয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা সমাজের সমস্ত শক্তিকে উপহাস করিবে। কিন্তু সাবিত্রী ইহাও বুঝিয়াছিল—এই অবহেলাকে, সতীশের এই ঔদ্ধত্যকে সমাজ ক্ষমা করিবে না, সমাজ আজীবন সতীশকে প্রতিষ্ঠা দিবেনা, শান্তি দিবেনা। সতীশের একদিকে তখন সমাজ, আর একদিকে সাবিত্রী। হয়, সমাজকে ঘৃণা করিয়া সাবিত্রীর ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে হইবে, নতুবা সাবিত্রীকে দূরে রাখিয়া সমাজের প্রতি সম্মান অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। আপনার ভালমন্দ ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করিয়া কাজ করিবার মত মনোভাব তখন সতীশের ছিলনা এবং সে স্বভাবও তাহার নয়। সুযোগ পাইলে এবং সাবিত্রীর সম্মতি পাইলে সেদিন সে সমাদরেই তাহাকে গ্রহণ করিত। কিন্তু সাবিত্রী ইহা চাহে নাই; বরং সতীশ যতবার এজন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, সে তীব্র কশাঘাতে ততবারই তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। এ আঘাত সতীশের যতটা বাজিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বাজিয়াছে সাবিত্রীর। কিন্তু ইহা ভিন্ন উপায়ও ছিলনা। সাবিত্রী জানিত, তাহার দিক হইতে সামান্য দুর্বলতা দেখাইলেই তাহার ফলাফল এক গভীর শোচনার কারণ হইবে। তাহার নিজের কামনা-বাসনা ইহা দ্বারা চরিতার্থ হইবে বটে, কিন্তু সমাজে সতীশ চিরদিনের জন্য ঘৃণার পাত্র হইয়াই থাকিবে। সাবিত্রী জানিত, সমাজের এই রোষ হইতে সতীশকে রক্ষা করিবার সাধ্য তাহার নাই। এই জন্যই সে আপন অন্তরকে ইহা হইতে বিরত করিয়াছিল, এবং সতীশকে বাধা দিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, আত্মবিসর্জনেই তাহার প্রেমের সার্থকতা; সমাজে সতীশের শ্রদ্ধার আসন অক্ষুন্ন রাখাই তাহার প্রধান কাজ। এজন্য অন্তর তাহার যখন সতীশের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল, বাহিরে সে তাহার ঘৃণাই একান্ত মনে কামনা করিয়া লইয়াছিল। সাবিত্রীর অন্তরের এই ত্যাগ জগতে যে কোন ত্যাগের তুলনায় বহু উচ্চে। প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি ব্যতীত এই ত্যাগ, বা এই আত্মদান কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্যই সমাজের দৃষ্টিতে পতিতা হইলেও সাবিত্রী সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিতা বহু রমণী অপেক্ষা অধিক পূজ্যা।

সাবিত্রী নিজের জন্য সতীশের নিকট হইতে ঘৃণা চাহিয়া লইয়াছিল, এজন্য

মিথ্যার আশ্রয়ও তাহাকে লইতে হইয়াছে। কিন্তু নিজের প্রতি নিজের এই নির্মম আঘাত হৃদয়কে তাহার কি নিদারুণভাবে আহত করিয়াছিল, একমাত্র সাবিত্রী ভিন্ন অন্য কেহ সেদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। কাহারও নিকট মন খুলিয়া বলিয়া দুঃখভার লাঘব করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রমার জ্যাঠাইমা ছিলেন, পার্বতীর মনোদিদি ছিল; কিন্তু সাবিত্রীর কোন জ্যাঠাইমা বা মনোদিদি ছিল না। যাহার মুহূর্তের দর্শন তাহার আজীবন আকাঙ্খা, যাহার নিমেষের সঙ্গ তাহার স্বর্গসুখ, নিম া আঘাতে কতবার তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে হইয়াছে, ধূলিলুণ্ঠিত অব্যক্ত বেদনা নির্জন গৃহে কতবার যে গুমরিয়া মরিয়াছে, গৃহের নীরব দেয়ালগুলি ভিন্ন আর কেহই তাহার সাক্ষী ছিল না। রমা তাহার হৃদয়ের ব্যথা রাখিবার স্থান পাইয়াছিল, বিশ্বেশ্বরী তাহাকে বুকে চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু মুহূর্তকাল বুকে রাখিয়া করুণ সান্ত্বনায় বুকের নিদারুণ বেদনা একটু প্রশমিত করিবে, এমন কেহ সাবিত্রীর ছিলনা। তাই সে সর্বংসহা ধরণীবক্ষতেই একমাত্র সান্ত্বনার স্থান পাইয়াছিল। ধরিত্রীর বুকে বুক দিয়া উবুড় হইয়া কতবার সে সতীশকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছে, "ও গো, কেন তুমি আমাকে ঘৃণা করনা, কেন আমি তোমার ঘৃণা পেতে পারিনা ?" সতীশের সুখের অংশ সাবিত্রী কোন দিন নেয় নাই, চাহেও নাই। সুখের সময়ে সে আপনাকে দূরে সরাইয়া নিয়াছে; কিন্তু সতীশের দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে সাবিত্রী দূরে সরিয়া থাকিতে পারে নাই। আপন সমস্ত অমঙ্গল বিস্মৃত হইয়া, সকল ভালমন্দ উপেক্ষা করিয়া সাবিত্রী তখন সতীশের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দুঃখের অংশ লইয়াছে, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়া সে সতীশের সমস্ত অপরাধ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সাবিত্রীকে এখানে আমরা রাজলক্ষ্মীর আসনেই দেখি। কিন্তু শ্রীকান্তজীবনের ভালমন্দ, মঙ্গলামঙ্গলের উপর রাজলক্ষ্মী আপনার অকুণ্ঠ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সে-সৌভাগ্য কিন্তু সাবিত্রীর হয় নাই, সাবিত্রীর ভাগ্যে এই অধিকার মিলে নাই। অধিকার যখন প্রতিষ্ঠার মুখে, তখনই উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া সরোজিনী আসিয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল, এবং উপেন্দ্রের সাহায্যেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহার অসহায় নারীজীবনের শেষ সম্বল এই অধিকারটুকুও তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। সাবিত্রী একবার সমাজের দিকে তাকাইয়া, একবার সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া, একবার সতীশের কথা স্মরণ করিয়া, আপনার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত কামনা-সাধনা, নির্বাক

এবং নিস্পন্দভাবেই আর একজনের হাতে তুলিয়া দিল। এই আত্মত্যাগ যে কত মহান, কত বড়, ইহার মূল্য কি, সমাজ তাহা বুঝিল না, কোন সন্ধান রাখিল না এবং সে প্রয়োজনও অনুভব করিল না। শক্তিগর্বে স্ফীত সমাজ একবার চাহিয়াও দেখিলনা, তাহারই নিষ্ঠুর বিধানে নীরব আত্মদানে উজ্জ্বল একটি নারী-হৃদয় কিভাবে শুষ্ক হইয়া বিস্মৃতির অতল তলে মিলাইয়া গেল!

বড়দিদি মাধবীর হৃদয়ের দ্বন্দ্বও আমরা দেখি। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে সমাজের প্রত্যক্ষভাবে কোন হাত ছিল না। বড়দিদিকে প্রধানতঃ আপনার হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সুরেন্দ্রের আকস্মিক আগমনে ও ততোধিক তিরোধানে সে-হৃদয়ে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া ছিল, এবং সেজন্য সমাজই প্রধানতঃ দায়ী হইলেও প্রত্যক্ষভাবে সমাজ এখানে নারী হৃদয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে নামে নাই। তবুও বড়দিদির গোপন হৃদয় হিন্দু সামাজিক বিধবার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সমাজ সেখানে এক গোপন ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়াছিল। আর যে নির্মম আঘাতে নারী-হৃদয় ভূলুণ্ঠিত বা 'কল্প বৃক্ষ' তাহার স্বাভাবিক স্বভাব হইতে বঞ্চিত সে-আঘাতও প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলে পরোক্ষভাবেও সমাজের নিকট হইতে আসিয়াছে। বড়দিদির ভিতরে আমরা রবীন্দ্রনাথের মঞ্জুলিকাকে দেখি—

ভয়ে মরে বিরহিনী,
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিণি রিণি
পদ্মপাতায় শিশির যেন মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে যেন এমনিতর ধরা পড়ার মুখে ॥

বড়দিদির হৃদয়ে আমরা মঞ্জুলিকার হৃদয়ের এই দ্বন্দ্বেরই আভাস পাই। কিন্তু তবুও পরিণতি ইহাদের এক নয়। রবীন্দ্রনাথের মঞ্জুলিকা ফরাক্কাবাদ আশ্রয় করিয়া কঠোর সমাজকে ফাঁকি দিয়াছিল। কিন্তু বড়দিদির ভাগ্যে এই 'নিষ্কৃতি' জোটে নাই, সমাজকে সে ফাঁকি দিতে পারে নাই। তাই বড়দিদি সমাজের পায়ে আত্মবলি দিয়াছে, আত্মবিসর্জনে সে সমাজের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

বড়দিদির অন্তরে গোপনে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে এই কথা জানাইয়া মনোরমা তাহার স্বামীর নিকট পত্র লিখিয়াছিল। উত্তরে স্বামী লিখিয়াছিলেন, —মাধবীলতা রসালকে অবলম্বন করে, ইহা জগতের রীতি—তুমি আমি কি

করিতে পারি।" মাধবীলতার এই চিরন্তন গতির বিরুদ্ধে কোন নালিশ থাকিতে পারে না। অবলম্বন তাহার চাই এবং শাল, তমাল, বট প্রভৃতি বিরাট বনস্পতি থাকা সত্ত্বেও সে যে রসালকেই চায়, কারণ ইহাই তাহার স্বভাব। কিন্তু তবুও মনোরমা ঠিকই বলিয়াছিল—"মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ সে বিধবা এবং বিধবাকে যাহা করিতে নাই তাহা করিয়াছে, মনে মনে আর একজনকে ভাল বাসিয়াছে। সমাজের নিষ্ঠুর বিধানেই মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ তাহার হৃদয় আছে, সে দয়ার পাত্রকে দয়া করে, করুণা বিলায়, ভালবাসা দেয়। মাধবী পোড়ারমুখী, কারণ সে জানেনা বিধবার হৃদয় থাকিতে নাই, বিধবাকে ভাল-বাসিয়া দয়া করিতে নাই। ষোল বছর বয়সে কিশোরী তরুণী যখন স্বামীহারা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, সেদিন সবাই তাহাকে ডাকিয়াছিল বড়দিদি, ব্রজবাবুর সঙ্গে স্বর মিলাইয়া সবাই ডাকিয়াছিল "মা", আর মাধবীও একদিনেই ষোল হইতে ছাপান্নতে পা দিয়াছিল। ব্রজবাবুর গৃহে মাধবী ক্রমে 'কল্প বৃক্ষ' হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার তলায় গিয়া হাত পাতিলেই হইল, অভীষ্টলাভে কেহই বঞ্চিত হইত না, সকলেই হাসিমুখ লইয়া ফিরিত।

ষোল বছরের মাধবী-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন শরৎচন্দ্র। মাধবীর আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, জীবনে সে সার্থকতা চাহিয়াছিল, তাই হৃদয়ে তাহার অনেক ফুলই ফুটিত। যখন স্বামী ছিল, মালা গাথিয়া স্বামীর গলায় পরাইয়া সে তৃপ্তি লাভ করিত। কিন্তু শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, স্বামী নাই বলিয়া গাছটি সে কাটিয়া ফেলিয়া দেয় নাই। কিন্তু তাহার পুরাতন সুখের দিন আর নাই। তাই আজ আর সে মালা গাঁথে না। ফুলগুলি অঞ্জলি ভরিয়া দিনদুঃখীকে বিলাইয়া দেয়। স্বামী যোগেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে মাধবীর নিকট শেষ অনুরোধ জানাইয়াছিল—"মাধবী, যে জীবন তুমি আমার সুখের জন্য সমর্পণ করিতে, সে-জীবন সকলের সুখের জন্য সমর্পণ করিও।" উদ্বেলিত অশ্রু নিরুদ্ধ রাখিয়া হৃদয়-দেবতার অন্তিম কথা কয়টি মাধবী সেদিন হৃদয়েই গাঁথিয়া লইয়াছিল। যে-আসনে একদিন সে যোগেন্দ্রনাথকে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিয়াছে, তাহার মৃত্যুর পরে তাহারই অন্তিম ইচ্ছা সে আসন অধিকার করিল। তাই আমরা দেখি, ব্রজবাবুর গৃহে দীনদুঃখীর সেবাই মাধবীর দৈনিক ব্রত। তাই মাধবী সকলের বড়দিদি, মাধবী কল্পতরু।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, মাধবী তাহার ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ এবং স্নেহ-মমতা লইয়া পিতৃভবনে আসিয়াছিল, এবং এখানে সে আসিয়া কল্পবৃক্ষ

বড়দিদি সাজিয়া সেই স্নেহ-মমতা এবং করুণার যথোচিত দানে সকলকেই তৃপ্ত এবং মুগ্ধ করিতেছিল। মাধবী অকাতরে দান করিতেছিল, সুতরাং দীন-দুঃখী মাত্রেরই সে-দানে অধিকার ছিল। সুরেন্দ্রনাথও একদিন এই দীন-দুঃখীর অধিকার লইয়াই কল্পবৃক্ষের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তাহার একান্ত নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত দেখিয়াই মাধবীর করুণার্দ্র হৃদয় সেদিন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাই কিছু না চাহিতেই একটি অজ্ঞাত ব্যথিত হৃদয়ের দানে সুরেন্দ্রনাথের অন্তর ও বাহির পূর্ণ হইতেছিল।

সুরেন্দ্রনাথকে গৃহে স্থান দিয়া পিতা ব্রজরাজবাবুও মাধবীকে আসিয়া জানাইয়াছিলেন—'মা, একজন দুঃখী লোককে স্থান দিয়াছি।" মাধবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কে বাবা?" পিতা উত্তরে জানাইয়াছিলেন—দুঃখী লোক, এছাড়া আর কিছুই জানিনা।" সুরেন্দ্রনাথ দুঃখী—ব্রজবাবু এইমাত্র জানিয়াছিলেন কিন্তু তাহার দুঃখের পরিমাণ যে কত ইহা জানিয়াছিল একমাত্র বড়দিদি। যাহাকে মানুষ বলিলেও হয়, ছোটছেলে বলিলেও হয়, যে খাইতে দিলে খায়, না দিলে উপবাস করে, সেই অকর্মণ্য অপেক্ষা বড় দুঃখী সংসারে কে আছে? এই সৃষ্টিছাড়া উদাসীনের জন্য একজন বড়দিদি নিতান্তই আবশ্যক। তাই আমরা দেখি, সুরেন্দ্রনাথের আসা অবধি মাধবীর অর্ধেক সময় সে কাড়িয়া লইয়াছে।

মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে করুণা করিতে গিয়াছিল আর দশজনকে সে যেমন করুণা করে তেমনিই। কিন্তু তখনও সে জানিত না, করুণার সঙ্গে হৃদয়ের মিলন অচ্ছেদ্য, শুষ্ক করুণা কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না। তাই সুরেন্দ্রনাথকে দয়া করিতে গিয়া মাধবী ভুল করিয়াছিল। কিন্তু ইহা ভিন্ন মাধবীর অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ, সে কল্পবৃক্ষ বড়দিদি সাজিয়াছিল। সকলেই যখন সেই বৃক্ষের নীচে আসিয়া হাসিমুখে ফিরিবে, তখন সুরেন্দ্রনাথই বা সেই স্নেহের দানে বঞ্চিত হইবে কেন?

এই করুণার ভিতর দিয়াই মাধবী-হৃদয়ের একটি বিশেষ অংশ সুরেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। মাধবীর ইহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তবুও দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া ইহাকে সুস্পষ্টভাবে আপনার সম্মুখে সে ধরে নাই। তাই বড়দিদির প্রতিদিনের কর্তব্যে ইহা কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। নিজের অন্তরকেও মাধবী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রনাথ ব্রজবাবুর গৃহ হইতে যেদিন অকস্মাৎ চলিয়া গেল, মাধবী দেখিল

তাহার হৃদয়ও সেই সঙ্গে শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাহার 'রাঙ্গাচরণে পোভার বাঁদর কেমন শোভে' দেখিবার জন্য মনোরমা যখন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, মাধবী নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। মাধবী নিজের অন্তরকে দেখিতে পাইল, তাই সুরেন্দ্রনাথের জন্য বড়দিদির অসীম ভাণ্ডার এবারে কিছুটা সীমাবদ্ধ হইল। আমরা দেখিয়াছি, বড়দিদি কল্পবৃক্ষ; ইহার পূর্বে সে বৃক্ষে মাষ্টার মহাশয়ের জন্য চশমা ফলিত, পুরাতন কাপড় ফলিত, এমন কি প্রয়োজন মত কম্পাস পর্যন্ত ফলিত। কিন্তু এবারে সুরেন্দ্রনাথ অনুভব করিল—"ভগিনীর যত্ন, জননীর স্নেহ-পরশ, যেন তাহার গায়ে লাগে না, একটু দূরে দূরে থাকিয়া সরিয়া যায়।" শেষ পর্যন্ত মাধবী আঘাত করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে দূরে সরাইতে চাহিল। সে মনে করিয়াছিল, এইভাবেই হৃদয়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু মুক্ত হইতে সে পারে নাই; বরং এক অব্যক্ত বেদনার মধ্য দিয়া আরও অধিক বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ নিকটে নাই; কিন্তু তবুও সে মাধবীর দিবারাত্রির চিন্তা, ইহাই আমরা দেখি। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, কলিকাতায় নিঃসম্পর্ক রাস্তায় উপায়--হীন অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথকেই তাহার মনে পড়িতেছিল। প্রমীলা কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'বড়দিদি তিনি চলে গেলেন কেন?" মাধবী তাহাকে সরাইয়া দিয়াছিল; কোন জবাব দিতে পারে নাই। একমাত্র তাহার হৃদয়ই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত কিন্তু সেখানে এক বিপ্লব চলিতেছিল; সেখানে যে তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহার সন্ধান না রাখিতেছিল প্রমীলা, না অন্য কেহ। মাধবী ইহা অপেক্ষাও বড় আঘাত পাইল, যখন শুনিল কলিকাতার রাস্তায় সুরেন্দ্রনাথ গাড়ী চাপা পড়িয়াছে। সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন পিতা ব্রজরাজবাবু। ব্রজবাবুর নিকট হইতেই মাধবী শুনিয়াছিল, হাসপাতালে সুরেন্দ্রনাথ তাহারই নাম করিয়া 'বড়দিদি' বলিয়া ডাকিয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে পাশের কক্ষে প্রমীলা বাসনপত্র ঝন্ ঝন্ করিয়া ফেলিয়া দিল, শরৎচন্দ্র মাধবীকে আমাদের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন নতুবা নিরুদ্ধ অশ্রু সেদিন বন্যার জলের মতই বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইত।

কিন্তু ইহার পরই সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল, মাষ্টার মহাশয় সুরেন্দ্রনাথ হইলেন জমিদার সুরেন রায় এবং বড়দিদি হইলেন গোলাগাঁয়ের মাধবী দেবী। কিন্তু তবুও মাধবী পাঁচ বৎসর পরে আর একদিন যে সুরেন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিল, সে লালতা গাঁয়ের জমিদার সুরেন রায় নয়, পাঁচ বৎসর আগে যাহাকে সে গৃহ

হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই সুরেন্দ্রনাথই মাধবীর পুরাতন স্মৃতির উপর নূতন ব্যথা দিবার জন্যই যেন ফিরিয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্বে আর একবার সুরেন্দ্রনাথ আসিল—মাধবীকে আপন প্রাণের পরিবর্তে গৃহে ফিরাইয়া লইতে সে এবার আসিয়াছে। বড়দিদির স্নেহের স্বাদ হইতে পাঁচ বৎসর আগে ইহাকে বিমুখ করিয়া মাধবী অন্তরে যে আঘাত সহ্য করিতেছিল, উহাই যে ছিল তাহার দিবারাত্রির ধ্যান। আজ সুরেন্দ্রনাথ তাহার নিকট আসিয়াছে—সে মৃত্যুপথ-যাত্রী। তাই মাধবী আজ সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচের অতীত। মৃত্যুপথযাত্রীর আকুল আকাঙ্ক্ষাকে সে আপন হৃদয় দিয়াই পূর্ণ করিতে চায়, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত করুণা ধারা একেবারে নিঃশেষ করিয়া ঢালিতে চায়। এই সময়ে মাধবীচিত্র শরৎচন্দ্র নিপুন শিল্পীর তুলিতে অঙ্কন করিয়াছেন—তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই, সুরেন্দ্রনাথের মস্তক সে কোলে লইয়া বসিয়াছে। অর্দ্ধ চেতন সুরেন্দ্রনাথ মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল--"তুমি বড়দিদি?" মাধবী উত্তর করিয়াছিল,—"আমি মাধবী।" আজ সে সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচের অতীত, তাই সে আজ মাধবী।

শরৎ-সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর নারী আছে, সমাজের সঙ্গে ইহাদের প্রত্যক্ষ ভাবে কোন দ্বন্দ্ব নাই। অথচ সমাজের কোথাও ইহাদের স্থান হয় না, একান্ত রিক্ত হস্তেই সমাজের নিকট হইতে ইহাদের বিদায় গ্রহণ করতে হয়। সমাজের বুকে অবস্থান করিয়া সমাজের লাঞ্ছনা পাইবার মত সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য--টুকুও জীবনে ইহাদের কখনও হয় না।

রেঙ্গুনের এক অস্পষ্ট সন্ধ্যায় আমরা ভারতীকে প্রথম দেখি। 'পথের দাবী'তে তাহার নিজস্ব দাবীর পরিচয় বেশী নয় কিন্তু এই নারীর বিশুদ্ধ অন্তরটি ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়াই চলিতে চায়, তাহা আমরা ইহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই বুঝি। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—ভারতীর গায়ের রং ইংরেজের মত সাদা নয়। বয়স উনিশ-কুড়ি এবং একটু লম্বা বলিয়াই ভারতীকে রোগা দেখায়। কিন্তু ইহা তাহার বড় পরিচয় নয়। ভারতীর এই পরিচয় আমাদের অন্তরে কোন রেখাপাত করে না। ভারতীকে আমরা দেখি—সে দুর্বৃত্ত মাতাল পিতাকে অন্যায় হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, পিতার অন্যায় স্বীকার করিয়া অপূর্বর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে, অন্যায় উৎপীড়নের যথাসাধ্য প্রতিকার সাধনের জন্য সাজি ভরিয়া ফল ভেট লইয়া অপূর্বর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতীর অকুণ্ঠিত সরলতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা সেদিন অপূর্বর নিকট যথোচিত সমাদর পায় নাই। অপূর্ব ইহার মধ্যে এক বিজাতীয় রমণীর ভীতিগ্রস্ত অন্তরই দেখিয়াছিল কিন্তু আমরা জানি, নিরীহের প্রতি অযথা উৎপীড়নই ভারতীকে সেদিন ব্যথিত করিয়াছিল।

ইহার পর ভারতীর পরিচয় পাঠককে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে না। সত্যকে ইচ্ছা করিয়াই সে বিকৃত করিয়াছে, প্রকৃত ঘটনা উল্টা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অপূর্বকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। অবশ্য অর্থদণ্ড নিজে বহন করিয়া অন্যায়ের বৃশ্চিক দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা সে-যে করে নাই তাহা নয় কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আদালতে ভারতীর আচরণ সমর্থন করা যায় না।

অপূর্ব যখন রেঙ্গুন হইতে ভামো রওনা হইয়া যায়, তাহার মন ছিল এই নারীর প্রতি বিদ্বেষে ভরা। কিন্তু ভামো হইতে গৃহে ফিরিয়া সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে ভারতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল। এই দিন ভারতীর কোন ব্যবহারে, কোন প্রকার আচরণে, কোন কথাবার্তায় তাহাদের পূর্ব সম্বন্ধের বিন্দুমাত্র আভাস প্রকাশ পায় নাই। অপূর্বং যে সংসারানভিজ্ঞ তাহা ভারতী প্রথম দর্শনেই টের পাইয়াছিল। তাহার বিষন্ন মলিন মুখশ্রী দেখিয়াই তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া গিয়াছিল। পরস্পরের প্রতি হৃদয়াকর্ষণের বীজ এইখানেই বোধ হয় প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অপূর্ব ভারতীর পারস্পরিক আকর্ষণ একদিন বিরাট ঝটিকায় পরিণত হইয়া পথের দাবীর সাজান বাগানকে যেন বিপর্যস্ত এবং লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়াছিল, তাহার প্রথম তরঙ্গটি এই সময়েই দেখা গিয়াছিল। অপূর্ব ভারতীর মিলিত জীবনে যে লঘু মেঘখানিও ধীরে ধীরে এক অলক্ষ্য কোণে দেখা দিয়াছিল, ক্রমে তাহাই কালিমাময় হইয়া সমগ্র আকাশকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র ভারতীকে কি রূপে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝি না। শরৎ-সাহিত্যের অন্য নারী হইতে ভারতী স্বতন্ত্র। রমা, বিজয়া, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, বড়-দিদি বা কমললতা শ্রেণীর নারী ভারতী নয়। বিশ্বেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী বা অন্নদাদিদির পাশেও তাহাকে বসানো চলে না। এমনকি 'পথের দাবী'র গঠন ইতিহাসে তাহার মূল্য যতখানি, তাহার অপেক্ষা ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কেই তাহার আগ্রহ আমরা বেশী দেখি। এই ভারতীই একদিন অপূর্বকে পথের দাবীর সন্ধান দিয়াছিল। পথের দাবীর পথিক হইবার জন্য

সে-ই অপূর্বকে অনুরোধ করিয়াছিল। অপূর্বকে সে বলিয়াছিল—"ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা। আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অস্বীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গে চুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত নীতিকে কেউ যেন রোধ করতে না পারে। এই আমাদের পণ। অপূর্বকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"আসবেন আমাদের দলে?" সেদিন কিন্তু পথের দাবীর সঙ্গে তাহার প্রকৃত সম্পর্ক খুব ক্ষীণ মনে হয় নাই। ওয়ার্কমেনদের নরক কুণ্ডে পথের দাবীর সত্যিকার কাজে রত ভারতীকেও আমরা দেখি। পথের দাবীর পথে নবাগত অপূর্ববাবু যখন এই নরককুণ্ড হইতে বাহির হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তখন এই ভারতীই তাহাকে বলিয়াছিল—'এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আত্মার এই ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান। অপূর্বকে ভারতী সেদিন জানাইয়াছিল, এই উপলব্ধিই নাকি পথের দাবীর সবচেয়ে বড়ো সাধনা।

আমরা দেখি, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে ভারতী রিক্ত হস্তে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ডাক্তারের পথের দাবীর সঙ্গে তাহার অন্তরের পরিচয় কতটুকু ছিল আমরা জানিনা। অপূর্বর দুর্বলতা আমরা দেখি। সব্যসাচীর পথের দাবীকে নিজের দাবী বলিয়া একদিনের জন্যও সে গ্রহণ করে নাই। অপূর্ব নিজেও ইহা জানিত এবং অকপটেই ভারতীর নিকট সে ইহা স্বীকার করিয়াছিল, "আপনারা ত জানেন, সমিতির আমি অযোগ্য। ওখানে আমার ঠাঁই হতে পারে না।" কিন্তু ভারতী বহু পূর্বেই অপুর্বকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, পথের দাবীর সভ্যসমাজে নয়; আপনার হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে। পথের দাবীর বহু উর্ধ্বে ছিল সেদিন ভারতীর হৃদয়ের দাবী। তাই অপূর্বর ন্যায়-অন্যায়ের সে বিচার করিতে পারে নাই। প্রকারান্তরে তার পথের দাবীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। অপূর্বকে সুস্পষ্টভাবে ভারতী সেদিন এই কথাই জানাইয়া দিয়াছিল—"পথের দাবীতে আপনার স্থান নাও থাকতে পারে কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন কিছু নেই, অপূর্ববাবু।" আমরা দেখি, 'এই আর একটা দাবী'ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। ভারতী অপূর্বর পথের দাবী অতল তলে ডুবিয়া গেল। এখান হইতে ভারতীর পথ পশ্চাদপসরনের পথ। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া

সম্মুখের প্রায় সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া—একদিন সে যে 'পথের দাবী'তে প্রবেশ করিয়াছিল, এখানে তাহার আর কোন পরিচয় দেখিনা। কিন্তু তবুও ডাক্তারের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল অসীম। সেই পাষাণ স্তূপের মধ্যে একটি মাত্র বস্তুকে সে দেখিয়াছিল—জননী জন্মভূমি। তার আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই। অপূর্বর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় নাই, ডাক্তারের অকুণ্ঠ দেশপ্রেমই ভারতীকে পথের সন্ধান দিত। কিন্তু আমরা জানি, অপূর্বর সহিত সাক্ষাতের পরে তাহার মধ্যে পরিবর্তন আসিয়াছে, সংশয় দেখা দিয়াছে। সব্যবাচী ইহা বুঝিয়াই 'পথের দাবী' হইতে তাহাকে বিদায় দিয়াছে। ডাক্তারের নিকট একবার সে আকুল আবেদন জানাইয়াছিল, "সংসারে আমার আপনার কেউ নাই, তোমার পথের দাবী থেকে আমায় বিদায় দিওনা, দাদা।" কিন্তু আমরা জানি, ডাক্তারের প্রতি তাহার ব্যক্তিগত আকর্ষণই ইহার মূলে, পথের দাবীর প্রতি নয়। সব্যসাচী ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাহাকে সেদিন বলিয়াছিলেন, "ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ আর এক তিলও হবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্বই ঢের ভালো। দেনা-পাওনার চুলচেরা বিচার করতে করতে বোঝাপড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ তাই করো।" ডাক্তার তাহাকে বলিয়াছিলেন, পথের দাবীর জন্য ভারতী নয়, ভুল করিয়াই তিনি তাহাকে এপথে টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমরাও জানি, পথের দাবীর বন্ধুর পথে ভারতীর বিকাশ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বঞ্চনার পথ ধরিয়া সে পথের দাবীতে প্রবেশ করে নাই। ডাক্তারের প্রতি তাহার অপরীসীম শ্রদ্ধা, তাহার অসামান্য দেশপ্রেম এবং অসীম আত্মত্যাগ তাহাকে একসময়ে হয়ত পথের দাবীতে মর্যাদার আসনেই বসাইতে পারিত, কিন্তু এপথে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শুভেচ্ছাকে রোধ করিয়া দাঁড়াইল অপূর্ব।

বিদায় যাত্রার প্রাক্কালে ডাক্তার একদিন ভারতীকে বলিয়াছিলেন, "স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবেনা শুধু পথের দাবী।" মনে হয়, পথের দাবীর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া ভারতীর অন্তরে একটা তীব্র দ্বন্দ্বই চলিতেছিল। পথের দাবীর সঙ্গে একান্তভাবে নিজেকে কোনদিনই সে মিলাইয়া লইতে পারে নাই। এইজন্যই সে এত সহজে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সে চাহিয়াছিল। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, জনতার মুক্তির জন্য, দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের

ব্যবহার করিবার জন্য সে হয়ত সমস্ত কিছুই দিতে পারিত ; কিন্তু হানাহানির পথ, বিপ্লবের পথ তাহাকে পীড়িত করিত। ডাক্তারকে একদিন সে ইহাই বলিয়াছিল, "তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর পথে কিছুতেই কল্যাণ নাই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম বিশ্বাসের পথ—সেই পথই আমার শ্রেয়। সেই পথই আমার সত্য।" কিন্তু আমরা বুঝি, পথের দাবীর গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া ভারতী নিজের স্থান একদিন খুঁজিয়া পাইয়াছিল। ডাক্তারের নিকট একদিন সে আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাকেবা?" সব্যসাচী সেদিন দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর দিয়াছিলেন—"ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে—স্বামী, ছেলেপুলে বিষয় আশয় ঘর দোর—।" ডাক্তারের উপর ভারতী সেদিন রাগ করিয়াছিল। কিন্তু এ ক্রোধ যে কৃত্রিম, ডাক্তার যে সত্য কথাই বলিয়াছিলেন এবং ভারতীর নিজের অন্তরও যে ইহাই চাহিতেছিল, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝি।

নারী জীবনের, নারী জন্মের সার্থকতা কোথায়—এ প্রশ্ন চিরন্তন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, দেবীরাণীতে নারীর সার্থকতা নাই, দেবীরাণীকী জয় ধ্বনির মধ্যে সে গৌরব নিহিত নাই। জয়ধ্বনি আকাশে উঠিয়া বাতাসের মধ্যেই মিলিয়া যায়, নারীজীবনে সে সার্থকতা আনিয়া দেয় না। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া, ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া প্রভুত্ব প্রতিপত্তির মধ্যে নারী তাহার প্রকৃত সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, দেবীরাণীর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা রহিয়াছে ব্রজেশ্বরের ক্ষুদ্র গৃহে গৃহিণীপনায়, ব্রহ্মঠাকুরাণী যেখানে রূপকথা কয়, সাগর যেখানে পাশে বসিয়া বাসন মাজে সেইখানে। প্রফুল্ল এখানে যে মহান সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে, দেবীরাণীর গৌরব সেখানে তুচ্ছতায় মিলাইয়া যায়।

শরৎচন্দ্রের দেনা-পাওনার ষোড়শী-জীবনেও আমরা ইহাই দেখি। চণ্ডীর ভৈরবীর দায়িত্ব কর্তৃত্ব, সম্পদ বিপদ, ভাগ্যনির্দিষ্ট এই পরিচিত যাদের মধ্য দিয়া ষোড়শী-জীবনের কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের জন্যও কোন প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হয় নাই, নিজেকে একটি মুহূর্তের জন্যও এখানে সে বেমানান বা খাপছাড়া মনে করে নাই। জীবনের শেষ পরিণতি কি হইবে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহও তাহার মনে জাগে নাই। হয়ত এইভাবেই জীবন তাহার কাটিয়া যাইত। পূজা পার্বনে, পরোপকারে এবং সাগর হরিহর বিপিন ও দিগম্বরদের ভক্তি ভালবাসার ভিতর দিয়াই একদিন হয়ত

তাহার ভৈরবী-জীবনে যবনিকাপাত ঘটিত। কিন্তু তাহার এই সরল সহজ নির্বিরোধ পথে বাধা পড়িল জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর আগমনে। জীবানন্দ চৌধুরীই বীজগাঁও হইতে চণ্ডিগড়ের শান্তিকুঞ্জে অশান্তির ঝড় বহন করিয়া আনিল। চণ্ডিগড়ের শান্ত আকাশের বুকের উপর দিয়া যেন এক বিপ্লবের বিভীষিকা বহিয়া গেল। বিশ বৎসর পূর্বে অলকা একদিন মরিয়া ষোড়শী হইয়াছিল। ভৈরবী জীবনের বিপ্লবের মধ্য দিয়া এক চিরন্তন নারীরূপে অলকা যেন আবার বাহির হইয়া আসিল; নারীত্বের জয়যাত্রা শুরু হইল; ভৈরবীর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব কিছুই তাহাকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারিলনা।

ষোড়শী ভৈরবী, চণ্ডীগড়ের চণ্ডীমন্দিরের ভৈরবী। জমিদার তাহার জমিদারী ঔদ্ধত্যে চণ্ডীমন্দিরের অধিকার লঙ্ঘন করিয়া সেখানে খাসি বলি দিয়াছিল। এই মন্দিরের সম্মান রক্ষার প্রেরণায় পরিণাম ভয়হীন যে উন্মাদিনী শান্তিকুঞ্জে ছুটিয়া গিয়াছিল, সে ছিল ভৈরবী। যে পথ ধরিয়া সে গিয়াছিল, সেই পথেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। মাত্র একটি দিনের ব্যবধান। কিন্তু এই একটি দিনেই ষোড়শী-জীবনে কতনা বৈচিত্র্য, কতনা পার্থক্য আনিয়া দিয়াছে। আমরা দেখি ভৈরবীর অন্তরের সুপ্ত অলকা জাগিয়া উঠিয়াছে। কুড়ি বছরের ষোড়শী জীবন, চণ্ডীর ভৈরবীগিরি সকলই যেন স্বপ্ন। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "জীবানন্দর মুখে অলকার নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমা ভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা এমনি কতকি—যেন একটা ভুলিয়া যাওয়া কবিতায় ভাঙ্গাচোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের ভিতর আনাগোনা করতে লাগিল।" জীবানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, শুনিয়া ষোড়শীর সমগ্র মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে উত্তর করিয়াছিল, "আমার নাম ষোড়শী।" অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর। ইহার বেশী আর কিছু সে বলে নাই। কিন্তু পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও জীবানন্দর মুখে অলকার নামকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। জীবানন্দ তাহাকে ডাকিয়াছিল—অলকা; সে উত্তর করিয়াছিল—আজ্ঞে। জীবানন্দ তাহাদের বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। ষোড়শী উত্তরে বলিয়াছিল—"বিয়ে ত হয়নি। সে তো মিথ্যে, তাছাড়া সে সমস্যা অলকার, আমার নয়।" কিন্তু আমরা জানি, ষোড়শী মুখেই ইহা বলিয়াছিল, তাহার অন্তর একথা বলে নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবেই তাহার অভিমানের কথা। সমস্যা অলকার একথা সত্যকথা কিন্তু সেই অলকা তখন তাহারই অন্তরে, দূরে নয়। আমরা জানি, শান্তিকুঞ্জে নিন্দা গ্লানি তুচ্ছ করিয়া

যে শুশ্রূষা করিয়া কাটাইয়াছে সে ভৈরবী ষোড়শী নয়, সে অলকা। এই অলকাই অন্তরে থাকিয়া নির্দেশ দিয়াছে—শান্তিকুঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে তাহাকে দেবীপূজা করিতে অস্বীকার করিতে। সমস্ত লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিঃসঙ্কোচে পিতার নিকট যে নারী বলিয়াছে—আমি এখানে নিজেই এসেছি, সে অলকা। তবে ভৈরবী জীবনের দৃঢ় সাহস সম্বল না পাইলে ইহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। ষোড়শী বুঝিয়াছিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইবামাত্রই সমস্ত চণ্ডীগড়ে ইহা প্রচারিত হইবে এবং দুর্ণামের বোঝা তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু সেদিন ইহা ব্যতীত তাহার উপায় ছিলনা। কারণ সে তখন অলকা এবং জীবানন্দ যত দুরাচারই হউক না কেন, সে হিন্দুনারী অলকার স্বামী। হৈমকে একদিন ষোড়শী এই কথাই বলিয়াছিল, "মেয়েমানুষের এমন অনেক জিনিস থাকে যা বাপের চেয়েও বড়।" আমরা জানি, ইহা ষোড়শীর মুখের কথা নহে, ইহা ষোড়শীর মধ্যে যে-অলকা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কথা। জীবানন্দ ইহা জানিত এবং ষোড়শীকে একদিন ইহাই বলিয়াছিল –"তোমার জোর আমি জানি! তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন, এ অস্বীকার করার সাধ্য তোমার নাই।"

শান্তিকুঞ্জে ষোড়শী মনে মনে অলকাই সাজিয়াছিল। কিন্তু ভৈরবী জীবনে এই একদিনের অলকা স্মৃতি হয়ত স্বপ্নের মত বিলীন হইত। কিন্তু ইহাকে জীবন দিল হৈম। স্বামীপুত্র সৌভাগ্যময়ী এই হৈমর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বিশ বছরের ভৈরবী তাহার বহু পূর্বের ভুলিয়া যাওয়া অলকাতে ফিরিয়া গেল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, নিজের জীবনকে ষোড়শী কোন দিন পরের সহিত মিলাইয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথা কখনও মনে হয় নাই, তবুও সেই মনের মাঝখানে গৃহিণীপণার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্ত্তব্য সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণভাবে সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে যেন সব জানে, এবং কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজে যেন তাহারই মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে, এই কথাই তাহার মনে হইল। ভৈরবী-জীবনের পরিসমাপ্তির মুখে ষোড়শী নিজেও জীবানন্দকে ইহাই জানাইয়াছিল। ষোড়শীর মুখে আমরা শুনি, "আমার যা কিছু কল্পনা, যত কিছু আনন্দের ভাবনা সেত কেবল তাদের নিয়েই। তাদের দেখেই তো আমি ষোড়শী আর নেই। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে সে কথা ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।"

ষোড়শীর অন্তরের সুপ্ত অলকা ধীরে ধীরে আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। জীবানন্দর নিজের পরিবর্তনও এক্ষেত্রে কম সাহায্য করে নাই। আমরা দেখি, বীজগাঁও-এর দুর্দান্ত প্রতাপ জমিদার আর তাহার মধ্যে জীবিত নাই, চণ্ডীর মন্দিরে খাসি বলি দিয়াই প্রতাপ তাহার শেষ হইয়াছে। আজ চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও সে আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট। মদ্যপান সে ত্যাগ করিয়াছে, পরোপকারের জন্য সে আজ তাহার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারে। এই সকল সৎ প্রবৃত্তি যতই তাহার মধ্যে বিকাশ হইতে লাগিল, তাহার এই নিখুঁত অন্তরটি ষোড়শীর অন্তরের অলকার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে ততই জড়িত হইতে লাগিল। জীবানন্দর মুখে অলকা নাম ষোড়শীর নিকট কেবলমাত্র পূর্বস্মৃতিই ফিরাইয়া আনিত না, তাহাকে ইহা অলকাজীবনে প্রত্যাবর্তনেও প্রলুব্ধ করিত। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,—"জীবানন্দর মুখে এই অলকা নাম ছিল ষোড়শীর সব চেয়ে বড় দুর্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট কথাটি তাহার কোনখানে গিয়া আঘাত করিত সে ভাবিয়া পাইত না।"

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ষোড়শী তাহার ভৈরবী-জীবনকে সহজে ত্যাগ করতে পারে নাই। কারণ, ইহা যে তাহার বিশ বৎসরের মাতৃত্বের গৌরবে জড়িত। সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এতবড় সম্মানিতা গরীয়সী নারী এ প্রদেশে আর কেহ নাই। কত লোকের কত প্রকার সুখ-দুঃখ, কত প্রকার আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশকুসুমের সে নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, মন্দিরের অনতিদূরবর্তী দুঃস্থ এবং দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত। বড় হইয়া তাহাদের দুর্দশার চিহ্নসমূহ চোখে দেখিয়াছে এবং দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতি স্নেহ তাহার সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের মত দৃঢ় ও গভীর হইয়াছিল। তাই মন্দিরের ভৈরবীগিরি আজ তাহার নিকট মিথ্যা হইলেও এই স্নেহের বন্ধন কাটানো তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তবুও এ সমস্যা ছিল ষোড়শীর, অলকার নয়। নবসঙ্কুচিত অলকা ভৈরবী--জীবনে যে প্রবল বন্যা বহন করিয়াছিল, তাহার নিকট ইহা ছিল বালির বাঁধ, এ যে কত বড় মিথ্যা, ষোড়শী তাহা সেইদিন বুঝিল, সেদিন হরিহর সাগর ভিন্ন তাহার আর সকল প্রজাই জমিদারের কাছারীতে গেল তাহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন জাগে, দেবীর ভৈরবী-গিরি ত্যাগ করিয়া সে এতবড় মিথ্যা দুর্নামের বোঝা মাথায় লইল কেন। হৈমর শ্বশুরের তলোয়ারখানার খাপের মতই সে তাহার নিজের খাপখানাও কেন দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল না? ষোড়শী

য়দি স্বেচ্ছায় সেদিন দেবীপূজা হইতে সরিয়া না দাঁড়াইত, কোন কলঙ্কই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। কেহই ত তাহাকে সন্দেহ করে নাই এবং সে নিজেও তো কোন অন্যায় করে নাই। তবুও কেন সে এই পথ গ্রহণ করিল? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহা ভিন্ন ষোড়শীর উপায় ছিল না। শিশুকাল হইতেই সে দেবী পূজা করিয়া আসিয়াছে। সে জানে, ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করিতে নাই। সুতরাং শান্তিকুঞ্জে একরাত্রি অতিবাহিত করিবার পর তাহার দ্বারা আর যে দেবীপূজা হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। তাহার একমাত্র উপায় ছিল পুরাতন ইতিহাস খুলিয়া বলা, পুরাতন কাহিনী অকপটে প্রকাশ করা। কিন্তু সেখানে সমস্যা ছিল। জীবানন্দ তো তাহাকে সেদিন বিবাহ করে নাই, বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়াছিল মাত্র। এবং অনুষ্ঠানান্তে বিবাহটাকে একটা পরিহাস করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আজ আবার সমস্ত কাহিনীটাকে সে যদি একটা নিছক গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তখন এই মর্যাদাহীন নারীত্বের বোঝা লইয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সমস্ত জগতের মিথ্যা কলঙ্ক আসিয়া তাহার অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ডুবাইয়া দিবে, সে তাহাকে প্রতিরোধ করিবে কি দিয়া? এক অসহায় নিরুপায় নারীকে কে বিশ্বাস করিবে? তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ পাইলে তাহার মায়ের দুর্ণামের অন্ত থাকবে না। এই জন্যই সে মিথ্যা দুর্ণাম বহন করাই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। হৈম ইহার বিরুদ্ধে বলিলে তাহাকেও সে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল, "দুর্ণাম যদি মিথ্যাই হয় তবে সইবেনা—কেন?" ষোড়শীর এই সময়ের অসহায় অবস্থা আমরা দেখি। পশ্চাতে তাহার ভৈরবী ষোড়শীর পথ কিন্তু সে পথের অর্গল সে স্বেচ্ছায় রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। সম্মুখে তাহার অলকার পথ কিন্তু সে পথের অর্গল তাহার নিকট তখনও উন্মুক্ত হয় নাই। তাই সে ধরিল ফকির সাহেবের সাথে শৈবাল দীঘির পথ। কিন্তু ষোড়শী সেদিন ভুল করিয়াছিল। তাহার অন্তরে অলকা তখনও জাগ্রত। শৈবাল দীঘিতে কত জল ছিল শরৎচন্দ্র আমাদের বলেন নাই। কিন্তু সে জলে অলকা যে বাঁচিতে পারে না, তাহা আমরা বুঝি। শৈবাল দীঘির পথ ছিল ষোড়শীর পথ কিন্তু সে ষোড়শী আজ মৃত। চণ্ডীগড়ে ভৈরবীগিরিতে তার সার্থকতা যেমন নাই, তেমনি শৈবাল দীঘির কুষ্ঠাশ্রমে দাসীত্বেও নাই। তাই এখান হইতেও অলকাকে ফিরিতে হইল। আমরা দেখি, এখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ষোড়শী তাহার স্বাভাবিক স্থানটি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন,

"সে হেঁট হইয়া তাহার মাথাটা জীবানন্দের বুকের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, কেবল একজনের বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।" আমরা বুঝি, শান্তিকুঞ্জে একরাত্রি কাটাইবার পরে ভৈরবী তাহার সমস্ত অন্তর দিয়া ইহাই চাহিয়াছিল। আজ সেই স্থানটিই সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই তাহার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ভার আর একজনের উপর অর্পণ করিবার পর নিশ্চিন্তে সে যে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবে এ সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় নাই।

শরৎ-সাহিত্যে আমরা সাবিত্রী, পার্বতী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি প্রভৃতি অনেককেই দেখিয়াছি। কিন্তু বন্দনা ইহাদের কাহারও সমগোত্রীয় নয়, বন্দনার সঙ্গে শরৎ-সাহিত্যের অন্য কোন নারীরই মিল নাই বলা চলে। যে দুঃখের ভিতর দিয়া অন্যান্য নারী পাঠক হৃদয়ের সমবেদনা আশ্রয় করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, বন্দনার জীবনে সে-দুঃখ কখনও উপস্থিত হয় নাই। অবশ্য, ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসাবে বন্দনার জীবনেও বিভিন্ন সমস্যা ছিল এবং সেই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে তাহাকেও সংগ্রাম করিতে হইয়াছে সত্য। কিন্তু উহা শরৎ-সাহিত্যের সকল নারীর সাধারণ সমস্যা নহে। অচলার সম্মুখে যে সমস্যা ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু অচলার সমস্যাও বন্দনার সমস্যা নয়। বন্দনা শিক্ষিতা এবং বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী, মুখুজ্যে পরিবারে পদার্পণের পূর্বে বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গেই তাহার কোন পরিচয় ছিল না। বম্বে বাঙ্গালী সমাজের ভালবাসার কলের টানা--পোড়েন দেখিয়াই তাহার জীবন কাটিয়াছে এবং উহাতেই সে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেখান হইতে বাংলা দেশের বাঙ্গালী সমাজকে সে দেখিতে পায় নাই, দেখিবার সুযোগও তাহার ছিল না; বরং বাহির হইতে নানা প্রকার সঞ্চিত অভিযোগই সে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

পরবর্তীকালে মুখুয্যে পরিবারের প্রতি বন্দনার আকর্ষণ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, প্রথম পরিচয়ে কিন্তু ইহার কুসংস্কারটিই বড় করিয়া তাহার দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। তাই উপবাসের মধ্য দিয়াই এই গৃহে তাহাকে প্রথম আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আঘাত করিয়া এবং আঘাত সহিয়াই এই গৃহের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় ঘটিল। আমরা জানি, এই আঘাতের মনোবৃত্তি সে বোম্বাই হইতেই লইয়া আসিয়াছিল। বোম্বাই হইতে বন্দনা তাহার আপন সমাজের এক কঠিন চশমা পরিয়া আসিয়াছিল। তাহার মধ্যদিয়া এখানকার বাঙ্গালী সমাজের স্বচ্ছ অন্তরটি দেখিবার কোন উপায়ই তাহার ছিলনা। কিন্তু

একদিন বিপ্রদাসের নিকটই সে শিখিয়াছিল, যে আত্মমর্যাদাবোধ অন্যকে আঘাত করিয়া হৃদয়ে সান্ত্বনা পায়, উহা অহঙ্কারের নেশা। বিপ্রদাসের নিকট সে শুনিয়াছিল মুখুয্যে পরিবারের যে মাকে অপমান করিয়া বন্দনা নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ করিতে চাহিয়াছিল, সেই দয়াময়ীরও আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং তাহা বন্দনা বা অন্য কাহারও অপেক্ষাই কম নয়। মা না হইয়াও মা হইয়া দয়াময়ী যেদিন এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিপ্রদাস তখন সদ্য মাতৃহারা। বিমাতার পালনে সকলে তখন বিপ্রদাসের অসীম দুঃখই কল্পনা করিয়াছিল। অসহায় শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা করিয়া বহু বুকফাটা আহা-উহুই সেদিন প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু দয়াময়ী বিষভাণ্ডের পরিবর্তে অমৃত লইয়াই এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিপ্রদাস সেখানে কল্যাণময়ী মাতৃহৃদয়কে পাইয়াছিল, দ্বিজদাস নিজের মাতার মধ্যে তাহার একাংশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। বন্দনা ইহা বিপ্রদাসের নিকটই শুনিয়াছিল এবং শুনিয়া আপনার গায়ে-পড়া অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষিত মন তাহার লজ্জিতই হইয়াছিল।

আমরা দেখি, শেষ পর্যন্ত বন্দনা এই মুখুয্যে পরিবারেই প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই গৃহের সদর দরজার পথ তাহার নিকট কখনও উন্মুক্ত হয় নাই। মেজদি সতী এবং তাহার শাশুড়ী দয়াময়ী একদিন তাহাকে এই গৃহের নববধূরূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন এবং বরণ করিয়াই আনিতে চাহিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তাহার অস্পষ্ট মনের কোণে এইরূপ একটা আশা বাসা বাঁধিলেও দ্বিজদাসের প্রতি তাহার আকর্ষণ সেখানে স্থায়ী আসন পাতিতে পারে নাই।

জীবনের শেষ দিকের উপন্যাস সমূহে শরৎচন্দ্র একপ্রকার অনুর্বর বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনাকে স্থান দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ আলোচনাই শুষ্ক। পাঠকের অনুভূতির রসসঞ্চারে উহা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই। শরৎ-সাহিত্যে অন্যত্র চরিত্রগুলি যেরূপ প্রাণরসে ভরপুর এখানে তাহার অভাব দেখিতে পাই।

বিপ্রদাস উপন্যাসে বন্দনা আমাদের সম্মুখে আসে নারী-হৃদয়ের এক শাশ্বত সমস্যা লইয়া। নরনারীর পরস্পর ভালবাসা কোন শাশ্বত সত্য বস্তু কিনা— তাহারই প্রথম প্রশ্ন শরৎচন্দ্র তুলিয়াছেন বন্দনার জীবনে। কমলের জীবনে উহাই 'শেষ প্রশ্ন' রূপে আমাদের সম্মুখে তিনি ধরিয়াছেন। বন্দনা তাহার ভালবাসার পাত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়াছিল, পারে নাই। বার বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের ঘাটেই তাহাকে নোঙর করিতে হইয়াছিল এবং এই ভাবে নোঙর করিয়া সমস্ত খোঁজাখুজি হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে

বাঁচিয়াছিল। ভালবাসাবাসি প্রশ্নের উত্তর সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া গিয়াই বন্দনা তাহার ভবিষ্যৎ জীবন এক অনিশ্চিত নিরুদ্দেশের পথেই ভাসাইয়াছিল। ভালবাসার মোহে বোঝা তাহার বহু ঘাট আসিয়াই সে নামাইয়াছিল, কিন্তু তখন একবারও সে বুঝিতে পারে নাই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া এ ঘাটের সন্ধান কাহারও মিলেনা।

তাই বন্দনাকে যে অবস্থায় আমরা দেখি—তাহার সমাজ নাই, স্থিতি নাই, শিক্ষা এবং সংস্কার তাহার আপন হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। বলরামপুরে পদার্পণের পূর্বে সে সুধীরকেই ভালবাসিয়াছিল, অন্ততঃ তাহার আপন অন্তরে সে ইহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরেই জীবনে আসিল এক অনাস্বাদিত-পূর্ব পরিবর্তন। বন্দনার এই অস্থিরতাময় জীবন—বিপ্রদাস যাহাকে মানুষ খোঁজা আখ্যা দিয়াছেন, বন্দনা নিজেও যাহাকে বলিয়াছে, শূন্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খোঁজা—ইহা সত্যই নারী প্রকৃতি, না কাহারও বিশেষ শিক্ষা-সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ এ প্রশ্নের উত্তর শরৎচন্দ্র দেন নাই। বিপ্রদাসের নিকট একদিন বন্দনা নিজেই উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে বন্দনা তাঁহাকে বলিয়াছে, "আপনি জানতে চাইলেন কোনদিন সুধীরকে ভালবেসে ছিলুম কিনা। সেদিন তো ভাবতুম সত্যিই ভালবাসি। কিন্তু তারপরেই আর একজন নজরে পড়লো। চোখে সুধীর গেল মিলিয়ে। এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে।" শেষ প্রশ্নের সাথে মিলাইয়া দেখিলে বন্দনার জীবনের এই তরলতা তাহারই একান্ত নিজস্ব প্রকৃতি নয়। বলরামপুরে আসিয়া বন্দনার জীবনে দ্বিজদাসও কিছুদিন শরতের হাল্কা মেঘের মতই ভাসিতেছিল। কিন্তু কোথা হইতে অজানা বাতাস আসিয়া তাহাকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল, বন্দনা টেরও পাইল না। বন্দনা একদিন চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল আর একজন আসিয়া সেখানে আসন পাতিয়া বসিয়াছে। বন্দনা বিপ্রদাসকে ভালবাসিয়াছিল, চলার পথে জীবনতরী তাহার এখানে আসিয়াই ঠেকিয়াছিল, ইহার পরে অন্য কোনখানে সে তরী আর ভিড়িবে না ইহা আমরা জানি। কারণ, ভালবাসার সন্ধানে বন্দনার প্রয়োজন ছিল আশ্রয়, একান্ত নির্ভরতার আশ্রয়। এই আশ্রয় সে বিপ্রদাস ভিন্ন অন্য কোথাও পায় নাই। অস্থিরতা চঞ্চলতা তাহার জীবনকে নানা দ্বারে নিয়া ঠেকাইতেছিল কিন্তু আশ্রয়ের অভাবে কোথাও উহা স্থায়ী নোঙর করিতে পারে নাই। বিপ্রদাসের ভালবাসা সুধীর কিংবা দ্বিজদাসের ভালবাসা নয়। তবুও বিপ্রদাসকে ভালবাসিবার পরও

বন্দনা অশোককে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, এ তাহার ভালবাসাও নয়, বিবাহও নয়, ভাগ্যের পায়ে আত্মসমর্পণ।

শরৎচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে না বলিলেও ইঙ্গিত তাঁহার বুঝা বিশেষ দুঃসাধ্য নয়। এই হাতড়ে বেড়ানোর অভ্যাস নারী জাতিরই সাধারণ সমস্যা—শরৎচন্দ্র ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। বন্দনা নিজেকে একবার বুঝাইতে চাহিয়াছে, ইহা তাহার ব্যক্তিগত অভ্যাস, নয়ত বা বয়সের ধর্ম। কিন্তু তার পরেই বিপ্রদাসের নিকট তাহাকে বলিতে শুনি, "আমি জানি, মেয়েদের এ লজ্জার কথা, কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না। কিম্বা এমনিই হয়ত সকল মেয়েরই প্রকৃতি, ভালবাসার পাত্র যে কে, সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না।" কিন্তু তবুও বন্দনা সেদিন ভুল করিয়াছিল। খুঁজিয়া বেড়ানো মানুষের অভ্যাস হইলেও আজীবন সে কেবল খুঁজিয়া বেডাইতে পারে না। একদিন তাহাকে এই খুঁজিয়া বেড়ানোর পালা শেষ করিতেই হয়। বিপ্রদাসের ভালবাসা পাইবার পরে বন্দনার জীবনেও যে এই পালা শেষ হইয়াছে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। কারণ মুখুজ্যে পরিবারে বন্দনা প্রতিষ্ঠিত হইবে নববধূরূপে নয়., গৃহের গৃহিণী রূপে। বিপ্রদাসের নিকট সে সেই শিক্ষাই পাইয়াছে। ভালবাসার আগুনে পুড়িয়া বন্দনা খাঁটী সোনা হইয়াছে। বিপ্রদাসের কষ্টি পাথরে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিযাছে। ভালবাসার পাত্র তাহার পূর্ণ করিয়া দিযাছে বিপ্রদাস। তাই মুখুজ্যে পরিবারে যদি অন্য কোথাও একবিন্দু ভালবাসা তাহার না মিলে বন্দনা সেজন্য অভিযোগ করিবে না তাহা আমরা বুঝি। আর মুখুজ্যে পরিবার সে ভার লইবে ভালবাসা বিতরণ করিবার। দ্বিজদাসই হউক, অন্নদিই হউক বা বাসুই হউক, কাহারও জন্য এই ত্রুটির অভাব কোন দিন তাহার হইবে না, এসম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

শরৎচন্দ্রের দত্তা উপন্যাসে বিজয়াকে আমরা প্রকৃত বিজয়া রূপে দেখি। আমরা দেখি, ঘটনা পরম্পরা যখন তাহার বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রোহই করিতেছিল, সমগ্র প্রতিবেশ একসঙ্গে যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছিল, আঘাতের পর আঘাত করিয়া তাহাকে পরাজয়ের খাদেই ঠেলিয়া দিয়াছিল, তখন সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বহির্দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া বিজয়া যেন তাহার বিজয়া নামই সার্থক করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের সমগ্র কাহিনীই বিজয়ার জয়ের ইতিহাস। মনে হয়, এই বিজয়া নাম শরৎচন্দ্রের সজাগ ও সচেতন মনের সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, এমন একদিন ছিল যখন বিলাসের নিকট আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। মুমূর্ষু পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে জগদীশের ছেলের কথা বলিয়াছিলেন এবং এই জগদীশের ছেলের সঙ্গে বিবাহ তিনি যে মনে করিয়াছিলেন, ইহাও তিনি কন্যাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মরণোন্মুখ বৃদ্ধ পিতার অন্তিম ইচ্ছা সেদিন বিজয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। বরং অন্তিম ইচ্ছার এই উপেক্ষায় বৃদ্ধের জরাজীর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ইহা শরৎচন্দ্রই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু বিজয়ার লক্ষ্য সেদিকে ছিল না। ঠিক এই সময়েই বিলাস--বিহারীর আগমন সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাটুকু দেখা দিয়াছিল, মৃত্যুশয্যায় বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ধারাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়াই প্রবাহিত হইবে, ইহা বিজয়া এক প্রকার স্থির করিয়াই ফেলিয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখি, এই সুনিশ্চিত পথরেখা ধরিয়া পথচলা তাহার একদিন রুদ্ধ হইল। এক অনাসক্ত উদাসীন লোক তাহার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মতই সহসা উদিত হইয়া তাহার সুচিন্তিত গতিপথের সুনির্দিষ্ট রেখাটি পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল। যাহার প্রথম পরিচয় বিজয়ার নিকট পূর্ণ বাবুর ভাগিনেয় ভিন্ন বেশী নয়, তাহারই আবির্ভাবে বিজয়ার সমস্ত ভবিষ্যৎটি, দীর্ঘদিনের সুচিন্তিত জীবনচিত্র যেন লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল।

প্রথম দিনের সামান্য পরিচয়ের পরে সেই অজ্ঞাত লোকটি চলিয়া গেল। একমাত্র পূর্ণ বাবুর ভাগিনেয় ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় সে রাখিয়া গেল না। কিন্তু তাহার স্থানত্যাগের অব্যবহিত পরেই অন্যমনস্ক বিজয়ার কপালের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা নিতান্ত অকারণে দেখা গিয়াছিল, ইহা শরৎচন্দ্রের মুখেই আমরা শুনি। বিকালে বেড়াইবার পথে এই লোকটির সঙ্গেই বিজয়ার আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি কি জানি কেন নিতান্ত অকারণেই রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ ভৃত্য কানাই সিংহ বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এ বাবুটি কে মাইজী? বৃদ্ধের প্রশ্ন বিমনা বিজয়ার কানে পৌঁছায় নাই। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত সান্ধ্য মাধুর্য ভুলিয়া গিয়া শুধু এই কথাই সে ভাবিতেছিল—লোকটি কে এবং আবার কবে ইহার সঙ্গে দেখা হইবে।

একদিন বিলাসের নিকটই লোকটির পরিচয় সে পাইয়াছিল। তাহার

গৃহত্যাগের ইতিহাসটি শুনাইতেও বিলাসবিহারী দ্বিধা করে নাই। বিলাস-বিহারী আনন্দের সংবাদই বহন করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত শুনিয়া বিজয়ার মুখ শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

আমরা দেখি, ইহার পর হৃদয় তাহার দুর্নিবার বেগেই নরেন্দ্রের পানে ছুটিয়া চলিতেছিল। এক সময়ে নিজেই সে বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল এবং তাহারই সহিত একসঙ্গে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেন্দ্রর সর্বনাশ কামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সে নরেন্দ্রকে জানিত না। আজ সে নরেন্দ্রকে চিনিয়াছে, তাই বিলাসবিহারী দূরে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের সেই পুরাতন কামনা আজিকার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতে চাহিতেছে ইহা বিজয়ার নিকট ক্রমেই দুঃসহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আজ পিতার বিরুদ্ধে বিজয়ার অভিযোগ—কন্যা স্নেহে অন্ধ হইযা পিতা কেন এই বিষবৃক্ষের মূল নিজেই উৎপাটিত করিয়া গেলেন না। আজ সকলেই জানে, রাসবিহারীর অপেক্ষা তাহার বেশী আপনার আর কেহ নাই। তিনিই বন্ধু তিনিই বান্ধব এবং অভিভাবক বলিতেও তিনিই। কিন্তু বিজয়া জানে এই ধূর্ত ক্রূর লোকটাই জগতে আজ তাহার সবচেয়ে বড় শত্রু। অথচ মুখ ফুটিয়া এই সত্য কথাটি কোথাও বলিবার তাহার কোন উপায় নাই। বৃদ্ধের সবিনয় স্নেহময় সমাজ সেবার অন্তরালে যে স্বার্থপরতার উদগ্র মূর্তি অকুণ্ঠচিত্তে আপনার সমস্ত স্বার্থ অকপটে সমাধা করিতে ছিল, তাহাকে বিজয়া ভিন্ন অন্য কেহই চিনিতে পারে নাই। বিদেশ যাত্রায় বৃদ্ধ নরেন্দ্রকে অযাচিত দান করিয়াছিল, আপনার পথের কাঁটা দূর করিতে গিয়াছিল। আপন গৃহে নিমন্ত্রণের ফাঁদ পাতিয়া সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া লইয়াছিল। শঠতা ও ক্রূরতার তূনীর হইতে একটির পর একটি বাণ মারিয়া সে বিজয়াকে আহত করিতেছিল, আর দূরে দাঁড়াইয়া আপনার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের আনন্দে স্বার্থ-পরতার হাসিই হাসিতেছিল। বিজয়াকে এই সময়ে আমরা দেখি, পাশবদ্ধা হরিণীর মত সে উদ্ধার পাইবার আশায় যতই সে ছটফট করিতেছে, ততই সে যেন এই বৃদ্ধের ক্রূরতার জালে বদ্ধ হইতেছে। সহায়হীন বিজয়া পিতাকে স্মরণ করিয়া সেদিন কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "বাবা, তুমিত এদের চিনতে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন করে এদের মুখের মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে?"

বিজয়াকে এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্যই যেন বৃদ্ধ দয়াল ধাড়া মন্দিরের আচার্যরূপে এই সময় কৃষ্ণপুরে পদার্পণ করিলেন। আমরা দেখি প্রথম পরিচয়েই

বৃদ্ধ বিজয়াকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং বিজয়াও তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলকে বাদ দিয়া এই শান্ত সৌম্য বৃদ্ধের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। শত্রুবেষ্টিত পুরীতে এই বৃদ্ধকেই তাহার একান্ত সুহৃদ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক মস্ত বড় নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাসবিহারী অত্যন্ত ব্যথার স্থানেই আঘাত করিতেছিল। বিজয়া একান্ত অসহায় ভাবেই এই আঘাত সহ্য করিতেছিল, মুক্তিপথের সন্ধান কোথাও সে পায় নাই। কিন্তু দয়ালের ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের বক্তৃতার মধ্যে সে যেন ইহার মধ্যেও একটা অহেতুক সান্ত্বনার সুর খুঁজিয়া পাইল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয়ত বাস্তবিকই ক্রুর নয়, তাহার কঠোরতা হয়ত প্রবল ধর্মানু-রক্তিরই একটা প্রকাশ মাত্র।" কিন্তু ইহা যে কতবড় ফাঁকি বিজয়া সেদিন বুঝিতে পারে নাই। কারণ, সে তাহার পারিপার্শ্বিকের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, এবং সাময়িক ভাবে ইহাকেই জয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া সে নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করিতেছিল। ইহা ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপায়ই ছিল না। কারণ, অর্গলবদ্ধ বন্দীঘরের মুক্তির সকল দুয়ার তাহার নিকট ছিল বন্ধ। তাই ধর্মকে সে নিজের সমস্ত কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া তাহারই অন্তরালে আশ্রয় লইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল। বিজয়া সাময়িকভাবে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল বিলাসকে সে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও গ্রহণ করিবে—নিজের সুখের জন্য নয়, ধর্মের জন্য। ধর্মের জন্য, সমগ্র পল্লীসমাজের জন্য সে আত্মবলি দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল তাহার আত্মবঞ্চনা, আত্মনিগ্রহ।

আমরা দেখি, জ্বরের বিকার ঘোরে বিজয়ার অন্তরের গোপন সত্যটি অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল রাসবিহারীর নিকট। রাসবিহারী পূর্বেই ইহা জানিত, তাই এই সত্য প্রকাশের সকল পথ সে বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল। এবারে তাহার তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাইল। অসহায় বালিকার যত সত্বর সম্ভব আপন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিবার প্রচেষ্টার কোন ক্রটি সে করিল না। মিথ্যা, অসত্য এবং অর্ধ সত্যের জাল বুনিয়া জালবদ্ধ মীনের মতই সে বিজয়াকে টানিয়া তুলিতে লাগিল। বিজয়া ও নরেন্দ্রের মধ্যে এক ব্যবধান রচনায় সে প্রবৃত্ত হইল। ধূর্ত স্বার্থান্বেষী বৃদ্ধ নরেন্দ্রকে বুঝাইলেন—বিলাসবিহারী শুধু যে এই গৃহের ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা তাহা নয়, সে এই গৃহের বর্তমান মালিকও। তাহার অমতে এ বাড়ীতে কিছুই হইতে পারেনা। বিজয়ার স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্যই এখানে

নাই। নরেন্দ্রকে সে ইহা বলিয়াই দূরে সরাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধের এই অতি সাবধানতার ফল ফলিল বিপরীত। বিজ্ঞানের ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ নরেন্দ্রের উদাসীন, অনাসক্ত মন এতদিন তাহার নিজের স্বাভাবিক গতির সন্ধানই রাখিত না, বিজয়া যে সেখানে এককোণে একটু ক্ষুদ্র স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহা তাহার স্বাভাবিক চলার পথে কোন বাধাই সৃষ্টি করিতে পারিত না। কিন্তু রাসবিহারীর সাবধানতা প্রসূত ঈর্ষার ধাক্কায় হৃদয়ের রুদ্ধ উৎসমুখ খুলিয়া গেল। নরেন এতদিন যাহা জানে নাই, এতদিন যাহা বুঝে নাই, তাহাই আজ জানিল এবং বুঝিল। এতদিন সে জানিত হৃদয় তাহার শুধু বিজ্ঞানকেই ভালবাসিয়াছে। কিন্তু আজ দেখিল আর একটি হৃদয়কে যে সে এমন নিবিড় ভাবে ভালবাসিয়াছে, যে ভালবাসার নিকট তাহার বিজ্ঞানের প্রতি ভালবাসা তুচ্ছ। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সমগ্র অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্র যেন নিজের কাছেই নিজে ছোট হইয়া গেল। কিন্তু নরেন্দ্রের দিক হইতে ইহা যাহাই হউক না কেন বিজয়ার জয়ের পথ যে ইহাতে সুগম হইল তাহাই আমরা দেখি। পরাজয়ের সমস্ত গ্লানিকে অতিক্রম করিয়া বিজয়া শেষ পর্যন্ত জয়ের বিপুল গৌরবের অধিকারী হইল; নিঃশেষে প্রমানিত হইল সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। অবশ্য বৃদ্ধ দয়াল ধাড়ার সাহায্য না পাইলে ইহা সম্ভব হইত না তাহাও আমরা বুঝি।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শরৎসাহিত্যে নারী রূপৈশ্বর্য লইয়াই সাহিত্য আসরে প্রবেশ করে না। নারী এখানে পাঠকের হৃদয়েই আসিয়া একেবারে আসন পাতে, চোখ ধাঁধানো তাহার কাজ নয়। নারী এখানে সুরূপা হইতে পারে, কুরূপা হইতে পারে, প্রতিবেশ বা পরিবেশ তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে; কিন্তু অন্তরে তাহার কোমল নারীপ্রকৃতির গোপন ফল্গুধারা কোনদিনই শুকাইয়া যায় না। স্নেহমন্দাকিনীর অমৃত ধারা সেখানে চিরদিনই বিরাজ করে। নারী চরিত্র অংকনে শরৎচন্দ্র তাঁহার অমর সাহিত্যে নারীর এই চিরন্তন প্রকৃতিটিকেই রূপায়িত করিয়াছেন। নারীর বাহিরের প্রকৃতির প্রভাব এখানে খুবই অল্প। হরিপালের শম্ভু চাটুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পোড়াকাঠের সঙ্গে পরিচয়ে আমরা ইহাই দেখি। আমরা দেখি, আকৃতিতে 'পোড়াকাঠ'-কে মানুষ না বলিয়া প্রেতলোকের কোন জাতীয় অধিবাসিনী বলাই সঙ্গত। ম্যালেরিয়ার ডিপোতে উহা পুড়িয়া পুড়িয়া আরও কালো হইয়াছে কিন্তু তবুও স্নেহ-সহানুভূতির সুধা-ধারার সেখানে কোন অভাব নাই।

হরিপালের এই পোড়াকাঠের সঙ্গে পরিচয় আমাদের বেশীক্ষণের জন্য নয়। শরতের এক ঝাপসা সন্ধ্যায় স্বামীহারা দুর্গামণি ততোধিক দুর্ভাগা মেয়ের হাত ধরিয়া আপন ভাইয়ের নিকট গিয়াছিল দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে আশ্রয় লইতে। এখানেই গৃহবধূ ভামিনীর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তারপরে মাঘমাসের এক দুপুর বেলা ম্যালেরিয়ার এই ডিপো হইতে অকৃত্রিম বন্ধুকে সঙ্গী করিয়া মা ও মেয়ে একসঙ্গেই বিদায় লইয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে পোড়াকাঠও আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনার যে পরিচয়টি সে আমাদের নিকট রাখিয়া গেল উহা শরৎ-সাহিত্য হইতে সহজে মুছিয়া ফেলিবার নয়।

দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে লইয়াই দুর্গামণি ভাইএর গৃহে পা দিয়াছিল। সুতরাং অভ্যর্থনা তাহার কালোচিত হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সদরে ভাইয়ের নিকট একদফা লম্বাচৌড়া অভিনন্দন বাণী শ্রবণ করিয়া দুর্গামণি যখন তাহাকেই অনুসরণ করিয়া অন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সামনের দিকে চলিতে তাহার পা উঠিতেছিল না। কারণ, অন্দরে দ্বিতীয় পক্ষের ভ্রাতৃবধূর নিকট ইহা অপেক্ষাও বেশী কিছু সে আশা করিয়াছিল। ভাগ্যহীন জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ভাইএর নিকট আপন অভ্যর্থনার ঘটা দেখিয়া, ইহার পর তাহারই দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর কথা ভাবিয়া হৃদয়ের কোমলতার সামান্য বাষ্পটুকুও বোধহয় শুকাইয়া গিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, বৌএর নাম ভামিনী। সে মেদিনীপুর জেলার মেয়ে। তার কথাগুলা একটু বাঁকা বাঁকা। সহজ কথাটাও দূর হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হয়। তাহার উপর সে যেমন মুখরা তেমনি যুদ্ধ বিশারদ। কিন্তু আমরা দেখি, ইহাই তাহার আসল পরিচয় নয়। হরিপালে পা দিবার পূর্বেই দুর্গামণি বুঝিয়াছিল, ভাই-এর এবং ভ্রাতৃবধূর অনুগ্রহের উপরেই তাহাকে ইহার পরে নির্ভর করিতে হইবে। তাই ভ্রাতৃগৃহে উপযাচক হইয়াই সে ভ্রাতৃবধূকে তাহার গৃহকর্মে সাহায্য করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ভামিনী তাহাকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিল—তুমি দুই দিনের জন্য এসেচো ঠাকুরঝি; তোমাকে কাজ করতে হবেনা। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আমি কাউকে দিতে পারবো না।" কেবলমাত্র ঠাকুরঝির প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই ভামিনী সেদিন একথা বলে নাই, ইহা শুধু ভামিনীর কথা নয়, ইহা শরৎ-সাহিত্যের সকল নারীরই অন্তরের কথা, সকল বাঙ্গালী নারীরই অন্তরের

কথা। পুত্রকন্যার লালনপালন, হেঁসেল এবং ভাঁড়ার ঘর লইয়াই বাঙ্গালী পল্লীগৃহিনীর গৃহিনীপনা, ইহা লইয়াই তাহার রাজত্ব। এই রাজ্যের সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাজ্ঞী। বাঙ্গালী নারীর অন্তঃপ্রকৃতি এই অধিকারের জোরেই বাঁচিয়া থাকে, এ কথা পোড়াকাঠ ভামিনীর ন্যায় অজ্ঞ পল্লীরমনীও জানে এবং এই জন্যই এই স্থান ছাড়িয়া দিতে সে চায় না।

ইহা ভিন্ন, পোড়াকাঠ তাহার নিজের ধরণে জ্ঞানদাকে ভালই বাসিয়াছিল। পিতৃহারা বালিকার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়াই সে তাহাকে সেবা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। পোড়াকাঠের বাহ্যিক ধরণ দেখিয়া ইহা অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে কিন্তু তাহার অন্তরের স্বাভাবিক নারীপ্রকৃতির ইহাই সরল সহজ অভিব্যক্তি। দুর্গামণি ভ্রাতৃবধূর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন ছিলেন না। এজন্য সর্বদা তাহার প্রতি সুবিচার হইয়াছিল এ কথাও বলা যায় না। নবীন এই পোড়া-কাঠেরই ভাই এ কথা মনে রাখিয়াই তিনি ভামিনীর বিচার করিতেন। কিন্তু এই দুর্গামণিও শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই বিদায়ের দিনে গোরুর গাড়ীতে উঠিতে গিয়া পোড়াকাঠের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া দুর্গামণি তাহাকে অশ্রুজলে ভিজাইয়া দিয়াছিলেন।

সেদিনেও তাহার প্রলয়ঙ্করী রণরঙ্গিনী মূর্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল বেশী। কিন্তু ইহা ছিল অসহায় নারীত্বের পক্ষে এক নারীর বিদ্রোহ। আমরা জানি, শিক্ষা এবং সংস্কারের অভাবেই তাহার সংযমের বাঁধ সেদিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। স্বামী শম্ভু চাটুয্যে বলিয়াছিলেন, "নবীন সুপাত্তর।" কিন্তু ভামিনী ইহা শুনিয়া উত্তর করিয়াছিল—"সুপাত্তর বটে! আমার নিজের দাদা আমি জানিনে? তাড়ি গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাসের পেটের উপর লাথি মেরে যে হত্যা করতে পারে—"। ভাই হইলেও তাহারই নিকটে আর একটি অসহায় নারীকে বলি দিতে ভামিনীর নারী-অন্তর ব্যথাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। একান্ত উত্তেজনাবশেই তাহার একমাত্র অলঙ্কার রূপার গোটাছড়াটি হারানোর কথা সেদিন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পোড়াকাঠ তাহার এই আত্মদান সেদিন কিন্তু গোপন করিতে চাহিয়াছিল। দুর্গামণিকে সে বলিয়াছিল, "বললে তুমি মনে কষ্ট পাবে, তাই বলতাম না ঠাকুরঝি।" দুর্গামণিও গভীর অনুশোচনার সঙ্গে তাহার ভুল সেদিন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিয়াছিল, "না বুঝে অনেক অপরাধই তোমার চরণে কোরে গেলাম বৌ, সে সব মাপ কোরো।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,

পোড়াকাঠ আজ আর সমস্ত মাড়ি বিকশিত করিয়া হাসিল না, বরং চট্ করিয়া এক ফাঁকে চোখ মুছিয়া লইয়া কহিল, "পোড়া কপাল! অপরাধ ত আমাদেরই হ'ল ঠাকুরঝি। ও রে গেণি, মামা-মামীর উপর রাগটাক করিসনে যেন।" এই বলিয়া তাহার গেণিমাকেই আসচেবার আম কাঁঠালের দিনে জামাইসহ নিমন্ত্রণ করিয়া হাতের পিঠ দিয়া দুফোঁটা চোখের জল সে মুছিয়া ফেলিল।

শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, হৃদয়ের এই স্নেহ-মাধুর্যেই নারীর স্বাভাবিক বিকাশ, বাহিরের সৌন্দর্য ইহার নিকট তুচ্ছ। হৃদয়ের এই ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যময় করেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যে তাঁহার নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—ইহাই শরৎ-সাহিত্যে নারীর বৈশিষ্ট্য।

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ

সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি কিন্তু দেবতা বলে মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত নরনারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দয় মূর্তি দেখা দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে মানুষকে সইতে হয় এইখানে।"

ইহাই শরৎ-সাহিত্যে সমাজের প্রতি প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী।

অন্যান্য শিল্পীদের মতই শরৎচন্দ্রও শিল্পী, শিল্প সৃষ্টি করাই তাঁহার কাজ। উপন্যাসে এজন্য তিনি বিবিধ নরনারীর অবতারণা করিয়াছেন। চলার পথে তাহারা যে সংঘাত সৃষ্টি করে, উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ উহার দ্বারাই অগ্রসর হইয়া চলে। বঙ্কিম-সাহিত্যেও আমরা ইহাই দেখিয়াছি। নগেন্দ্রের কৃত কর্ম সূর্যমুখীর জীবনে অশ্রুর বান ডাকায়, কুন্দনন্দিনীর জীবন যে অশ্রুসজল হইয়া উঠে, তাহার মূলেও নগেন্দ্র। সূর্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলেই বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় এবং পরিবর্ধিত হয়। নগেন্দ্রনাথ যতদিন সে বৃক্ষকে স্বহস্তে উৎপাটিত করেন নাই, ততদিন তাহার বিষময় ফল ঐ বৃক্ষের আশ্রয় যাহারা লইয়াছে, সকলকেই ভোগ করিতে হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলেও আমরা ইহাই দেখি। ভ্রমরের সমস্ত চোখের জলের মূলেও গোবিন্দলাল একা, রোহিণীকেও গোবিন্দলালই বারুণীর পুষ্করিণী হইতে উদ্ধার করিয়া অন্যত্র ডুবাইয়াছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও দেখি, সুচরিতা, বিমলা বা কমলার হৃদয়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উত্থান-পতন সমস্তই যেন তাহাদের নিজস্ব। ইহাদের কাহারও জীবনই সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। বাহিরের সমাজের কোন প্রভাব কাহারও জীবনেই যেন প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য ইহা হইতে স্বতন্ত্র। চরিত্র সমূহের এখানে যেন আলাদা সত্তা নাই। তাহারা যেন সমাজ-জীবনেরই জীবন্ত অংশ। নরনারীর জীবনের আনন্দ-নিরানন্দ সুখ-দুঃখ যেন স্বপ্রতিষ্ঠ নয়। সমাজকে বাদ দিয়া আলাদা অস্তিত্ব যেন ইহার আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

সমাজের হিংস্র কশাঘাতে যাহারা আহত এবং রক্তাক্ত তাহাদের জন্য শরৎচন্দ্রের দরদ ছিল প্রাণভরা। সমাজে লাঞ্ছিত যাহারা, নিপীড়িত যাহারা, বঞ্চিত যাহারা তাহাদের জন্য শরৎচন্দ্রের হৃদয় ছিল স্নেহমমতায় পূর্ণ। ইহাদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন,

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলনা সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিল আমার মুখ খুলে—এরাই পাঠাল আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

এই জন্যই শরৎ-সাহিত্যে নিপীড়িত যাহারা, দুর্বল যাহারা, চোখের জল ভিন্ন অন্য কিছু সম্বল যাহাদের নাই, তাহারা বাণী পাইয়াছে। ভারতীয় নারী জাতি যুগ যুগ ধরিয়া লাঞ্ছিত, নারীর সতীত্ব লইয়া এখানে চলিয়াছিল এক কপট আধ্যাত্মিকতার অভিনয়। নারী এখানে সতীত্বের অপূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত অথচ মনুষত্বের সামান্য অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত। তাই জীবনে ইহাদের লাঞ্ছনা শরৎচন্দ্রকে শুধু ব্যথিতই করে নাই, বিদ্রোহী করিয়াও তুলিয়াছিল। শরৎ-সাহিত্য এই মর্মান্তিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রীকে শরৎচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন, "দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনও সুবিচার করেনি, আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবন ভোর তারই প্রতিবাদ করবো।"

ডাঃ মজুমদারকে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা মনে মনে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে যে আদর্শ পোষণ করি, বর্তমান সমাজের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় থাকলে বুঝতে পারবো তা কতটা ভুয়ো।"

সমাজে নারীজাতির প্রতি অত্যাচার-অবিচার শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং শরৎ-সাহিত্যে তাহারই প্রতিবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত সমাজের বিধি-নির্দেশের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ তিনি কোথাও সমর্থন করেন নাই। কারণ, শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ শিল্পী, লাঞ্ছিতের বেদনা তাঁহাকে অশ্রুসজল করে কিন্তু ভাঙবার পথে প্রেরণা দেয় না। এই জন্যই সমাজের রীতিনীতি লঙ্ঘন করিয়া সমাজকে আঘাত করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সাহিত্যের আসরেও তিনি যাহাদের আনিয়াছেন, তাহারা কেহ এই পথে অগ্রসর হউক, ইহাও তিনি সমর্থন করিতেন

না। সমাজে যাহারা ধিকৃত, শরৎচন্দ্র তাহাদের সম্মুখে মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছেন। অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহার বেশী তিনি নিজেও অগ্রসর হন নাই, তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র সমূহের কাহাকেও তিনি অগ্রসর হইতেও দেন নাই। সমাজে যাহারা উপেক্ষিত শরৎ-সাহিত্য তাহাদের মানবতার গৌরবে অঙ্কিত করিয়া সম্মানের আসনে বসাইয়া দেয়, কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের বিধি-নির্দেশ ভাঙ্গে না। কিন্তু এই পর্যন্ত, ইহার বেশীদূর নয়।

চরিত্রহীন উপন্যাসে কিরণময়ী দিবাকরকে বলিতেছে, "শাস্ত্রের জোর জবরদস্তি আর দাম্ভিক উক্তি দেখলেই আমার গা জ্বালা করে ওঠে।...কেবল মনে হয় তুমি ও জান না, আমিও জানি না। তবে বাপু, তোমার এত গায়ের জোর, এত বিধি-নিষেধের ঘটা, এত মিথ্যে নিয়ে ঝুড়ি ভর্তি করা কেন? সমস্ত কাজেই যেন ভগবান তাদের মধ্যস্থ রেখে কাজ করছেন, এমনি দাম্ভিক অনুশাসনের বহর। শুধু জবরদস্তি—শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ সমস্তই এই গায়ের জোর আর চোখ রাঙানি।"

ইহার উত্তরে দিবাকরের প্রতি কিরণময়ীর উপদেশও আমরা দেখি, "যা সত্য তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যে হোক আর শাস্ত্রই মিথ্যে হয়ে যাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। স্নেহের বশে হোক, মমতায় হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।"

দিবাকরকে কিরণময়ী আরও বলিয়াছে, "এই কথাটি সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রকাশ হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়।"

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে আশু বাবুর নিকট কমলও ইহাই বলিয়াছিল, "সত্য যাবে ডুবে আর যে অনুষ্ঠান আমি মানিনে তারই দড়ি দিয়া ওঁকে রাখবো বেঁধে?"

প্রচলিত সমাজের-আচার অনুষ্ঠানের সম্পর্কে ইহাই শরৎ-সাহিত্যের বিশ্বাস। শত সহস্র বৎসর ধরেই কোন শাস্ত্রীয় বিধান হয়ত টিঁকিয়া আছে কিন্তু তাই বলিয়াই ইহা সত্য হইতে পারে না, ইহাই শরৎ-সাহিত্য নিঃসংশয়ে প্রচার করিতে চায়।

সমাজের কোন রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারই চিরন্তন বা সনাতন হইতে পারে না। আজিকার জগতের নিয়মে যাহা সত্য এবং কল্যাণময়, কাল তারা অসত্য এবং অন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে এবং কল্যাণের পথ তখন সুগম না করিয়া রুদ্ধই করিবে। তখন এই সামাজিক বিধিকে লঙ্ঘন করিয়াই নূতনের আগমনের পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। বাধা হয়ত আসিবে কিন্তু সে বাধাকে অতিক্রম করিতে হইবে ইহাই শরৎ-সাহিত্যের কথা।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "মানুষই ভুল করতে জানে, অন্যায় করতে জানে আর সমাজই জানে না? উভয়ের সীমা নির্দিষ্ট আছে—সে সীমা মূঢ়তায় হউক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হউক, অন্যায় নিজের বশে হউক—যে ভাবেই হউক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল।"

এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র আরও বলিয়াছেন, "সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।"

এখানে দেখি, শরৎচন্দ্র সমাজকে তার সীমালঙ্ঘনের জন্য আঘাত করিতে বলিতেছেন, কিন্তু ইহার পরই আবার তিনি রাশ টানিয়া ধরিয়াছেন, "সমাজকে আঘাত করা আর সামাজিক অবিচারকে আঘাত করা এক কথা নয়। অর্থাৎ সামাজিক অবিচারকে আঘাত করা চলিলেও সমাজকে আঘাত করা চলে না।

সমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ এখানে আসিয়াই থামিয়া গেল, বিচার-বিবেচনার মধ্যে ডুবিয়া গেল। কোন্‌টি অবিচার, কোন্‌টি বিচার এবং কোন্‌টি সুবিচার তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরিয়া চলিতে হইবে, একটু এদিক-ওদিক হইলেই পদস্খলন। সমাজ-জীবনে যে অর্ধ মৃত, জীবনের স্পন্দন যেখানে থামিয়া গিয়াছে, পচন যাহার সমাজের অন্য অঙ্গে পচন ধরাইতেছে, তাহাই দূর করিয়া সমাজ-জীবনে স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহ সচল রাখিতে হইবে। ইহা করিতে গিয়া যেন সমাজের সচল অঙ্গকেই আঘাত করিয়া অচল করিয়া না তুলি—শরৎচন্দ্র ইহাই বলিয়াছেন। ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত।

প্রকৃত পক্ষে শরৎচন্দ্র এখানে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী নন, তিনি সংস্কারবাদী। মূলবস্তুকে অটুট রাখিয়া যে অংশে তাহার পচন ধরিয়াছে তাহাই তিনি সংস্কার করিয়া লইতে চান। সমগ্রকে আঘাত করিতে তিনি ব্যথা পান। কিন্তু ১৩৩০ সালের ২১ নবেম্বর চন্দননগরে এক সাহিত্য সভায় এই শরৎচন্দ্রকেই আমরা বলিতে শুনি,

"আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরানো জিনিসটা অদল-বদল করে নেবো এ আমি চাই না। সংস্কারের মানে কি তা 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি। যেটা খারাপ জিনিস, অনেক দিন চলে ধধ্ধড়ে নড়নড়ে হয়ে গেছে, তাকে মেরামত করা। মেরামত করে কখনও ভাল হয় না। বরং অন্যায় অচল জিনিসটাকে মজবুত করে কায়মী করে তোলা হয়।"

কিন্তু আমরা জানি, শরৎ-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত কথা ইহা নয়। ক্ষণিক উত্তেজনাবশে ইহা শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার কথা মাত্র।

সমাজে অন্যায় আছে, অবিচার আছে। ইহা দূর করিবার উপায় কি? হয় সংস্কার নয় বিদ্রোহ বা বিপ্লব—আমূল পরিবর্তন চেষ্টা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শরৎ--সাহিত্য প্রতিবাদ জানাইয়াছে কিন্তু প্রতিকারের কথা কিছু বলে নাই।

'প্রবাহ' পত্রিকায় ১৩৪৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানি রেঙ্গুন হইতে ১০।৩।১৬ তারিখে লিখিত। ঐ পত্রে শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন,

তারপরে প্রতিকারেরর উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি?"

অন্যত্রও. শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সমাজ সংস্কারের দুরভিসন্ধি আমার নেই। তাই বইএর মধ্যে আমার মানুষের বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে কিন্তু সমাধান নেই। কারণ ও কাজ আমার নয়, অপরের। আমি শুধু গল্প লেখক, তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমরা জানি, শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে ইহাই সত্য কথা। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ শিল্পী এবং রসস্রষ্টা। মানুষের জীবনের ব্যথা-বেদনা তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনার তরঙ্গ তোলে, শিল্পী হিসাবে ব্যথা পান এবং এই ব্যথা তাঁহাকে নব সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যথা-বেদনা দূর করিবার পথে তাহাকে ইহা আগাইয়া দেয় না।

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ শুধু জীবন্তই নয়, ঘটনা প্রবাহের পশ্চাতে থাকিয়া সমাজ যেন নরনারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহার সুনির্দিষ্ট গতিপথের বাহিরে পা বাড়াইলে আর রক্ষা নাই। সমাজ তাহার সমগ্র জীবন এক নৈরাশ্য--ময় হাহাকারে পূর্ণ করিয়া দিবে, ইহার পরিণতি সর্বত্র যে কল্যাণময়, তাহা নয়। তাই শরৎ-সাহিত্য এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছে কিন্তু সমাধান নিরুপণ

করে নাই। সামাজিক বিধিনিষেধ সর্বত্র যে নরনারীর কল্যাণের কারণ হয় না ; শরৎ-সাহিত্য এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে তবুও এই সামাজিক বিধি--নিষেধ উপেক্ষা করিবার বা ইহার বিরুদ্ধতা করিবার দুঃসাহস শরৎচন্দ্র তাঁহার অঙ্কিত নরনারীর কাহারও অন্তরে দেন নাই। আমরা দেখি, এ পথে যে কেহ পা বাড়াইয়াছে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে নাই ; বিশেষ করিয়া নারী চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্র শিল্পীর নিপুন তুলিকায় ইহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয় যে কি বিরাট দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত শরৎচন্দ্র শুধু ইহা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এখানে নারীজীবনে নিপীড়িত লাঞ্ছনাকে তিনি পাঠকের চিত্তে সমবেদনার আসনে বসাইয়াছেন।

শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, নারীর গৃহ সংসার, নারীর গৃহিনীপনা, নারীর মাতৃত্ব বাঙ্গালী বা ভারতীয় সমাজে ইহাই নারীর চিত্র, ইহা লইয়াই সমাজে তাহার অধিকার, তাহার কর্তৃত্ব। কিন্তু এই অধিকার বা কর্তৃত্ব তাহার নির্বিরোধ নয়। অপরিসীম দুঃখ, অনন্ত বেদনা যেন তাহার সঞ্চিত আছে এই স্থানে। আমরা জানি, সমাজ বহুদিন একই নিয়মে চলিতে পারে না, কালের স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজ একদিন জীর্ণ এবং পঙ্গু হইয়া পড়ে। সামাজিক নরনারীর কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ সাধনই তখন সে সমাজ করিয়া থাকে। সামাজিক নরনারীর পক্ষে তখন এই সমাজ এক অচলায়তন বা বন্দীগৃহ হইয়া দাঁড়ায়। একদিন সমাজ--বিপ্লব আসিয়া সমাজের এই বন্দীগৃহ ভাঙ্গিয়া দিয়া এখানে নূতনের আগমনের প্রবাহপথ খুলিয়া দিয়া ইহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। কালের নিয়মেই সমাজকে মাঝে মাঝে এইরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেদিকে ইঙ্গিত করেন নাই। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সমাজ আজ যতই জীর্ণ, যতই পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, নারী--হৃদয়ের বিপক্ষে ইহার শক্তি যেন ততই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। নারী-হৃদয়কে পেষণ বা নিপীড়িত করিতেই যেন তাহার আনন্দ সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু সমাজ শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই সমাজে নারীর আত্মবিকাশ ঘটিয়া থাকে। শরৎ-সাহিত্য এই দিকেই বেশী করিয়া ইঙ্গিত করে এবং ইহাই শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বিশেষ কোন ঘটনার উপর ইহা নির্ভর করেনা।

সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব আমরা দেখি, রাজলক্ষ্মীর জীবনে। শৈশবের শিশুমনের একান্ত খেয়ালবশেই রাজলক্ষ্মী এক ছড়া বৈঁচির মালা

পরাইয়া দিয়াছিল তাহারই ন্যায় অপর এক শিশু শ্রীকান্তকে। নারী-হৃদয় ইহার মধ্যে ছিল না কিন্তু ছিল শিশুমনের সমস্ত শুভ ইচ্ছা এবং মঙ্গল কামনা। দেবানন্দপুরের পাঠশালায় পণ্ডিত মহাশয়ের শিশুকন্যা কালিদাসী শরৎচন্দ্রের নিপুন তুলিকায় একদিন রাজলক্ষ্মী হইয়া উঠিয়াছিল। শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর জীবনে এই কালিদাসী ছিল শুধু প্রিয় শিষ্যা নয়, খেলাধূলার অন্তরঙ্গ সাথীও। শরৎচন্দ্রের জনৈক জীবনীকার বলেন, কালিদাসী বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। রোগা—পেট মোটা, গায়ের রংটা কিন্তু ঝকঝকে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চুলগুলো ছোট ছোট—শরৎচন্দ্রের একান্ত অনুগত। খেলা ত ছাই, বন থেকে যোগাড করে আনত বৈঁচি ফল।" মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় রাজলক্ষ্মীর বা কালিদাসীর সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয় নাই। তবে পাঠশালায় সর্দার পোড়ো শ্রীকান্তকে সে বৈঁচিমালা যোগাইত তাহা আমরা জানি। সমাজের সঙ্গে এই দুই শিশু মনের কোন সংঘাত বাঁধে নাই, বাঁধিবার কথাও নয়। কালিদাসী সেদিন নির্বিরোধে শ্রীকান্তকে মালা যোগাইত এবং শ্রীকান্ত তাহা নির্বিকার ভক্ষণ করিত। তারপরে স্বামী পরিত্যক্তা মাতার দুই কন্যা সুরলক্ষ্মী আর রাজলক্ষ্মী যেদিন একসাথেই ভঙ্গকুলীনের সন্তান বিরিঞ্চি দত্তের পাচক ব্রাহ্মণের নিকট মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পাত্রস্থ হইল, সমাজ সেদিন একবার ভ্রুক্ষেপ করিয়াও সেদিকে দেখিল না। আবার রাজলক্ষ্মী যেদিন কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল, সমাজ সেদিনও তাহার সম্পর্কে সংবাদ রাখা প্রয়োজন মনে করে নাই।

কালীদাসী জীবনের এই পরিণতিই হয়ত একমাত্র সত্য হইত, কাশীতে মৃত্যুর পরে যে আবার রাজলক্ষ্মীরূপে জন্ম পাইয়াছে, একথা সমাজও হয়ত জানিতেও পারিত না, যদিনা মহাদেব সাহুর শিকার সঙ্গী হিসাবে সে নিজেই তাহার বহুদিন আগের হারাণো শ্রীকান্তকে আবিষ্কার করিত। এখানেই আরম্ভ হইল রাজলক্ষ্মীর জীবনে দ্বন্দ্ব। নারী-হৃদয় চাহিল একছড়া বৈঁচিমালাকে সত্য করিয়া তুলিতে, কিন্তু পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল সমাজ। এই সমাজের জন্যই রাজলক্ষ্মীর বৈঁচিমালা সত্য হইয়া উঠিতে পারিল না, দুইটি নরনারীর হৃদয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সমাজ এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করিতে চাহিল। কঠোর শাসক সমাজ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই জানাইয়া দিল, বিধান তাহার নিয়তির মতই দুর্বার। বালক-বালিকার মালাবদল করা আর নরনারীর হৃদয়ের মিলন এক কথা নয়।

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ নরনারীর হৃদয়ের চরম দুঃখের পরীক্ষা কেন্দ্র। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত জীবনের প্রারম্ভে এক খেলাঘর গড়িয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক সামাজিক ঝটিকা আসিয়া সে ঘর লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। শ্রীকান্তের মনে একছড়া বৈঁচিমালার স্মৃতিমাত্র রহিয়া গেল এবং রাজলক্ষ্মীও সেই শৈশবের স্মৃতিকেই অবলম্বন করিয়া নিজে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবিয়া গেল। তারপর দীর্ঘদিনের ভাঙ্গাগড়া, আবর্তন বিবর্তনের পর শ্রীকান্ত জানিল কালিদাসী মরে নাই, শুধু রাজলক্ষ্মীতে পরিণত হইয়াছে। কুমার সাহেবরূপী মহাদেব সাহুর আড্ডার আসরে কালিদাসীই শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করে। শরৎচন্দ্র তখন মাতিয়াছিলেন গানে ও শিকারের আনন্দে। আনুসঙ্গিক সব কিছুই জুটিতেছিল। কালিদাসীও আসিয়াছিল সেই আসরের সঙ্গী হইয়া। হঠাৎ শরৎচন্দ্রকে সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইল সে। লোক দিয়া ডাকাইয়া লইয়া ঘরে নিয়া বসাইল, তামাক সাজিয়া আনিয়া দিয়া ফরাসের উপর বসিয়া বিভিন্ন প্রশ্ন করিতে লাগিল—এখানে কবে এলে? মা মারা গেছেন, তবে বাবা কোথায়? ভাগলপুরে তো ছিলে তবে এ স্বপ্নরাজ্যে এসে জুটলে কেমন করে? শরৎচন্দ্র কথা শুনে বিস্মিত—যেন কত পরিচিত, অথচ চিনিতে পারিতেছেন না। শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া কালিদাসী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে পরিচয় হইল এবং তারপরেই আরম্ভ হইল কড়াশাসন, কুমার সাহেবের মোসাহেবগিরিতে কতকটা ছেদ পড়িল। হয়ত কুমারসাহেব শিকারে যাবেন শরৎচন্দ্রের ডাক পড়িয়াছে। কিন্তু কালিদাসী পূর্বেই জানাইয়া দেয় বাবুজীর শরীর খারাপ, এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র আপত্তি করিলে কালিদাসী বন্দুকটা হয়ত হাতে তুলিয়া লয়—চুপ! একটা কথা কয়েছ কি গুলি করে—মরে যাবো। শরৎচন্দ্র নীরবে আদেশ পালন করেন। ইহার পরেই রাজলক্ষ্মীর জীবনে আরম্ভ হইল কঠোর তপস্যা, কত পূজা-পার্বন—একছড়া বৈঁচির মালাকে কি করিয়া সত্য করিয়া তুলিবে, তাহারই সুকঠিন সাধনা। কিন্তু নিষ্ঠুর বধির সমাজে নারী-হৃদয়ের সমস্ত আকুল, আবেদনই নিষ্ফল হইল, বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অশ্রু সমাজের চক্ষু সজল করিয়া তুলিল না। একসময় শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কি করলে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে বলতে পারো"? রাজলক্ষ্মী উত্তর করিয়াছিল—"সে আমি ভেবে দেখেছি, আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়,

কিছু না থাকে, একেবারে নিরাশ্রয় হই, তা হ'লেই।" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, শুনিয়া শ্রীকান্ত অনেকক্ষণ নীরব হইয়াছিল; পরে বলিয়াছিল—লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি করে?" এইখানেই নারী-হৃদয়ের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব, নারী জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা, সমস্ত কামনা বাসনা, সমস্ত চাওয়া না চাওয়ার বিরুদ্ধে সমাজের বিধান। সমাজের নিকট সম্ভ্রম আসিয়া নারী জীবনের সহজ সার্থকতা লাভের গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়।

পাটনায় পিয়ারী বাঈজীর জীবনে হঠাৎ একদিন শ্রীকান্তের পুনরাবির্ভাব ঘটিল, এ যেন মেঘের মধ্যে হারানো চাঁদের পুনরুদয়। রাজলক্ষ্মীর জীবন উদ্ভাসিত হইল, রাজলক্ষ্মী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া নিজেকে নিঃশেষে ডুবাইয়া দিতে চাহিল সেই সৌন্দর্যালোকে। হারানো নিধি ফিরিয়া পাইয়া শতবন্ধনে তাহাকে বাঁধিতে চাহিল। কিন্তু বিরোধী হইল সমাজ। সমাজ জানাইয়া দিল, স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক, সমাজের সদর দরজা পার হইয়া যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার পুনঃ প্রবেশের পথ আর খোলা থাকে না। যে দণ্ড সমাজ তাহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যত নির্মমই হউক না কেন, অপরাধীকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবেই। সমাজ জানাইল, রাজলক্ষ্মীর নিকট সমাজে প্রবেশের সকল পথই রুদ্ধ। শ্রীকান্ত হয়ত সমাজ ত্যাগ করিয়া রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে আসিয়া মিলিতে পারে কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করা শ্রীকান্তের পক্ষে সম্ভব নয় এবং রাজলক্ষ্মী নিজেও তাহা চায় না। প্রিয়তমকে সমাজে তাহার সম্মানের আসন হইতে নামাইয়া আনিবে, চতুর্দিকে দশজনের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিবে ইহা রাজলক্ষ্মীর অভিপ্রায় নয়। এই জন্যই মিলনের একান্ত কামনা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী সেদিন শ্রীকান্তর সঙ্গে মিলিত হইতে পারিল না।

রাজলক্ষ্মী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই, সমাজের নির্দেশ অমান্য করিয়া সে শ্রীকান্তর সঙ্গে মিলিত হয় নাই, সে সাহস তাহার ছিল না। সমাজ ছিল তাহার প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে বাধা। এজন্য সমাজের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ছিল। রাজলক্ষ্মী জানিত, সমাজের নির্দেশ মানিয়া লইয়া শ্রীকান্তের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হওয়া রাজলক্ষ্মীর পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথাই শ্রীকান্তের নিকট সে একদিন বলিয়াছিল—দেখ, আমি অবোধ নই, আমার পাপের গুরুদণ্ড

আমাকে ভুগতে হবে জানি, কিন্তু তবু বলচি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়। একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে। ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন।"

সমাজের অবিচার এবং অত্যাচার সেদিন অতি তীব্র হইয়াই রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়াছিল। ভালবাসার পাত্র ধরা দিতে আসিয়াছে। হৃদয়ের তৃপ্তি, জীবনের সার্থকতা আজ তাহার সম্মুখে, অথচ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন উপায় নাই, নির্মম আঘাতে বারবার তাহাকে দূরে সরাইয়া দিতে হইতেছে। তাই সমাজের প্রতি তাহার এ অভিশাপ নয়, এ তাহার বুককাটা দীর্ঘশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে, রাজলক্ষ্মী সমাজের নিকট আত্মসমর্পণই করিয়াছিল। আমার পাপের ফল আমাকে ভুগতে হবে—ইহাই ছিল তাহার অন্তরের কথা, ইহাই ছিল তাহার নিকট কল্যাণের পথ। সমাজের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়া গিরিকুমারী একদিন তপস্যার মধ্য দিয়াই তাহার শ্রেয়কে এবং প্রেয়কে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহার সে-চেষ্টা সার্থকও হইয়াছিল। আমরা দেখি রাজলক্ষ্মীও শ্রীকান্তকে পাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্তই আজীবন অবলম্বন করিয়া লইল। সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে, সমাজের নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যেই সে দেখিতে পাইল কল্যাণের পথ। পুরাতন সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন সমাজ গড়িতে সে অগ্রসর হইল না; কারণ ইহা তাহার নিকট সার্থকতার পথ বা কল্যাণের পথ নয়। শ্রীকান্তকে সে একদিন এই কথাই বলিয়াছিল, চিরন্তন ভারতীয় সমাজের এই কল্যাণময় রূপটিই দেখাইতে চাহিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল, "বাড়ীর গিন্নি সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়। অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও বেশী খাইতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, অন্য দেশের রাণী করে তোলবার চেষ্টা করো না।" ইহা পুরাতনের প্রতি আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ইহাই শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর। সমাজ বিপ্লব, সমাজের প্রতি বিদ্রোহ শরৎচন্দ্র কখনও সমর্থন করেন নাই। শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর কথার মধ্য দিয়া তথাকথিত সমাজ-বিপ্লবীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের মনোভাব আমরা দেখি। শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী বলিয়াছিল—"তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশী নিন্দে করে বেড়ায়, যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল করে পরের সমাজ, না জানো ভাল করে নিজেদের সমাজ।"

১৪,৮,১৯ তারিখে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি পত্র

লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রে এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভিমত আমরা দেখি—"সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না; তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, অল্প দিনেই দুর্বিসহ হয়ে উঠে।" অর্থাৎ নারী চায় সর্বাগ্রে ভালবাসার পাত্রের সমাজে প্রতিষ্ঠা। পল্লী-সমাজেও শরৎচন্দ্র এই কথাই বলিয়াছেন—"সমাজ যাকে শাস্তি নিয়ে আলাদা করে রেখেছে—তাকে জবরদস্তি করে ডেকে আনা যায় না।" অর্থাৎ সমাজের বিরুদ্ধে জবরদস্তি চলে না, ইহাই শরৎ-সাহিত্যের অভিমত। সমাজের অত্যাচার অবিচার যতই নির্মম এবং যতই হৃদয়হীন হউক না কেন, সমাজ-জীবনে নারীকে উহা মানিয়া লইতেই হইবে। এই জন্যই সামাজিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব দেখি আমরা রমার জীবনেও। শরৎ-সাহিত্যে পাঠশালাগুলি শিক্ষাকেন্দ্র না হইয়া যেন মদন দেবতার লীলাভূমি। মনসা পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীকান্ত এবং রাজলক্ষ্মীর হৃদয় বিনিময় হইয়াছিল। রমা রমেশের হৃদয়ের বিনিময় হইয়াছিল শীতলাতলার পাঠশালায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শৈশব হৃদয়ের যখন পরস্পর বিনিময় হইয়া থাকে সমাজ তখন দূরে থাকিয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসিই হাসিয়াছিল। আবার রাণী যেদিন মাতৃশোকাতুর রমেশকে সান্ত্বনা দিয়া কহিয়াছিল—"কেঁদোনা, রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব," ভবিষ্যৎ সেদিন সমাজের নির্মম নিষ্ঠুরতার দিকে চাহিয়া বোধ হয় বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই নারী-হৃদয়ের নীরব আকুল আবেদন আমরা দেখি রমার প্রতি দীর্ঘশ্বাসে। রমা আপনার ব্যর্থ জীবনের জন্য সমাজের এক কোণে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান চাহিয়াছিল। হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত শুভ ইচ্ছা, আপনার সমস্ত মঙ্গল অমঙ্গলকে রমা সমাজের জন্যই দলন করিতেছিল। সমাজনির্দিষ্ট প্রত্যেকটি আজ্ঞা এবং অনুজ্ঞা সে সানন্দচিত্তে পালন করিতেছিল। সমাজের নিকট এই আত্মবিসর্জনে রমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছিল, তবুও ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য উপেক্ষা করিয়া রমার নারী-হৃদয় সমাজের ছায়াতেই দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী ঘোষালের পরিচালিত পল্লীসমাজের নিকট রমার আকুল আবেদন ব্যর্থ হইল, পল্লীসমাজের বুকে রমার একটু সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ও জুটিল না, বিশ্বেশ্বরীর হাত ধরিয়া ভগ্ন হৃদয়ে তাহাকে সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তাহার একান্ত নিঃস্ব, সর্বহারা, অসহায় মুখশ্রীর দিকে সমাজ একবার চাহিয়াও দেখিল না।

স্নেহপরায়ণা জ্যাঠাই মা বিশ্বেশ্বরীর নিকট রমা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা জ্যাঠাই মা, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নিরপরাধীকে দণ্ডভোগ করানোর শাস্তি কি ?" শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—বিশ্বেশ্বরী জানালার বাহিরে চাহিয়া রমার বিপর্যস্ত রুক্ষ কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন, তাহার নিমীলিত দৃষ্ট চোখের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"কিন্তু তোমার ত হাত ছিল না মা! মেয়ে মানুষের এত বড় কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে, যে কাপুরুষেরা তোমার উপর অত্যাচার করেছে এর সমস্ত গুরুদণ্ড তাদেরই। তোমাকে ত এর একটি কিছুই বইতে হবে না মা।" কিন্তু জ্যাঠাইমার সমস্ত সান্ত্বনা ও সহানুভূতির পরেও পল্লী সমাজকে গুরুদণ্ড কেন, কোন দণ্ডই বহন করিতে হয় নাই। সমাজ অনায়াসেই সমস্ত শাস্তির বোঝা এক নিরপরাধ অসহায়া নারীর স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া আপনি বিচারকের আসনে গিয়া বসিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরী নিজেও যে ইহা জানিতেন না তাহা নয়। কাশীযাত্রার দিনে এই কথাই তাহাকে বলিতে শুনি। ভগবান এত রূপ, এত গুণ এবং এত বড় একটি মহৎ প্রাণ দিয়া রমাকে সৃষ্টি করিয়া কেন তাহাকে সমাজের বাহিরে ঠেলিয়া দিলেন, কেন তা যে কোন কাজে লাগিল না—এ সংশয় তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। প্রশ্ন তুলিয়াছিল—একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না, এ শুধু সমাজেরই খেয়ালের খেলা—ইহাই তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। পল্লীসমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াই রমাকে চিরদিনের মত সমাজ ত্যাগ করিয়া বহুদূরে সরিয়া যাইতে হইল। আমরা দেখি, পল্লীসমাজের দণ্ড সে নীরবেই সহ্য করিয়াছিল, আপন একান্ত অভীষ্টকে সে অকাতরেই বলি দিয়াছিল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিদায় নেবার সময় পর্যন্ত পল্লীসমাজের এক বিন্দু সহানুভূতি তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। এই দিক হইতে রমার জীবন সর্বাপেক্ষা করুণ। পল্লীসমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ের আশা সে কোন মতেই করিতে পারে না। শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায়ও তাহা নয়। তাই পরাজয়ের গ্লানি লইয়াই এই সমাজ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

রমার হৃদয় রমেশের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে নাই, কারণ পল্লীসমাজ ইহার বিরোধী ছিল। নির্জন গৃহের মধ্যে তাহার নীরব অশ্রুপাতের কোন সাক্ষী ছিল না। অন্তরের ব্যথা রমা হয়ত অন্তরেই পোষণ করিত। কিন্তু পল্লীসমাজ তাহাকে এখানেও রেহাই দিল না। তারকেশ্বরে রমা রমেশকে কাছে বসাইয়া

খাওয়াইয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। দিনটিকে স্মৃতিতে গাঁথিয়া নীরব অশ্রুপাতে হয়ত এই স্মৃতিরই পূজা করিয়া তাহার দিন কাটিত। পল্লীসমাজের কঠোর শাসনে তাহার সে উপায়ও রহিল না। প্রত্যক্ষভাবে রমেশের বিরুদ্ধে তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। পল্লীসমাজের নির্দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া রমেশকে জেলে পুরিতে হইল। রমা অসহায়। বেণী ঘোষাল গোবিন্দ গাঙ্গুলীর সমাজে বাস করিয়া ইহা ভিন্ন তাহার উপায় নাই। তাই পল্লীসমাজের আদেশ তাহাকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। তাহা না হইলে দুই দিন পরে তাহার বাড়ীতে মহামায়ার পূজায় কেহ আসিবে না, ছোট ভাই যতীনের উপনয়নে কেহ অন্ন গ্রহণ করিবে না। পল্লীসমাজে ইহা যে কত বড় ভীতির কারণ, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা বুঝিবে না। তবুও ইহাও সে হয়ত উপেক্ষা করিতে পারিত, যদি না তাহার নিজের হৃদয়ের দুর্বলতা তাহার নিজের নিকট ধরা পড়িত। হৃদয়ের এই দুর্বলতাই রমাকে রমেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিয়াছে। পাছে এই দুর্বলতা ধরা পড়িয়া যায়, ইহা ছিল রমার ভয়। এই জন্যই রমেশকে জেলে দিয়াছিল সে মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে, লাঠিয়াল আকবরকে পাঠাইয়াছিল বাঁধ কাটিতে, মাসীও ছোটখাট কাজে তাহাকে সাহায্যই করিতেছিল। সুতরাং বহির্দৃষ্টিতে পল্লীসমাজের সঙ্গে তাহার কোন দ্বন্দ্বই সে ধরা পড়িতে দেয় নাই। কিন্তু পল্লীসমাজের একান্ত অনুগত হইয়াও রমা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, পল্লীসমাজের ছায়াতলে মাথা গুঁজিবার জন্য তাহার একটু আশ্রয়ও শেষ পর্যন্ত জুটিল না, ইহাই আমরা দেখি।

সমাজের খেয়ালের আর এক খেলা দেখি আমরা পার্বতীর জীবনেও। কিন্তু রমা ও পার্বতীর হৃদয় এক বস্তু দিয়া গড়া নয়। রমার ন্যায় পার্বতীর জীবনের ও সমস্ত কামনা, বাসনা, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষায় বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল সমাজ। তালসোনাপুরের জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের পুত্র দেবদাস ও নীলকণ্ঠ চক্রবর্তীর কন্যা পারুর হৃদয়ের সঙ্গে সমাজকে হয়ত তীব্রদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই। সমাজ শুধু নারায়ণ মুখুয্যেকে কুল হাসাইতে নিষেধ করিয়াছিল এবং পার্বতী যে 'বেচাকেনা চক্রবর্ত্তী ঘরের মেয়ে' মুখুয্যে গৃহিনীকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। তবুও পার্বতীর হৃদয়ে এই আঘাত কম তীব্র হইয়া বাজে নাই। রমা অপেক্ষা পার্বতী অধিক শক্তিশালিনী। সেইজন্যই বাহিরে ১৩ বছরেই সে হাতী'পোঁতা গ্রামের জমিদার গৃহিনী, মহেন্দ্রের সে মা এবং স্বামীপুত্রসহ যশোদা তাহার কন্যা। নীরব নিস্তরঙ্গ সাগরবক্ষে কোথাও কোন বিক্ষোভ নাই, কোথাও কোন চাঞ্চল্য

নাই। কিন্তু হৃদয়ের অপরিসীম ব্যথা নিঙরানো অশ্রুবিন্দু জমিদার গৃহের কোষাকুষির জল যে বৃদ্ধি করে, তাহার কোন সাক্ষী নাই সত্য ; তবুও ইহার সত্যতা জীবনের অন্য সমস্ত সত্যকে যে ছাপাইয়া উঠে, তাহাও উপেক্ষা করিবার বস্তু নয়। পার্বতীর অন্তরের এই গোপন অশ্রুর ফল্গুধারার মূলেও এই সমাজ।

শরৎ-সাহিত্যের রাজলক্ষ্মীকে আমরা সমাজে দেখিয়াছি কালদাসী রূপে কিন্তু পার্বতীকে আমরা 'পার্বতী'রূপেই দেখি। পার্বতীর বাবা অমরবাবু ছিলেন সাবজজ। ভাগলপুরে তাঁহার বাড়ীতে ছিল শরৎচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদের সাহিত্যের আসর। পার্বতীর বয়স তখন চৌদ্দ কি পনের। দেখিতে মোটা-মুটি সুশ্রী। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পার্বতীর বেশী আকর্ষণ ছিল শরৎচন্দ্রের গান ও তাঁহার ছোট গল্প। এই পার্বতীই ছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দরদী পাঠক। পার্বতী নিজেও চমৎকার কবিতা লিখিতে পারিত। শরৎচন্দ্র তখন বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছেন।

অমরবাবু পার্বতীর বিবাহ ঠিক করিলেন। অশ্রুমুখী পার্বতী সমস্ত লাজ-লজ্জা ত্যাগ করিয়া এক রাত্রিতে চলিয়া আসিলেন শরৎচন্দ্রের নিকট। কিন্তু বড়লোকের মেয়েকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য যে শরৎচন্দ্রের তখন নাই ইহা তিনি বুঝিলেন এবং সেই কথাই পার্বতীকে জানাইয়া দিলেন। নীরবে চোখের পাতা মুছিয়া নিঃশব্দে পার্বতী বাহির হইয়া আসিল। ইহার পর অমরবাবু চুঁচুড়ায় বদলী হইয়া গেলেন। সেখানে পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। পার্বতীর বিবাহ সংবাদে শরৎচন্দ্রের মধ্যে এক গভীর হতাশা আসিল, তিনি মদ ধরিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অমরবাবু আবার ভাগলপুরে বদলী হইয়া আসিলেন। পার্বতীও সঙ্গে আসিল। শরৎচন্দ্রের গৃহে আসিয়া দেখিল, মুখে তাঁহার লাবণ্য নাই, শরীরটাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পার্বতী গৃহের মধ্যে একটা ভাঙা বাক্সে স্তূপীকৃত মদের বোতল আবিষ্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিল—একি করচো শরৎদা ? শরৎচন্দ্র ম্লান হাসিয়া উত্তর দিলেন—এছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিলনা পারু ! আমার যে আর কোন সম্বল নেই পারু ! পার্বতী সমস্ত বোঝে, সে কান্নায় ফাটিয়া পড়ে, জিজ্ঞাসা করে—বল শরৎদা, আমার অপরাধ কোথায় ? কিন্তু শরৎচন্দ্রের তো উত্তর দিবার কিছু নাই।

পার্বতী তাহার শরৎদার এই দুঃসহ জীবনযাত্রা সহ্য করিতে পারে না। লোকলজ্জা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ভুলিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে খিড়কির পথে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে। নিজ হাতে বোতল সাজায়, ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করে সে। শরৎদার জন্য নিজে খাবার তৈরী করিয়া দেয়, না খাইলে সাজাইয়া রাখিয়া যায়।

ইহার কয়েক মাস পরেই সংবাদ আসিল পার্বতীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পার্বতী সিন্দুর মুছিয়া থান কাপড় পরে। যথারীতি স্বামীর শ্রাদ্ধ করে সে। শরৎচন্দ্র এই সময়ে বোতলের পর বোতল শেষ করিতেছেন, আর লিখিতেছেন—দেবদাস, চন্দ্রনাথ অনুপমার প্রেম প্রভৃতি।

পার্বতীর নিকট শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করলেন -বিধবা বিবাহ হইবে। কিন্তু পার্বতী অসম্মতি জানাইল—উচ্ছিষ্ট ফুলে দেবতার পূজা চলে না। কিন্তু যথারীতি আসা যাওয়ার বিরাম নাই, প্রতিদিনের কর্তব্যে তাহার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই। ইহার পর বহুবার শরৎচন্দ্র পার্বতী জীবনের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, বহুবার একই প্রস্তাব করিয়া একই উত্তর পাইয়াছেন। তারপরে অভিমানে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। পার্বতী শরৎচন্দ্রের সম্মুখে চোখের জল ফেলিয়াছে কিন্তু কখনও সম্মতি দেয় নাই। বরাবরই সেবার মধ্য দিয়া আপনার হৃদয়কে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। দেবদাস উপন্যাসে পার্বতী একবার দেবদাসকে বলিয়াছিল, "আমি যে আর পারি না দেবদা! আমার যে বড় কষ্ট! জীবনে তোমায় সেবা করার সুযোগ পেলুম না।" মদ্যপানে ক্লিষ্ট ক্লান্ত দেবদাস উত্তর দিয়াছেন—"তারও সময় আছে।" কিন্তু প্রকৃত পার্বতী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুকাল তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন কিনা জানা যায় না। কিছুদিন পরে অমরবাবু পরলোক গমন করিলে পার্বতী কাশী চলিয়া যায়। শরৎচন্দ্রের অন্তরে দেখা দিল এক প্রবল দ্বন্দ্ব। পার্বতী তাহাকে যে ভালবাসিত সে প্রমাণের অভাব নাই, কিন্তু সে ধরা দিল না কেন? মনে হইল অর্থহীন সামাজিক আচার-ব্যবহারের প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কারণ। শরৎচন্দ্র মনে মনে বিদ্রোহী হইলেন, এই সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের মনে হইল মিথ্যা এই আচার-ব্যবহার—মানুষের মনুষ্যত্বকে যে প্রাণে মারে, তাহাকে বাঁচিবার সন্ধান দেয় না। হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তবুও মিথ্যা লোকাচার আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে। মানুষ কি এতই নিরুপায়? শরৎচন্দ্রের এই সময়কার এই প্রশ্নই শরৎ-সাহিত্যের প্রশ্ন। মানুষের জন্যই সমাজ, না সমাজের জন্য মানুষ? মানুষের কল্যাণের

জন্য যে সমাজের সৃষ্টি, সেই সমাজই টি'কিয়া থাকিবে তাহার অর্থহীন লোকাচার লইয়া, আর মানুষের হৃদয় যাইবে ডুবিয়া; তাহার অন্তরের সত্য কোথাও আশ্রয় পাইবে না, ইহার কি কোন প্রতিকারই নাই?

আমরা দেখি, উপন্যাসের পারুর পিতা নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী মধ্যবিত্ত গৃহী, আর তাহার 'দেবদা' জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের পুত্র। দুইটি বাল্যহৃদয় পরস্পরের একান্ত সান্নিধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল, একই পথ বাহিয়া চলিতেছিল। সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন ধারণাই ছিল না। পার্বতীর বয়স আট এবং দেবদাস বার বছরের। কিন্তু ইহারই মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে অধিকার করিয়া লইয়াছে! শৈশব-হৃদয় সমাজকে চিনিত না, কোন দেনা-পাওনার হিসাবও রাখিত না। পারু জানিত দেবদা তাহারই এবং দেবদাও জানিত পারু তাহার। দেবদা জানিত, শিশুসুলভ অপরাধ করিয়া তাড়নার ভয়ে চিরদিনই সে আম বাগানে ঢুকিয়া পড়িবে এবং পারু সেখানে চিরদিনই তাহাকে মুড়ি যোগাইবে। অনাবিল মিলনের এই নিবিড় আনন্দ বিচ্ছেদের ছায়া পাতে কোনদিনই যে মলিন হইতে পারে এ সম্ভাবনার কথা মুহূর্তের জন্যও কাহারও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজ আসিয়া এই শৈশব-সংসারের মাঝখানে দাঁড়ায়, মিলনে তখন ইহাদের ছেদ পড়ে, কিশোর-কিশোরী সচেতন হয়, ইহাদের জীবনের সুর কখনও খাদে, কখনও বা চড়া বাজিতে থাকে, সমাজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে কখনও বা লিপ্ত হইতে হয়। ফলে কখনও বা ইহারা তানমান-লয় সকলই হারাইয়া ফেলে। শরৎ-সাহিত্য এই সকল নরনারীর জীবনের হারানো তালমান-লয়েরই কাহিনী মাত্র।

সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের দ্বন্দ্বের আর এক অভিব্যক্তি দেখি আমরা সাবিত্রীর জীবনে। সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিয়াছিল এবং সতীশও সাবিত্রীকে একান্তভাবেই চাহিয়াছিল। কিন্তু সমাজ-বিধান তাহাদের এই মিলনকে অনুমোদন করে না। সামাজিক নিয়মে এ মিলন যে অবৈধ সাবিত্রী তাহা ভালভাবেই জানিত। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া সতীশ তাহাকে বিবাহ করিতে পারে; এবং এ শক্তিও তাহার আছে তাহাও সাবিত্রীর অবিদিত ছিল না। সাবিত্রী জানিত, তাহার সামান্য একটু ইঙ্গিত পাইলেই সতীশের হৃদয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা সমাজের সমস্ত শক্তিকে উপহাস করিবে। কিন্তু সাবিত্রী এই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিল, সমাজ সতীশের এই ঔদ্ধত্যকে ক্ষমা করিবে না, জীবনে তাহাকে শান্তি দিবে না; প্রতিষ্ঠা দিবে না। সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিয়াই

ইয়া এবং রোহিণীদাকে ভালবাসিয়া অভয়া এক নূতন জগতের সন্ধান
িয়াছিল, সেখানে না ছিল হীনতা, না ছিল নীচতা, না ছিল লাঞ্ছনা অত্যাচার।
তীত্ব তাহার ছিল না, কিন্তু মনুষ্যত্ব ছিল, ছিল জগতের প্রতি, সমাজের প্রতি
ল্যাণবোধ। সমাজবিধি লঙ্ঘন করিয়াও ইহাই জীবনে কাম্য কিনা শরৎ-
হিত্যে ইহাই প্রশ্ন এবং সর্বত্রই প্রত্যক্ষ ভাবে না হউক পরোক্ষ ভাবে শরৎচন্দ্র
জের বিরুদ্ধেই রায় দিয়াছেন।

শরৎ-সাহিত্যে একটি মাত্র রমণীকে দেখি, সমাজের বিরুদ্ধে সে কেবল
দ্রোহ করে নাই, সমাজকে সে শুধু উপেক্ষা করে নাই, সমাজকে সে উপহাসও
রিয়াছিল। তাহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বিদ্যার তীব্র তাপ
মরা যেন সহ্য করিতে পারি না। মনে হয়, তাহার সমাজ নাই, সংসার নাই,
রুই নিজের সৃষ্টি, জীবনে অতীত তাহার কোনদিন ছিল তাহার বিদ্রোহী
ের কোণে এ ধারণা স্থান পায় না, বর্তমানের গতির সঙ্গেও তাহার আপন
তর মিল সে খোঁজে না; ভবিষ্যতের জন্যও তাহার যেন কোন চিন্তা নাই,
ান উদ্বেগ নাই। লক্ষ্যহারা পথভ্রষ্ট উল্কার মতই সৃষ্টির এক প্রান্ত হইতে
ার এক প্রান্ত পর্যন্ত আপন চলার পথ যেন আপনিই সৃষ্টি করিয়াছিল।

শরৎ-সাহিত্যের অন্য কোন নারীর সঙ্গে কিরণময়ীর মিল নাই। শরৎচন্দ্রের
কল নারীই এক অপূর্ব স্নেহভরা হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছে, হৃদয়ই এখানে নারীর
ক্তির কেন্দ্র, কিন্তু কিরণময়ীর মধ্যে শরৎ-সাহিত্যের অপরাপর নারীর এই হৃদয়ের
ন্ধান মিলেনা বলিলেই চলে। কিরণময়ীর হৃদয় তাহাকে পরিচালনও করে না;
ধ্বংসের পথে হউক, সৃষ্টির পথে হউক তাহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিই তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত
করে। প্রথম থেকেই আমরা দেখি, তাহার সমস্ত কার্য আত্মকেন্দ্রীভূত, তাহার
চিন্তাধারায়ও আপনার সুখ-দুঃখ ছাড়া কিছুই স্থান পায় না, অপরের প্রতি
কোন বিবেচনাই তাহার চলার পথের গতি কিছুমাত্র ব্যাহত করিতে পারে না।
সমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজ-ব্যবস্থার কোন ধার সে ধারে না; সমাজ
শাসনের প্রতি তাহার তীব্র ভ্রূকুটিই আমরা দেখি। হারাণের মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চিত
মৃত্যু যখন প্রায় স্বামীর দ্বারে, সে অনঙ্গ ডাক্তারকে তখন প্রেম নিবেদন করিতে
গিয়াছিল, সমাজের কি অভিপ্রায় সে জানিতেও চাহে নাই। আমরা জানি,
দীর্ঘদিনের দুঃসহ তৃষ্ণা তাহার বুকে, সমাজের নির্দেশ মানিয়া লইয়া স্বচ্ছ জলে
তাহা নিবারণ করিবার উপায় তাহার নাই, তাই নর্দমার ঘোলা জলেই সে তৃষ্ণা
মিটাইতে গিয়াছিল। বিচার-বিবেচনা করিবার সময় তাহার ছিল না। এজন্য

এই জীবনে চিরলাঞ্ছিতা এই নারীর প্রতি আমরা একটু সহানুভূতিশীল যে না হই তাহা নয়। সমাজের বুকে এই সহানুভূতি কোথায়? সমাজ কঠোর, সামাজিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘনে নির্মম দণ্ডই তাহার বিচার।

হারাণের মৃত্যুর পরে সমাজ অন্য দশজন বিধবার পাশেই তাহার আসন পাতিয়া দিত, কাঁচকলা এবং হবিষ্যান্নই হইত বিধান। তার পরে আপন ভাগ্যবিধাতার লেখা ললাট-লিপি লইয়াই তাহাকে বিধবা জীবনের দীর্ঘদিন গণিতে হইত। এই ভাবেই হয়ত একদিন তাহাকে সংসার হইতে বিদায় লইতে হইত। কিন্তু ভাগ্যের পায়ে এই আত্মবলি কিরণময়ী মানিয়া লইতে পারে নাই, সমাজ-নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থাই সে মানিতে পারিল না। আমরা দেখি, কিরণময়ী আপনার ভাগ্য আপনিই সৃষ্টি করিল, নিজের ললাট-লিপি সে নিজ হাতেই লিখিয়া লইল। পরিশেষে সুদূর সাগরের ওপারে গিয়া বিদ্রোহী নারী-জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। সমাজের যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি হইতে দিল না। শেষ পর্যন্ত সমাজই জয়ী হইল, কিরণময়ী আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিদ্রোহী নারীর সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে, তাহার অকুণ্ঠিত তেজ আমাদিগকে স্তম্ভিত করে। এই অমিত তেজ এবং অমিত বুদ্ধি যে উপেক্ষার বস্তু নয়, তাহা আমরা বুঝি।

কিরণময়ীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহজ সরল তীব্র আত্মানুভূতি রমণী চরিত্রে বিরল। অন্য নারী যেখানে সমাজের অবিচারকে মানিয়া চলিত, নিজে অশ্রুজলে ডুবিয়া সকল বিরোধের অবসান করিত, কিরণময়ী সে-পথ ধরিয়া যায় নাই। আমরা দেখি, এই নারী শুধু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই, শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন করে নাই, প্রচলিত ধর্ম ও সমাজকে সে ব্যঙ্গও করিয়াছিল এবং এই পথে অগ্রসর হইয়া তাহার পথের সীমারেখা কোথায় তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। অন্য দশজনের দৃষ্টিতে তাহার মনুষ্যত্বকেও পদদলিত করিয়াছিল। কিন্তু আপন শক্তির দম্ভে, অহঙ্কারের মত্ততায় যে খেলায় সে মাতিয়াছিল, নারীর পক্ষে সে মারাত্মক খেলা। তাই সামাজিক নিষেধ লঙ্ঘন করিয়াই সে নিবৃত্ত হইতে পারিল না। সমাজের সহিত এই সংগ্রামের ভয়ঙ্করতা একদিন সে বুঝিতে পারিল এবং সেদিন তাহাকে ফিরিতেই হইল। তাই শরৎ-সাহিত্যে কিরণময়ীর ইতিহাস ব্যর্থতারই ইতিহাস; তীব্র যাতনার ইতিহাস, তিল তিল করিয়া মরণের ইতিহাস। অথবা শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই কিরণময়ীকে এই পরাজয়ের খাদে ঠেলিয়া দিয়াছেন। কারণ, শরৎ-সাহিত্য

সর্বত্রই সমাজের উমেদার; সমাজের সহিত সংগ্রামে ব্যক্তি এখানে জয়ের আশা করিতে পারেনা। সমাজের প্রতি বিদ্রোহিতাকে শরৎচন্দ্র কখনও ক্ষমা করেন নাই। সমাজের সহিত নারী-হৃদয়ের দ্বন্দ্বে নারীকে কোথাও তিনি জয়ী হইতে দেন নাই। সমগ্র শরৎ-সাহিত্য এদিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, শিল্পী হিসাবেই শরৎচন্দ্র সমাজের সঙ্গে নারী-হৃদয়ের এই দ্বন্দ্ব তাঁহার সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিজে বিদ্রোহী ছিলেন না, তাই এখানে নারীর বিদ্রোহ তিনি সমর্থনও করেন নাই। শরৎ-সাহিত্যে সহনশীলতাই নারীর ধর্ম। চিরকালের সীতা সাবিত্রী সে, তাই সমাজের শত প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াও তাহাকে নীরব থাকিতে হইবে—ইহাই তাহার প্রতিবিধান। এই সহনশীলতার পরীক্ষায় যাহার কৃতিত্ব যত বেশী, সমাজে তাহার স্থান তত উচ্চে। কিরণময়ী ইহা জানিত না তাহা নয়, তবুও সে সমাজ-নির্দিষ্ট এই চিরাচরিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই, অথবা অগ্রসর হইতে পারে নাই। বহু বৎসর যে দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা তাহার বুকে জমাট বাঁধিয়া ছিল, তাহাই তাহাকে পথ দেখাইয়া অন্যত্র লইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই সমাজের দেওয়া অপমান অত্যাচারকে মাথা পাতিয়া সে আশীর্বাদরূপে লইতে পারে নাই। আমরা জানি, তাহার বুকের মধ্যে এক অশান্ত আগুন জ্বলিতেছিল এবং এই আগুনে যে পথ তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথ, সমাজের বিধি-বিধানকে উপেক্ষার পথ। কিন্তু কিরণময়ী সেদিন বুঝিতে পারে নাই, এপথ ধরিয়া প্রবেশ করা যায় কিন্তু বাহির হওয়া যায় না। শরৎ-সাহিত্যে সে দ্বার রুদ্ধ। তাই কিরণময়ীকে ফিরিতেই হইল, সমাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল। এক হীন পরাজয়ই কিরণময়ীর উদ্ধত বিদ্রোহের পরিণতির ইতিহাস। কিরণময়ী নিজেই একদিন উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভালবাসা অন্ধ একথা সত্য কিনা"। উপেন্দ্র উত্তর করিয়াছিল, "সত্য বই কি। অনেকের অভিজ্ঞতাই ত প্রবাদ বচন।" শুনিয়া কিরণময়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তা যদি হয়, কাণা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়। তার জন্য দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালর চেষ্টা করে। কিন্তু ভালবাসার অন্ধ হয়ে সে যখন গর্তে পড়ে, কেউ ত তাকে তুলে ধরতে আসে না? বরং আরও তার হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে সেই গর্তে মাটি চাপা দিতে চায়। যে সত্য মানুষ প্রচার করে, প্রয়োজনের সময়ে সে সত্যের কোন মর্য্যাদাই রাখে না।" আমরা জানি, সমাজের নিকট শরৎ-সাহিত্যের এ অভিযোগ। সমাজের

বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিয়া হৃদয়ের নির্বিরোধ গতি শরৎ-সাহিত্য সমর্থন করে না। বরং ইহাকে পতন বলিয়াই স্বীকার করে। কিন্তু এই পতনের পরে সমাজকে তাহারা আরও দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহার বাঁচিবার পথ, রক্ষার পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিবে, ইহারই বিরুদ্ধে শরৎ-সাহিত্যের অভিযোগ। সমাজের এই অনুদারতা শরৎ-সাহিত্য সমর্থন করে না। সমাজের পক্ষে, ব্যক্তির পক্ষে ইহা যে অকল্যাণকর শরৎ-সাহিত্য সেই দিকেই ইঙ্গিত করে।

দিবাকরকে কিরণময়ী একদিন বলিয়াছিল, নিজের উপর নিজের একটা অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারও অপেক্ষা তুচ্ছ নয়। সে অধিকারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করা—নিজের উপর অন্যায় করা।" আমরা জানি, এই যুক্তির বলেই কিরণময়ী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল। সমাজ তাহার নিজস্ব অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবে, ইহা কিরণময়ী চাহে নাই। ইহাকে সে সমাজের অনধিকারই মনে করিয়াছে। কিরণময়ী বুঝিয়াছিল, মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয়। যতক্ষণ সমাজ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, ততক্ষণই তাহার প্রয়োজনীয়তা, ইহার বেশী নয়। মানুষের ভাল-মন্দ, মানুষের হৃদয়ের কামনা-প্রার্থনাকে সার্থক করিয়া তোলাতেই সমাজের সার্থকতা, ইহাই ছিল কিরণময়ীর যুক্তি। এই জন্যই কিরণময়ী কহিয়াছিল, "সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমানাকে লঙ্ঘন করে, তখন তাহাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চেতনা হয়, মোহ ছুটে যায়।"

কিরণময়ী সমাজকে এই আঘাত করিতেই গিয়াছিল, সমাজের মৃত্যু ঘটানো তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তখনও বুঝিতে পারে নাই, সমাজের প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে তাহার নিজের শক্তি কত ক্ষুদ্র, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কত অসহায়।

শরৎ-সাহিত্যে আর একজন নারী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে রেঙ্গুনের নিভৃত পল্লী-রমণী। তাহার সঙ্গে পরিচয় আমাদের বেশীক্ষণের জন্য নয়। শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া সুদীর্ঘ জীবন-ইতিহাসের সে একটা পাতার বেশি অধিকার করে নাই। কিন্তু তবুও করুণতায়, নৃশংসতায়, নির্মমতায় সে-চিত্র অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী বা বড়দিদির চিত্রের মতই অশ্রুসজল! এই পল্লী-রমণীর নাম শরৎচন্দ্র আমাদের জানান নাই। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু তবুও আমরা দেখি, এই সরলপ্রাণা

একান্ত নির্ভরশীলা রমণীর উপর সমস্ত অত্যাচারের মূলেই বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ। এই বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজই পশ্চাতে থাকিয়া নারী-হৃদয় লক্ষ্য করিয়া অত্যাচার ও অবিচারের সুতীক্ষ্ণ শরগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। এই করুণ ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালীবাবুটির নামও শরৎচন্দ্র আমাদিগকে বলেন নাই কিন্তু আমরা জানি, এই হৃদয়হীন, নিষ্ঠুরতম অত্যাচার অনুষ্ঠানের পরেও সমাজের কোলে তাহার স্থানাভাব হইবে না। বরং সমাজই এই মনুষ্যত্বহীনতার পথ অনুসরণের নির্দেশ তাহাকে দেয়। বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক ব্রহ্মরমণীর দুইফোঁটা চোখের জল সমাজকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। আমরা দেখি, বাঙ্গালী বাবু এই ব্রহ্মরমণীর আশ্রয়ে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া স্বামীর অধিকার লইয়াই বাস করিতেছিল। এই সরলা রমণী আপন সংসারের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত ঐশ্বর্য অকপটে কায়মনে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজ দূরে থাকিয়াও সেদিন এই বাঙ্গালীবাবুকে আকর্ষণ করিল, তাহার সুদীর্ঘ দিনের সমস্ত বন্ধন, সরলা নারী-হৃদযের সমস্ত দান স্বেচ্ছায় অস্বীকার করিতে বলিল। বাঙ্গালীবাবু সমাজকেই মানিয়া লইল কিন্তু ফিরিবার সময়ে কোমলপ্রাণা নারী-হৃদয়ের জন্য কেবল অপরিসীম দুঃখই সে রাখিয়া গেলনা, অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকে বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়াই ফেলিয়া গেল। আমরা জানি, জয়ের আনন্দে বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ সেদিন গর্বিত হইয়াছিল, সে আনন্দের নিকট সুদূর এক রমণীর দুই ফোঁটা চোখের জল কোথায় ভাসিয়া গেল, কে তাহার সন্ধান রাখে?

শরৎ-সাহিত্যে আমরা সর্বত্রই দেখি, নারীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে সমাজের জয়। জয়মাল্য শরৎচন্দ্র সর্বক্ষেত্রেই সমাজের কণ্ঠেই পরাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞানদার অরক্ষণীয়া জীবনের অসহ্য বেদনায়, সাবিত্রীস্বরূপা অন্নদা দিদির ব্যথিত জীবনের দুঃসহ ব্যর্থতায়, কোথাও ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। পিয়ারী বাঈজীই হউক বা রাজলক্ষ্মীই হউক, দেবদাসের পারুই হউক বা হাতীপোঁতা গ্রামের জমিদার গৃহের বড়গিন্নীই হউক, সমাজের চোখ রাঙানিকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সরযূকে আমরা কাশীতে কৈলাস খুড়োর গৃহেই দেখি বা পল্লীর জমিদার চন্দ্রনাথ বা মনিশঙ্করের গৃহেই দেখি, সমাজের কঠোর সীমাবদ্ধ এক অব্যক্ত অসহায় ভীতি তাহার মুখে সর্বদাই ফুটিয়া উঠে। এমন কি, নির্বিরোধ পল্লীরমণী কুসুম, তাহার পক্ষেও সমাজের অবাধ্য হইবার জো নাই। শরৎ-সাহিত্যে ইহার বিরুদ্ধে অভিযান অবশ্য সত্য। রমা এবং রমেশের

জীবন অবলম্বন করিয়া সে অভিযোগ খুব দৃঢ় ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যের অন্যত্রও এই অভিযোগ দুর্লভ নয় কিন্তু তবুও শরৎ-সাহিত্যের অন্তরের সুর সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর নয়। নরনারীর জীবনে দুঃসহ ব্যথার মধ্য দিয়াও শরৎ-সাহিত্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষনা করে, সমাজ মঙ্গলের আধার।

আমরা দেখি, অভয়া ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজের অন্যায় অত্যাচারকে সে মানিয়া লইয়াছে। কিরণময়ী বিদ্রোহ করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে পরাজয়ই বরণ করিতে হইয়াছে। শরৎ-সাহিত্যে সর্বত্রই সমাজের এক সুনিয়ন্ত্রিত জয়যাত্রা আমরা দেখি। একমাত্র কমলই ইহার বিরুদ্ধে তাহার শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, একমাত্র কমলই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া শেষ পর্যন্ত তাহা নামায় নাই। তবে শরৎচন্দ্র কমলকে বাঙ্গালী সমাজের অঙ্গ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সাধারণ সমাজ হইতে বহু দূরে আগ্রায় বাঙ্গালীদের প্রাণহীন প্রবাসী সমাজেই কমলের বিদ্রোহ সম্ভব। পল্লী বাংলার এমনকি কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে এ বিদ্রোহ ঘটিলে, তাহার পরিণতি কি হইত কে জানে? আগ্রায় এই প্রবাসী দলটি সমাজ গঠন করিয়া চলিত আমরা দেখি। কিন্তু সমাজের মূল কোথাও নাই। এইজন্যই আগ্রার যমুনায় কমলবন সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্র সেখানে কমল ফুটাইয়া ছিলেন কিন্তু সে কমলে মৃণাল ছিল না, তাই তাহার গ্রন্থি যোজনা কোথাও শরৎচন্দ্র করিতে পারেন নাই। কমল যেন বানভাসি হইয়াই আগ্রার জলে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছিল। এজন্য চিরজীবন সে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। আগ্রার সমাজে বা অন্য কোথাও কোন সমাজেই যেন তাহার প্রকৃত আশ্রয় নাই। আশুবাবু, হরেন্দ্র, অক্ষয়, নীলিমা, মনোরমা, বেলা—ইহারা আগ্রার বাঙ্গালী সমাজের অঙ্গ, কিন্তু কমল সে-সমাজের অঙ্গ নয়। প্রবাসী সমাজে অক্ষয়ের ব্যবহার কেহই পছন্দ করেনা তবুও সে এ-সমাজে অচল নয়। কিন্তু কমলের আচরণ সকলের মনোজ্ঞ হইলেও এ-সমাজে তাহা অসহ্য—ইহাই আমরা দেখি। ইহার কারণ, কমলের বিদ্রোহী অন্তরকেই তাহারা যেন সহ্য করিতে পারিতেছিল না। দীর্ঘকাল প্রচলনে যে সকল সামাজিক রীতিনীতি এই প্রবাসী সমাজে অলঙ্ঘ্য মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছিল, কমলই তাহারই বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিল। এই জন্যই আগ্রার বাঙ্গালী সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিলেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কালের বিরুদ্ধে বাণী সকলকে অভিভূত করিয়াছে, তাহাদের ব্যথা দিয়াছে, মর্যাদাও পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের হৃদয় পায় নাই।

সমাজের কোন আইনকেও কমল চিরন্তন বলিয়া শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে নাই। অতীতে যে বস্তু সত্য ছিল, মঙ্গলের জন্যই সেদিন উহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আজ দীর্ঘদিন পরেও তাহার মঙ্গলাদর্শ তেমনি অক্ষয়, তেমনি অটুট হইয়া আছে, কমল ইহা বিশ্বাস করেনা। এই জন্যই আশুবাবুর একনিষ্ঠ প্রেমকে সে অবহেলা করে, নীলিমার নিঃস্বার্থ গৃহিণীপনাকে সে উপেক্ষা করে, হরেন্দ্রর আশ্রমকে সে বিদ্রুপ করে। অপরে যেখানে আত্ম-সংযমের অপূর্ব আদর্শ দেখিয়া মাথা নত করে, কমল সেখানে নিষ্ফল আত্মনিগ্রহই দেখিতে পায়। ইহা সমাজকে ব্যঙ্গ করা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। আগ্রার সমাজে আর কেহই কমলের সঙ্গে একমত হইতে পারে না তবুও ইহাকে অস্বীকার করিবার সাধ্য তাহাদের নাই। বৃদ্ধ আশুবাবুর মুখে আমরা শুনি—"তর্কে যাই বলিনা কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি।"

আমরা দেখি, যাহা কিছু চিরন্তন সত্য বলিয়া মর্যাদা পাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করাই যেন কমলের ব্রত। যাহা কিছু অতীত, নাড়া দিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলাই যেন তাহার passion. মেয়েদের আত্মোৎসর্গ তাহার নিকট অর্থহীন। এ সম্পর্কে কমলের কথা, "পুরুষের বাহবার কড়া মদ খাইয়াই নারী এই পথে আপনাকে ভুলাইয়া রাখে। এ প্রবৃত্তি তাহার পূর্ণতা হইতে আসে না, আসে শূন্যতা হইতে। ইহা তাহাদের স্বভাব নয়, অভাব।" আশু-বাবুকে কমল একদিন ইহাই কহিয়াছিল, "সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল হতে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি করে, ভাবে এই বুঝি সত্যি। আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর জীবনে এই প্রশ্ন আমরা দেখি কিন্তু বিষাদান্ত পরিণতি অপেক্ষা এখানে মিলনান্ত পরিণতিই বেশী। আমরা দেখি বিজয়ার জীবন নরেনের জীবনের সঙ্গে মিলিয়া ছিল, জ্ঞানদাও শেষ পর্যন্ত অতুলের আশ্রয় পাইয়াছিল, জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা কাটাইয়া কুসুমও শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনের গৃহে উঠিয়াছিল। কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করিয়া, সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করিয়া কাহারও ভাগ্যেই এই মিলন হয় নাই। সমাজের দুঃসহ নিপীড়নের মধ্য দিয়াই সকলকে নিজ নিজ ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছিতে হইয়াছে। একমাত্র কমলই শেষ পর্যন্ত শেষ প্রশ্ন তুলিয়াছিল। সমাজকে অতিক্রম করিয়া মানবের আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা করিয়াছিল। কমল বর্তমান সমাজের ধ্বংসের উপর ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন

করিতে চাহিয়াছিল, ইহারই মধ্যে সে দেখিয়াছিল মানবজাতির কল্যাণ। যখন বর্তমান সমাজের কল্যাণময় পরিণতির বিরুদ্ধে সে সংশ্রয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে শরৎচন্দ্র একমত, তাহার শেষ প্রশ্নের শেষ সমাধানে শরৎচন্দ্রের সম্মতি আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়না।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে শরৎচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন, "আমরা মনে মনে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে যে আদর্শ পোষণ করি, বর্তমান সমাজের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় থাকলে বুঝতে পারবো তা কতটা ভুয়ো।" কথাগুলি শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী মনের পরিচয় সন্দেহ নাই। সতীত্বের পুরাতন আদর্শ তিনি আঁকড়াইয়া থাকা সমর্থন করেন নাই, তাই বলিয়া নূতনের দোহাই দিয়া যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাঙ্গিতে হইবে, ইহাও তিনি চাহেন নাই। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী-জীবনের অব্যক্ত বেদনা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহার শিল্পী চিন্তাকে আহত করিয়াছে, সমাজের অনুদারতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের রীতনীতিকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ সমাজদেহকে আঘাত করুক, ইহা তিনি চাহেন নাই। সাবিত্রী সতীশের পরস্পর ভালবাসায় শরৎচন্দ্রের আপত্তি ছিল না কিন্তু এই ভালবাসা দৈহিক মিলনে পরিণতি লাভ করুক, ইহা তিনি চাহেন নাই। এই দিক হইতে একটি জিনিস বরং শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সাবিত্রী মহৎ, সাবিত্রী উদার, তাই প্রিয়জনের মঙ্গলের জন্য সমাজে সতীশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতীশকে সে সরোজিনীর হাতে তুলিয়া দিল। সাবিত্রীর এই মহত্ত্ব আমরা বুঝি, তাহার অতুলনীয় উদারতার জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তাই বলিয়া সতীশ সাবিত্রীকে ত্যাগ করিয়া সরোজিনীকে গ্রহণ করে কেন? সরোজিনীকে গ্রহণ করিয়া সে ত কোন উদারতার পরিচয় দেয় নাই। কিন্তু আমরা জানি, ইহা ভিন্ন শরৎচন্দ্রের অন্য কোন উপায় ছিল না। সমাজের মুখরক্ষা শরৎচন্দ্রকে করিতেই হইবে, এজন্য তাঁহার একজন সরোজিনী একান্তই চাই।

শরৎ-সাহিত্যে চোখের জলে টলমল পদ্মরূপে দেখা দেয় রমা, পার্বতী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, বিজলী বাঈজী। শরৎ-সাহিত্য ইহাদের জন্য সমবেদনাশীল কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করিবার পরেও সেই সমাজে সসম্মানে তাহাদের বাস শরৎ-সাহিত্য একেবারেই সমর্থন করে না। শরৎ--সাহিত্য উৎপীড়িত লাঞ্ছিতদের সমর্থন করে তাহাদের মানবতার আসনে বসাইয়া; মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্যে সম্পদশালী করিয়া, সমাজের অনুশাসন ভাঙ্গিয়া নয়।

পথের দাবীতে ডাক্তার ভারতীকে বলিতেছেন, "পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। পুরাতনের মোহ আমাদের জন্য নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সম্মুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই তো আমাদের পথ করতে হবে। প্রত্যহ মানুষই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে তা হয় না।"

শরৎচন্দ্র এইখানে অতীতের নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান নির্বিচারে গ্রহণ হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন। মানুষের জীবনকে আরও সচল, আরও সতেজ এবং আরও গতিশীল করিতে চাহিয়াছেন।

শেষ প্রশ্নেও শরৎচন্দ্র এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কমল আশু বাবুকে বলিতেছেন, "বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা? কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তা পরিবর্তনেও লজ্জা নেই।"

ইহার অর্থ এই যে সমাজের কোন নিয়মই অপরিবর্তনীয় নয়। রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের সময়ানুযায়ী পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই সমাজ নিজেকে সচল এবং সজীব রাখে। নতুবা সমাজের জড়ত্ব প্রাপ্তি অনিবার্য। এই জড় সমাজ সামাজিক জীবনের অকল্যাণের কারণ। তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ভিন্ন অন্য কোন গত্যন্তর থাকে না।

চরিত্রহীন উপন্যাসে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "মানুষই ভুল করতে অন্যায় করতে জানে এবং সমাজই জানে না? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে—সে সীমা মূঢ়তায় হউক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হউক, অন্যায় নিজের বশে হউক—যে ভাবেই হউক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল।"

অর্থাৎ সামাজিক মানুষের কতকগুলি অধিকার আছে। যে কেহ সে অধিকার লঙ্ঘন করিবে, আইনে তাহার শাস্তি বিধান আছে, আইনের দৃষ্টিতে সে দণ্ডনীয়। আবার সে অধিকারের একটা সীমাও আছে, সেই সীমা লঙ্ঘন করিলে অধিকার অনধিকার হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাও দণ্ডনীয়। তেমনি সমাজেরও কতকগুলি অধিকার আছে এবং তাহার একটা সীমাও আছে। সমাজ তাহার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবে ইহা শরৎচন্দ্র চাহেন নাই।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্যে ইহার বিপরীত কথা যে নাই তাহা নয়। পল্লীসমাজে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা করে রেখেছে তাহাকে

জবরদস্তি করে ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হউক তাহাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না।"

সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের পক্ষ হইতে বিচার করিলে ইহার কোন অর্থ হয় না। সমাজের অবিচার, অত্যাচারকে আঘাত করিতে হইবে, শরৎ-সাহিত্য ইহা সমর্থন করে। কিন্তু সমাজ যাই হউক অর্থাৎ সমাজ যদি অন্যায়ও করে তবুও কি তাহাকে মান্য করিতে হইবে? প্রকৃত পক্ষে, ইহা শরৎ-সাহিত্যের অভিপ্রায় নয়। শরৎচন্দ্রের উপরের লেখা কথাগুলি একটু বিচার করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। "সমাজকে মান্য করিতে হইবে"—ইহার অর্থ এই নয় যে সমাজের অবিচারও মানিয়া লইতে হইবে। তবে যে সমাজের ভাল করিতে হইবে সেই সমাজ হইতে আলাদা হইয়া গিয়া তাহাকে আঘাত করিলে তাহার ভাল করা যায় না। সাময়িক ভাবে সমাজকে তাহার মানিয়া লইতেই হইবে। নতুবা আঘাত-প্রত্যাঘাতে কেবল হলাহলই উঠিবে, কল্যাণ আর আসিবে না। শরৎচন্দ্র ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

তবুও বিদ্রোহী শরৎচন্দ্রের এ বাণী নয়। তবে শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী ছিলেন না ইহাও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রধানতঃ শিল্পী। সমাজে যেখানে ব্যথাবেদনা দেখিয়াছেন, দরদী লেখনী তাঁহার সেইখানেই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়াছে। সেই ব্যথা কোথাও বিদ্রোহ আকারে, কোথাও বিক্ষোভ আকারে কোথাও বা প্রতিবাদ আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার বেশীদূর অগ্রসর হইবার সাধ্য শরৎচন্দ্রের ছিল না; তিনি সেদিকে অগ্রসরও হন নাই।

কমল ও শেষ প্রশ্ন

১৯৩০ সালের ২১শে নবেম্বর শরৎচন্দ্র চন্দননগরে এক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেন, "আমাদের বংশ পরিচয় দিয়ে কি হবে? পুরাতন জিনিসের গৌরব করে আমাদের কিছু কাজ হবে না। যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে পাথর খুঁড়ে বার কচ্ছেন আর বলছেন—এই দেখ আমাদের এই ছিল, ঐ ছিল, আমি তাদের কথায় খুসী হই না। আমার বুক তাতে ফুলে উঠে না। আমি বলি, আমাদের কিছু ছিল না। আমাদের যা দরকার আমরা তা গড়ে নেব। মানুষ এখন এগিয়ে যাচ্ছে, নিজের জোরে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিচ্ছে। দু' হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল পাথর খুঁড়ে বার করে তা শুনিয়া আমাদের কোন কাজ নেই। নিজের গৌরব কিসে হয়, তাই ভাল করে গড়ে তোল। জাতের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। নাই বা থাকল জাত—নিজের জোরে প্রতিষ্ঠা করে নাও। নাই বা থাকল কিছু বংশ পরিচয়, নিজে সার্থকজীবন হবার চেষ্টা কর। আমার 'শেষ প্রশ্নে' আমি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমাদের যা কিছু বর্ত্তমানে চলছে তার উপর কটাক্ষও আছে, আঘাতও আছে।"

সমাজে পুরাতনকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচণ্ড চেষ্টা চলিতেছিল শরৎচন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কেবলমাত্র অতীতে ফিরিয়া গেলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহাই ছিল তাঁহার মত। এক প্রাচীন মহান জাতির বংশধর আমরা—এই প্রচারে আত্মপ্রসাদ থাকিতে পারে কিন্তু এই সত্য প্রতিষ্ঠা করায় কোন জাতি মহান হইয়া উঠিতে পারে না। জাতির বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টাই জাতিকে মহান করে, শক্তিশালী করে, প্রতিষ্ঠা দেয়। এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই শরৎচন্দ্র কমল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

জাতির বর্তমান অধঃপতন শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত করিয়াছে; পীড়া দিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান তিনি করিয়াছেন। একমাত্র বর্তমানকে মহান করিয়া গড়িয়া তোলাতেই ইহার সমাধান তিনি দেখিয়াছেন। অতীতের বাহবার মধ্যে যাঁহারা বাস করিতে চান, তাঁহাদের জন্য তিনি লজ্জা অনুভব করিয়াছেন। চন্দন-
-নগর বক্তৃতায় তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন—" আমাদের সবই ছিল যদি,

সকলই জেনেছিলুম যদি, তবে আমাদের এ দশা হ'ল কেন? পৃথিবীর অন্য জাতিদের দিকে যখন তাকাই, দেখি তারা নিজেদের পরিচয় দেবার মত প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। আর আমরা যাদের সব ছিল, একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার ইংরেজের জুতোর তলায় পিষে মরছি কেন?"

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্নের ইহাই মূলগত প্রশ্ন। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের খুব বড়ো করেই বড়াই করে থাকি। কিন্তু বাইরের লোক সে কথায় বিশ্বাস করে না। ধর্মের মধ্যে মস্ত গলদ আছে। মূল সূত্রটা ত্যাগের মধ্য দিয়া যাচ্ছে। ত্যাগের ভিতর কি আছে খুঁজে পাই না। কোথায় গলদ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি এতটা 'শেষ প্রশ্নে' আলোচনা করেছি।"

শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নেরই অবতারণা করিয়াছেন কমলের মুখে এবং এই জন্যই কমলকে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে এক নূতন রূপ দিয়া নূতন পরিচয় দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কমলের পরিচয় আমরা শুনি আশুবাবুর মুখে—"জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র। আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সম্মুখের পথ রোধ করে না, ওর অনাগত তাই, যা আজও এসে পৌছয়নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্বার, আনন্দ তেমনি অপরাজেয়।" এমনি দুর্বার অপরাজেয় আনন্দময় ভারতীয় জাতি গড়িয়া উঠুক, শরৎচন্দ্র ইহাই চাহিয়া ছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিত্তে এই জন্য কমল ছিল ভবিষ্যৎ ভারতীয় জাতির প্রতীক। অতীতের মধ্যে বাস করিয়া সে আনন্দ পায় না, অতীতকে বড় করিয়া দেখিয়া সে গৌরববোধ করে না; একমাত্র বর্তমানই তাহার পরিচয় বহন করে। আজ আমরা নিজেরা যখন দুর্ভোগে ভুগাছ, দুনিয়ার সবাই যখন আজ আমাদের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন আমরাই কি কেবল পশ্চাদপসরণ করিয়া বাঁচিবার পথ সন্ধান করিব? শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র ইহাই জানিতে চাহিয়াছেন। আজ আমাদের এ দশা কেন—এই প্রশ্নই শরৎচন্দ্রের মনে এক তীব্র আলোড়ন তুলিয়াছিল। চন্দননগরের বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র ইহাই বলিয়াছিলেন—আমাদের এ দশা কেন কেউ যদি বার করতে পারেন, দেশের মহা উপকার হবে। এই যে হাজার বছরের দুরবস্থা, এ সামলাবার কোন উপায় দেখি না, কিছু আশা দেখতে পাই না।" তাই শরৎচন্দ্র ইহার সমাধানের জন্য সকলকেই আহ্বান জানাইয়াছেন। "আসুন, কোথায় গলদ আছে বার করে দিন। দেখান,

কোন্‌খানটায় গলদ ছিল, যার দোষে আমরা এই শাস্তি ভোগ করছি। আমরা খুব বড় ছিলাম অথচ result nil, শূন্য।"

শরৎচন্দ্র প্রশ্ন তুলিয়াছেন, "আমাদের সব ছিল কিনা কি তাহাতে আসে যায়?" তিনি বলিয়াছেন, আমি বলবো আমাদের কিছুই ছিল না। সমস্ত জিনিসকে ছোট করে দেখবো। মনে করছি, যতদিন বাঁচবো এইবার ধ্বংস করার কাজ নেবো।"

এই জন্যই শেষ প্রশ্ন সমাজের পুরাতন সুখী মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করার দিকেই ইঙ্গিত করে। পুরাতনের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়া একেবারে নূতন সৃষ্টিই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায়। সংস্কার বা জোড়াতালি তিনি করেন নাই। এই সংস্কার সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "আমি সংস্কারের পক্ষপাতী নই। পুরানো জিনিসকে অদল-বদল করে নেবো এ আমি চাই না। সংস্কার মানে কি তা 'পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি। সংস্কার মানে মেরামত করা। মেরামত করে কখনও ভাল হয় না।"

শরৎচন্দ্র এই উদ্দেশ্যেই কমলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাকে আগ্রা প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজেই স্থাপন করিয়াছেন। বাংলা দেশে—পল্লী বাংলা কেন, পাঁচমিশেলী সহর কলিকাতায়ও স্থাপন করিবার সাহস তিনি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। আগ্রায় প্রবাসী বাঙ্গালী দলটি একটি সমাজ গড়িয়াই চলিত; কিন্তু তাহার না ছিল কোন মূল, না ছিল কোন পারস্পরিক বন্ধন। তাহারা সকলেই সেটাকে দিনযাপনের গ্লানিমোচনের একটা অস্থায়ী সমাবেশ মনে করিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখি, প্রবাসী সমাজ কমলকে অবাধভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কথাবার্তা আলাপ আচরণ ছিল সে-সমাজে মনোজ্ঞ কিন্তু তবুও তাহারা কমলকে যেন সহ্য করিতে পারিত না। কমল সে-সমাজের অন্তরের প্রবেশ করিতে পারিত না। আশুবাবু, হরেন্দ্র, অক্ষয়, অজিত, রাজেন, নীলিমা, মনোরমা, বেলা—ইহাদের পরস্পর মিলনে এক নিবিড় হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল সত্য কিন্তু উহার অস্থায়ী কেন্দ্র ছিলেন আশুবাবু। তাই আমরা দেখি, আগ্রা হইতে আশুবাবুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজ ভাঙ্গিয়া গেল।

দীর্ঘকাল প্রচলনে যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি এবং সামাজিক আচার বিচার বাঙ্গালী সমাজে এক অলঙ্ঘ্য মর্যাদা পাইয়া আসিতেছিল, অন্যান্য প্রবাসী সমাজের মত আগ্রার এই সমাজেও উহা কতকটা শিথিল আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু তবুও ইহার বিরুদ্ধে কেহ প্রশ্ন তুলিবে বা বিদ্রোহ করিবে,

ইহা ছিল তাহাদের অসহ্য। এই জন্যই আগ্রায় বাঙ্গালীদল তাহাদের সভাসমিতি, নিমন্ত্রণ বা মজলিসে কমলকে স্থান দিয়াছে কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমরা দেখি, কমলের বিদ্রোহের বাণী তাহাদের অভিভূত করিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কোথাও কোথাও মর্যাদাও পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের হৃদয় পায় নাই।

এই বিদ্রোহী নারীকে আমরা প্রথম দেখি, অনন্ত ঐশ্বর্যময় বিশ্ববিখ্যাত তাজের সিংহদ্বারে। ইহার পূর্বেও আমরা তাহাকে আশুবাবুর গৃহে দেখিয়া-ছিলাম। কিন্তু তখনও তাহার অন্তরের দ্বিপ্রহরের সূর্যরশ্মির অসহনীয় উত্তাপ উন্মোচিত হয় নাই, তাহার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তাহার রূপের পরিচয় দিয়াছেন শরৎচন্দ্র, "যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন এক মুহূর্তেই ঝাপসা হইয়া গেছে।" কিন্তু এই রূপই কমলার একমাত্র পরিচয় নয়। সমস্ত বিস্ময়কে অতিক্রম করে তাহার অন্তরের বিদ্রোহী নারী। আমরা দেখি, যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু জীর্ণ, সমস্তই যেন সে চূর্ণ করিতে চায় নির্মম এবং কঠোর আঘাতে। অতীতে তাহার যে মর্যাদাই থাক না কেন বর্তমানের প্রয়োজনে তাহাকে সে যাচাই করিয়া লইতে চায়। কমলের বিদ্রোহী অন্তর কল্পনায় সৌন্দর্য গড়েনা, পুরাতনের ব্যর্থ আড়ম্বরে কোন বস্তুই সেখানে মহৎ হইয়া উঠে না।

নরনারীর প্রেমের ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সমাধি-সৌধকে অপূর্ব মহিমায় মমিমাণ্ডিত করিয়া আসিয়াছে, অখণ্ড গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই তাজমহলকেই আমরা জানিতাম। স্বপ্ন দিয়া, কল্পনার মাধুরী দিয়া, বিশ্বের বিরহী নরনারীর দল নানা মোহন রঙে আপন আপন অন্তরে ইহাকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল। কবির কাব্যে এবং কবির অন্তরেও তাজমহল ছিল সম্রাট শাহ্জাহানের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের মর্মরায়িত রূপ। আগ্রার সমাজও তাদের এই একটি মাত্র পরিচয়ই জানিত। বৃদ্ধ আশুবাবু তাঁহার বিগত পত্নীপ্রেমের স্মৃতির মধ্যেই বাস করিতেছিলেন। এই স্মৃতিই ছিল জীবনে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। তাই তাজমহলের মধ্যে তিনি মমতাজকে না দেখিয়া শুধু শাহ্জাহানকেই দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, তাঁহার আপন অন্তরের অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরে পাথরে মাখানো। তিনি দেখিতেছিলেন, তাজমহলের মধ্যে মমতাজ অমরতা পায় নাই। শাহ্জাহানের

পত্নীপ্রেমই যেন এই মর্মর কাব্যের ভিতর দিয়া সমগ্র বিশ্বের নিকট আপনাকে প্রচার করিতেছে। কিন্তু এই তাজমহলের নীচে দাঁড়াইয়াই আগ্রার বাঙ্গালী সমাজের সমাগত সকলের সম্মুখে তাজের এক নূতন অর্থ করিল কমল। মুহূর্ত মধ্যে সকলেরই যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কল্পনা অন্তর্হিত হইল, বাস্তব আসিয়া কাব্যের স্থান গ্রহণ করিল। চমকিত হইয়া সকলেই শুনিল—তাজমহল শাহ্‌জাহান বাদশার স্বকীয় আনন্দলোকেরই অক্ষয় দান, একনিষ্ঠ প্রেম বলিয়া ইহার কোথাও কিছু নাই। সকলেই শুনিল, এই বিরাট সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠায় মমতাজ একটি আকস্মিক উপলক্ষ্য মাত্র। কমলের নিকট তাজমহলের মধ্যে মমতাজ নাই, একনিষ্ঠ প্রেম নাই, তবুও ইহার মূল্য একবিন্দু কমে নাই। কমল জানাইল, বিশ্বের সৌন্দর্যের ইতিহাসে তাদের পরিচয় মমতাজকে আশ্রয় করিয়া না দাঁড়াইলেও তাহা তেমন ভাবেই অক্ষুন্ন থাকিবে। এক মুহূর্তেই আমরা কমলের পরিচয় পাই আর পরিচয় পাই শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহী অন্তরের। আমরা বুঝি, কমল কল্পনা দিয়া কাব্য গড়ে না, তাহার সৌন্দর্যানুভূতি ভাবরাজ্যে বিচরণ করেনা। মানুষের ইন্দ্রিয়, মানুষের চক্ষু, মানুষের কর্ণই মাত্র সৌন্দর্য বিচারে সাক্ষ্য কমল ইহাই মাত্র জানে। বিশ্বের নরনারী এক অপরূপ কল্পনায় সমাধি-সৌধকে দেবতার মন্দিরে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু কমল যেন মুহূর্তের মধ্যে সে-মন্দিরের দেবতাকে টানিয়া লইয়া তাহাকে জগতের অগণিত নরনারীর মধ্যে মিলাইয়া দিল।

নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে মানুষ একনিষ্ঠতাকেই বহুদিন ধরিয়া সর্বোচ্চ আসন দিয়া আসিতেছে। এই জন্যই আগ্রার সমাজে আশুবাবু সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। মৃত স্ত্রীর স্থানে কোনদিনই অন্য কাহাকেও তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা সকলের মুখে। কিন্তু কমলের নিকট আশুবাবুর এই পরিচয় তাঁহার হৃদয়ের অচল এবং অনড় জড় ধর্মেরই পরিচয়। আশু বাবু এবং অবিনাশবাবুর হৃদয় মরিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে-হৃদয়ের পক্ষে আর কাহাকেও ভালবাসা সম্ভব নয়। কিন্তু সকলের পক্ষে ইহা সত্য হইতে যাইবে কেন? দেহমনে যাহার যৌবন আছে, যাহার মনের প্রাণ আছে, একদিন সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, কোনদিনই কোন কারণেই কেন যে তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারিবে না, কমল তাহা বুঝিতে পারে না। তাই নরনারীর প্রেমের ব্যাপারে এই একনিষ্ঠতা কমলের নিকট মহৎও নয়, আদর্শও নয়।

আমরা জানি, কমলের এই শক্তি তাহার দম্ভ নয়, ইহা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতাও

নয়। শৈব বিবাহ তাহার নিকট ফাঁকি নয় কিন্তু সংযম তাহার নিকট নিষ্ফলের আত্মপীড়ন। ক্ষণিকের মুহূর্তগুলি নিয়াই কমল জীবনের আনন্দলোক সৃষ্টি করে। ক্ষণিক— তাহার আয়ুষ্কাল যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, কমলের নিকট উহা অর্থহীন নয়, এক মুহূর্তের আনন্দও তাহার নিকট মিথ্যা নয়। বিগত সুখের শিশির বিন্দুগুলি তাহার নিকট পরম সত্য। গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপে শুকাইয়া তাহার অস্তিত্ব মিলাইয়া গেলেও কমল তাহাকে অস্বীকার করেনা। পরিমাণ তাহার যতটুকই হউক, যত অল্পই হউক কমলের জীবনে উহাই একমাত্র সত্য। অজিতকে একদিন সে এই কথাই বলিয়াছিল, "এ জীবনে সুখ দুঃখের কোনটাই সত্যি নয়, অজিত বাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়া ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া।" আবও একদিন অজিতকে সে ইহাই বলিয়াছিল, "হোক মোহ ক্ষণিকের কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়। ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে।" এইজন্য শিবনাথের সঙ্গে শৈব বিবাহ কমলের নিকট ফাঁকি নয়। শিবনাথের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী মিলনকে সে অন্তর দিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। আজ সূর্য উঠিয়াছে, ইহাই তাহার নিকট সত্য। কাল মেঘ আসিয়া ইহাকে আবৃত করিবে, ইহা ভাবিয়া সে আজিকার আনন্দে সন্দেহের ছায়াপাত করেনা। এই জন্য শিবনাথের শৈব বিবাহের ফাঁকি আর দশজনের নিকট ধরা পড়িলেও কমল এজন্য অভিযোগ করে না। মিলনেব আনন্দকে সে স্থায়িত্বের বন্ধনে বাঁধিতে চাহে নাই। কারণ তাহার মতে আনন্দকে বাঁধিতে গেলেই সে মরে। মনের মুক্তলোকে তাহাকে অবাধ বিচরণ করিতে দিলেই তবে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করা যায়। এ যাহারা না পারে, তাহারা শুধু সন্দেহেব মধ্যেই ঘুরিয়া মরে। অজিতকে সে এই কথাই বলিয়াছিল।

নরনারীর ভালবাসাকে সমাজ বিবাহের মধ্যে স্থায়ী রূপ দেয়। ক্ষণিকের মিলন সে যতই সুন্দর, যতই আনন্দপূর্ণ হউক না কেন, সমাজ তাহাকে কোন মূল্য দেয় না। সমাজের নিকট ইহার মধ্যে কল্যাণ নাই। কিন্তু কমল এই কল্যাণ চায় না, সে চায় আনন্দ, তা সে ক্ষণস্থায়ী হইলেও কমলের আপত্তি নাই। ইহাই তাহার নিকট সত্য। নাই বা রহিল ইহাতে কল্যাণ, আনন্দের পরিপূর্ণ যে অনুভূতি এখানে আছে। তাহাই তাহার নিকট কল্যাণ। ফুল নিত্য কালের নয়, আয়ু তাহার এক বেলার বেশি নয়, তার পরেই সে ঝড়িয়া পড়িবে। গাছের পাতাও চিরস্থায়ী নয়। পুরাতন পাতা ঝড়িয়া পড়ে, নূতন

পাতা গজায়, বৃক্ষ ইহাকে প্রাণ দিয়াই গ্রহণ করে কিন্তু মরা লতা গাছকে জড়াইয়া থাকিবে কমল ইহার মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পায় না। ইহার মধ্যে বৃক্ষের বা লতার কাহারও কোন কল্যাণ নাই। কমলের নিকট বিবাহ নরনারীর জীবনে আর দশটা ঘটনার মত একটা ঘটনা মাত্র। ইহার বেশী নয়। বিবাহকে নারী-জীবনের সর্বস্ব বলিয়া কমল কোন রকমেই গ্রহণ করিতে সম্মত নয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীন সমাজে একদিন হয়ত বিবাহের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ যদি সে প্রয়োজন মিটিয়া থাকে তবে ইহার কোন পরিবর্তন ঘটিতে পারিবে না কেন? শরচ্চন্দ্রের শেষ প্রশ্নের ইহাই অন্যতম প্রশ্ন। আশুবাবু কমলকে বলিয়াছিলেন, "কমল, আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করবার সময় আমাদের অনন্ত, উপুড় হয়ে শুয়ে খাবার প্রয়োজনই হয় না।" কমল ধীর এবং শান্তকণ্ঠে বলিয়াছিল—"এ কথা মানি কাকাবাবু, কিন্তু তাই বলে তো আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারবো না। আকাশ কুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তর কাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বুদ্ধিতে পাই এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ।" কমল যুগে যুগে শোভায়—সম্পদে এই জীবনকেই পরিপূর্ণ দেখিতে চায়। পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালকে সে অবহেলায় অপমান করে না। আমরা দেখি, এই জন্যই সে কেবল মাত্র বৎসর গণনা করিয়াই কোন আদর্শের মূল্য ধার্য করে না। "অচল অনড়, ভুলে ভরা আমাদের সহস্র বর্ষও অনাগত দশটা বছরের গতিবেগে ভাসিয়া যাইতে পারে"—কমল ইহাই মনে-প্রাণে একান্ত বিশ্বাস করে। এইজন্যই শুধুমাত্র প্রাচীন বলিয়া, বহু বৎসর টিঁকিয়া আছে বলিয়াই কোন কিছু তাহার নিকট পূজ্য হইয়া উঠে না। কালধর্মে বস্তু অতীত হয়, হয়ত দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঁচিয়াও থাকে, কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণেই তাহার গৌরব বাড়েনা। কমল ইহাই প্রচার করে, এবং এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর স্থায়ীত্বকাল দীর্ঘ নয়, জীবন যাহার ক্ষণকালের তাহাকেও তো অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। হউক না ক্ষণকালের, তবুও ক্ষণও তো সত্য। কমলের নিকট এই ক্ষণ ব্যর্থ নয়। এইজন্যই হরেন্দ্র, অক্ষয়, অজিত এবং সতীশের দল উচ্চকণ্ঠে যখন ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের গৌরব প্রচারে ব্যস্ত, তখন কমল ইহাকে পরিহাস করে, তাহার যত অশ্রদ্ধা, যত বিরূপতা ইহার প্রতি। কমলার নিকট এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরাগ সংস্কার ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। হরেন্দ্রের আশ্রমের সতীশকে সে একদিন ইহাই

বলিয়াছিল। সতীশ তাহার মনোভাব জানিয়াই দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাহাকে জানাইয়াছিল, "ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব ও প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়া দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের তো জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্ত্য নীতি ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার, সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" তাহার আন্তরিক বেদনা অনুভব করিয়া সকলেই নিরুত্তর ও মৌন ছিল। উত্তর দিয়াছিল কিন্তু কমল। সংযত, শান্ত এবং মৃদুকণ্ঠে সে সতীশকে কহিয়াছিল, "সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন সংস্কারের দিক দিয়াও যদি তাকে এমন পরিত্যাগ করতে পারতেন, একথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হোত না। সে ভাবের জন্য বিশেষত্বের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই তার সমাদর, মানুষের জন্যই তার দাম।"

দুনিয়ার বুকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি বহু তন্ত্র বা বাদ উদ্ভূত হইয়া সমাজজীবনকে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন বাদের নীচে দাঁড়াইয়া কত জীবন আজ বলি হইয়া যাইতেছে। শরৎচন্দ্র ইহাতে ব্যথিত হইতেন। তিনি জানিতেন, সমাজের জন্য মানুষের জন্যই এই সকল 'বাদ' বা তন্ত্র। কিন্তু পারস্পরিক বিরোধে মানুষই যদি ধ্বংস হইয়া যায়, তবে কি প্রয়োজন থাকিবে এই বাদ বা তন্ত্রের? জাতীয় বিশেষত্ব সম্পর্কেও তিনি এই ধারণাই পোষণ করিতেন। তাঁহার নিকট সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাণশীল জাতি। যে জাতির প্রাণ আছে, চলার পথে সে নূতন বিশেষত্ব সৃষ্টি করে, মৃতজাতির পুরাতন বিশেষত্ব আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার মধ্যে লাভ কি? আমাদের পিতামহ, প্রপিতামহের দল একদিন এই বিশেষত্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে তাঁহারা সেদিন বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু সেই বিশেষত্ব আমাদের মধ্যেও যে জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনিবে, ইহা মনে করা ইতিহাসকে উল্টা দিক হইতে দেখা। অর্থাৎ মানুষ বিশেষত্ব সৃষ্টি করে এবং যুগে যুগে সেই বিশেষত্ব বদলায়ও। এক যুগে দাতাকর্ণ, অতিথি বাৎসল্যের আদর্শ ছিল, বিনা দোষে পত্নীকে চিরদিনের জন্য বনবাসে পাঠাইয়াও আদর্শ রাজা হওয়া সম্ভব ছিল। পরবর্তী যুগের ধাত্রীপান্না প্রভুভক্তির আদর্শরূপে এখনও আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু আজিকার জীবনে সে-আদর্শ যদি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, সমাজ-জীবন যদি অন্য পথে চলিতে থাকে তবুও কি আমাদের সেই

পুরাতন আদর্শ আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে? ইহা দ্বারা জাতীয় জীবনে প্রাণ সঞ্চার করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নই শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন। এই কথাই কমল বার বার বলিয়াছে—দুনিয়ার বয়স হইতে হাজার দুই বছর মুছিয়া ফেলিলেই অর্থাৎ দুই হাজার বছর আগে ফিরিয়া গেলেই মানুষের জীবনে স্বর্ণযুগ নামিয়া আসিবে না। আশুবাবুকে একদিন কমল বলিয়াছিল, "রামায়ণ মহাভারতে যত লেখাই থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃজঠর যত নিরাপদই হোক তাতে ফিরে যাওয়াও যাবে না।" তাহার বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা উপস্থিত সকলকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। দীর্ঘ দিনের সংস্কারে ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহাদের বাঁধিতেছিল কিন্তু ইহাকে যে উপেক্ষা করা চলে না, তাহাও তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। তাহাদের এ অবস্থাকে স্বীকার করিয়াছিলেন বৃদ্ধ আশুবাবু, "তর্কে যাই বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি।"

নরনারীর কোন আদর্শকেই কমল চিরন্তন সত্য বলিয়া অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে নাই। অতীতে একদিন সমাজের কল্যাণের জন্য এই ধরণের বিধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ সে-সমাজ নাই, সামাজিক আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তবুও সেই পুরাতন বিধির মঙ্গলাদর্শ তেমনি অক্ষয়, তেমনি অটুট হইয়া আছে ইহা বিশ্বাস করা কমলের ধর্ম নয়। এই জন্যই আশু-বাবুর একনিষ্ঠ প্রেমকে কমল অবহেলা করে, নীলিমার নিঃস্বার্থ গৃহিণীপনাকে সে উপেক্ষা করে, হরেন্দ্রের আশ্রমের নিষ্ফল দারিদ্র চর্চাকে সে বিদ্রূপ করে। অপরে যেখানে আত্মসংযমের অপূর্ব আদর্শ দেখিয়া মাথা নত করে, কমলের নিকট উহা নিষ্ফল আত্মনিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

অবিনাশ বাবুর গৃহে নীলিমার নিঃস্বার্থ গৃহিণীপনা দেখিয়া হরেন্দ্র ইহাকে ভারতীয় নারীর অপূর্ব আত্মদানের আদর্শ বলিয়া সগৌরবে প্রচার করিতেছিল। কিন্তু কমল একদিন তাহাদের এক নূতন কথা শুনাইল—বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্যে লোক ইহাকে যত গৌরবান্বিত করিয়াই তুলুক না কেন গৃহিণীপনার এই অভিনয় নীলিমার নিজের জীবনে মিথ্যা। ইহাতে তাহার না আছে সম্মান, না আছে আনন্দ। কমল তাহাদের জানাইয়াছিল—পুরুষের বাহবায় কড়ামদ খাইয়াই নারী এই ব্যর্থতার পথে আপনাকে ভুলাইয়া রাখে। ভারতীয় নারীজীবনে ইহা এক কর্মভোগের নেশা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। নীলিমা নিজেও আগে একথা জানিত না। তবুও ইহার অন্তর্নিহিত সত্য তাহার

নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল—বিধবার জীবনে সত্যিকার আশ্রয় কোথাও নাই, আশুবাবুর গৃহেও না, অবিনাশবাবুর গৃহেও না, এমন কি হরেন্দ্রের আশ্রমেও না। আমরা দেখি, মেয়েদের আত্মোৎসর্গ কমলের নিকট অর্থহীন। তাহার কথা—"ও প্রবৃত্তি তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শূন্যতা থেকে, ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ও তাদের স্বভাব নয়, অভাব।" এই অভাবের আত্মোৎসর্গে কমলের কানাকড়ি বিশ্বাস নাই। আশুবাবুকে এই কথাই কমল একদিন কহিয়াছিল, "সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি কোরে ভাবে এই বুঝি সত্যি। আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।"

ইহা শুধু শেষ প্রশ্ন নয়, আংশিক ভাবে উত্তরও। অতীতকে অস্বীকার করিয়াই নূতন এবং বর্তমান জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই শরৎচন্দ্র চাহিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক অচল, কিন্তু তবুও প্রাচীন সংস্কার তাহার পুরাতন ভাঙ্গা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে আমরা দেখিতে পাই। তাহাদের যুক্তি—হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে কমলের পরিচয় নাই, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যাহারা সফলতা অর্জন করিয়াছে, নিঃশেষে মনে করিয়াই যাহারা আপনাদের পাইয়াছে, দুঃখ বরণের মধ্য দিয়াই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে কমল তাহা-দিগকে জানে না। তাই কমলের জীবনের মূল মন্ত্র কেবল ভোগের মন্ত্র, সমস্ত যুক্তিতর্ক তাহার কেবল ভোগের ওকালতিতেই পূর্ণ। কিন্তু ভোগ যেখানে আছে সেইখানেই ত্যাগ। ভারতীয় জীবনে একদিন ভোগ ছিল, অতীত দিনের ভারতবাসী জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবেই ভোগ করিয়াছিল। ভোগের দ্বারা ভোগ লালসা বৃদ্ধি পায়—ইহা তাহাদের বইয়ের পাতা মুখস্থ করিয়া শিখিতে হয় নাই, জীবনে উপলব্ধি দ্বারাই ইহা তাহারা শিখিয়া ছিলেন। তাই তাহাদের জীবনে ভোগও ছিল যেমন সত্য, ত্যাগও তেমন সত্য। প্রকৃতপক্ষে, ত্যাগের অর্থ—ভোগ হইতেই ত্যাগ। কিন্তু আজিকার ভারতীয় জীবনে ভোগ নাই সম্পদ নাই, এখানে ত্যাগ দাঁড়াইবে কি আশ্রয় করিয়া? তাই ভোগহীন জীবনে এই ত্যাগের আন্দোলন নিষ্ফল দারিদ্র চর্চা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, শরৎচন্দ্র ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন।

আত্মোৎসর্গের মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই হরেন্দ্রের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইওরোপীয় সংস্পর্শ হইতে দূরে আপনাদের সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই

তাহারা সমাজ সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। অতীত ভারতের দানে, পুণ্যে এবং তপস্যার মধ্যে আদর্শ ছিল, তাহারই জোরে তাহারা নির্জীব ভারতকে পুনরায় সজীব করিতে চাহিয়াছিল। আগ্রার সমাজ ইহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত না থাকিলেও ইহাতে তাহাদেরও অনুমোদন ছিল। কিন্তু ঘর ছাড়া কতকগুলি ছেলে জুটাইয়া অল্প দিনেই তাহাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট করিয়া তোলাতে শুধু কমলই সায় দিতে পারে নাই। গায়ে যাহাদের জামা নাই, পায়ে যাহাদের জুতা নাই, পরিধানের বস্ত্র যাহাদের জীর্ণ এবং মাথায় কেশ যাহাদের তৈলাভাবে রুক্ষ, জীবনভর যাহারা শুধু অস্বীকারকেই পাইয়া আসিয়াছে, তাহারাই হইবে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভারতের আদর্শ ইহা কমলের জাতীয় যাহারা ভবিষ্যৎ ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ভারতের চিত্র দেখিতে চায় তাহারা স্বীকার করিতে পারে না। অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা মহাগৌরবে ইহারা মাথায় বহন করে, সংযম ও ত্যাগের শিক্ষার মধ্য দিয়া না পাওয়াই ইহাদের একমাত্র সম্বল। প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা যাহাদের জীবনে অবলম্বন, তাহারা ভবিষ্যৎ ভারতকে বাঁচিবার পথ দেখাইবে, ইহা শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এইজন্যই তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন— ইহাদের নিরানন্দ সদম্ভ জয়যাত্রার বিরুদ্ধে। শরৎচন্দ্র বুঝাইয়াছিলেন, মিথ্যা আত্মনিগ্রহের ব্যর্থ আড়ম্বরে ইহারা নিজেরা নিজেদের চিনিতে পারে না, আদর্শ আড়ম্বরের পশ্চাতে আপনি অন্তর্ধান করে, নিষেধের বাক্যের ছটায় নিজেরাই ভুলিয়া থাকে। পথের আদর্শ আমরা কমলের মুখেই শুনি। হরেন্দ্রকে সে কহিয়াছিল—"তাই বলুন, এ আমাদের কাম্য না, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসার, ত্যাগ ও বৈরাগ্য সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা।" যেন কবির বাক্য "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" শরৎচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, দৈন্যের মধ্যে আছে শূন্যতা, আছে হীনতা, আছে দুর্বলতা। তাই ভারতকে প্রথমে এই দৈন্য হইতেই মুক্তি দিতে হইবে, ইহাই ছিল তাহার নীতি। কমলের মুখ দিয়া তিনি এই সত্যই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। তাই ইহা শুধু শেষ প্রশ্ন নয়, উত্তরও।

কমল সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র কহিয়াছেন, "সে যেন বর্ষার বন্য লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি খুঁড়িয়া উর্ধে মাথা তুলিয়াছে।" আমরা জানি, ইহাই কমলের সত্য পরিচয়। তাহার ভাবনায় অপরের কোন স্থান নাই, সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার

আপন প্রয়োজনের কোন মিল নাই। মানুষের সাধারণ কর্তব্যবোধে মানুষ সেখানে দুঃখ বরণ করিয়া আত্মতৃপ্তি বোধ করে, কমল সেখানে দেখে আনন্দের ছলনা, ইহা তাহার নিকট দুঃখের নামান্তর মাত্র। আমরা দেখি, অনেকের সুধাপাত্র তাহার অপব্যয়ের অন্যায়েই ভরিয়া উঠে, কিন্তু এজন্য তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভও নাই, এবং ইহা প্রকাশ করিতে সে কিছুমাত্র লজ্জাও বোধ করে না।

কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, ইহা সমাজ-জীবনের একদিক মাত্র। অন্যদিকও আছে। শরৎচন্দ্র ইহা বিপ্লবী রাজেনের চরিত্রের মধ্য দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কমলের নিকট মনই সব, মতের পার্থক্য তাহার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে না। এইজন্যই আশুবাবু তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও এক অপরিসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই সে এই বৃদ্ধকে দেখিয়াছিল। কমলের আগ্রাজীবনে সর্বত্র এই শ্রদ্ধা সুপরিস্ফুট। এই মন লইয়া একদিন সে রাজেনের সঙ্গে মিলিতে গিয়াছিল কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় সে এই অবুঝমন বিপ্লবীর নিকট পায় নাই। এক বিপরীত কথাই সে তাহার নিকট শুনিয়াছে—কি হবে মনের মিল দিয়ে, মতে যেখানে মিল নাই? রাজেনের সহিত কমল অক্ষয় বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে গিয়াছিল। কিন্তু রাজেন তাহার এই অক্ষয় বন্ধুত্বকেও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, "আজ এই লোকটির কাছে যেন তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে সে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।" রাজেনকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, মত ও কর্ম দুইই বাইরের জিনিস, মনটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু রাজেন তাহাকে বলিয়াছিল, "মনের মিলটাকে আমি তুচ্ছ করিনে কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য ও মহত্ত্ব দুইই প্রকাশ পায় না।" এই রাজেনের নিকটই কমল এক নূতন সত্য শিক্ষা করিল,—"যার নিজের কোন মত নাই, সেই কেবল সর্বপ্রকার মতকে শ্রদ্ধা করতে পারে।" আমরা দেখি, মতের ঐক্য, কাজের ঐক্যই এই রাজেনের দলের নিকট সব, মনের মিলের ভাববিলাসের কানাকড়ি মূল্য ইহাদের নিকট নাই। অথচ মিথ্যা পাথরের প্রতিমাকে অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াসে জীবন দেওয়াও ইহাদের পক্ষেই সম্ভব। হরেন্দ্রকে একদিন কমল কহিয়াছিল, "রাজেনকে ভুলতে পারিনে এ সবচেয়ে বেশী টের পাই আপনি এলে। আশ্রমে

তার স্থান হোল না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে। সেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু মন কোথাও বাধা পেল না। হাওয়া আলোর মতই সব দিক খালি পড়ে রইলো, পুরুষের যেন এক নূতন পরিচয় পাইলাম।" তবু রাজেন সাধারণ সমাজ-চিত্র না, ইহাও আমরা বুঝি।

নীলিমা কমলকে শ্রদ্ধা করিত, নারীর অন্তরের এই দুর্নিবার শক্তির নিকট মাথা তাহার আপনিই নত হইয়া আসিত। কিন্তু তবুও সে সর্বতোভাবে কমলকে মানিয়া লইতে পারে নাই, ইহাই আমরা দেখি। শিবনাথের সঙ্গে মনোরমার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। মাতৃহারা একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিছুতেই তিনি এ বিবাহ মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু যুক্তিতর্কে কমল বৃদ্ধকে অন্য দিকেই ঠেলিতেছিল। আশুবাবুকে কমল বলিয়াছিল—"মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে তো সন্তানের মুক্তি থাকে না, থাকে তার অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে।" কন্যাবৎসল পিতৃহৃদয় এই যুক্তির আড়ালেই আশ্রয় খুঁজিতেছিল, কিন্তু কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল। মনে হইতেছিল, কোথায় যেন কি গলদ আছে, কমলের যুক্তিই শেষ যুক্তি নয়। কন্যা যখন অন্যায় করিতেছে, অন্ততঃ পিতার নিকট কন্যার আচরণ যখন অন্যায় বলিয়াই মনে হইতেছে তখন পিতা তাহাকে আশীর্বাদ করিবে কেমন করিয়া? পিতৃহৃদয়ের এই বিষম শঙ্কায় নীলিমার যে কথাগুলি বৃদ্ধ আশুবাবুকে অন্ততঃ কতকটা আলোকের সন্ধান দিয়াছিল, তাহা আর যাহাই হউক কমলের কথার প্রতিধ্বনি নয়। বরং তাহার বিরোধিতাই বলা চলে। নীলিমা প্রতিবাদ করিয়াই বলিয়াছিল, "সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে আর পিতার শুভবুদ্ধিতে নাই?" উপস্থিত সকলকে নীলিমা শুনাইয়াছিল, "সূর্য্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে যাওয়াটাও এমনি বড়।" নীলিমা কমলকে শিখাইয়াছিল, "রূপ-যৌবনের আকর্ষণই কেবলমাত্র ভালবাসা নয়। ভালবাসা আর একটি বস্তু যাহার আকর্ষণ দেহাতীত।" কমলকে সে আরও বলিয়াছিল, "আমি বই পড়িনি, জ্ঞানবুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাও নি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না, অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়, যখন দেখা দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।"

ইচ্ছা করিয়াই কমল সেদিন নীলিমার এই কথা শুনিয়া উত্তর দেয় নাই। উত্তর সে-যে দিতে পারিত না তাহা নয়। তবুও যুক্তি দিয়া, তর্ক দিয়া, কথা দিয়া সত্যের সন্ধান যে পাওয়া যায় না, নীলিমার এই কথাগুলিও উড়াইয়া দিবার নয়। বস্তুতঃপক্ষে ইহা জীবনের আর একদিক। মরীচিকা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যর্থ অনুসরণে মানুষের কল্যাণ বা আনন্দ কিছু আছে কি? প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বা আনন্দ কোনটাই জীবনের পক্ষে ছোট নয়, কোনটাকেই উপেক্ষা করিলে চলে না। আসল কথা হইল, কল্যাণের ব্যর্থ আড়ম্বরে আমরা যেন আনন্দকে ফাঁকি না দিই অথবা আনন্দের ব্যর্থ আকর্ষণে কল্যাণকে এড়াইয়া না চলি। কল্যাণ যদি সত্যই আসে তবে তাহা আনন্দের পথ ধরিয়াই আসিবে, ইহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

আমরা জানি, আশুবাবুর সমস্ত জীবনটাই ছিল কমলের মতামতের প্রতিবাদ। কমলের মতামতের তীব্র আলোকচ্ছটা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তাই জীবনে কোনদিনই তাহাকে অনুসরণ করিবেন, এ সম্ভাবনার কথা তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সমগ্র আগ্রাসমাজে কমলকে অকুণ্ঠ সস্নেহ আশীর্বাদ একমাত্র এই বৃদ্ধই করিতে পারিতেন, ইহা আমরা জানি। জীবনে একদিন এই বৃদ্ধ মণির মাকে ভালবাসিয়াছিলেন। আজ আর সে নাই, সে দিনও আজ নাই। পুরাতন অতীত আজ জগতের বুকে নিশ্চিহ্ন হইয়াই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আশুবাবুর নিকট আজও তাহা চরম সত্য। দেহ নাই, কিন্তু দেহাতীত ভালবাসা লইয়াই জীবন বাঁচিয়া আছে। কিন্তু কমলের ইহাতে বিশ্বাস নাই। কমলের নিকট ইহা বাঁচা নয়, প্রাণের জড়ধর্ম, মৃত্যুর নামান্তর। কোন অবস্থার নিকটই সে আত্মসমর্পণ করিয়া বাঁচিতে চায় না, কোন অবস্থাই চরম বলিয়া সে মানিতে লইতে পারে না। তাহার বাঁচিবার তাগিদ অফুরন্ত। শিবনাথ তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে; প্রবঞ্চনা করিয়াছে, সে অন্যায় তো শিবনাথের, তাহার ক্লেদ কমলকে স্পর্শ করিবে কেন? আনন্দের অন্বেষণ প্রচেষ্টা একবার বিফল হইল বলিয়াই চিরজীবন ধরিয়া এই শূন্যতার বিজয় ঘোষণা করিতে হইবে, চিরজীবন হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে, ইহা কমল হীনতা বলিয়াই মনে করে। আশুবাবু ইহা সম্পূর্ণভাবেই বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই আগ্রার সমাজের অন্য সকলের মত তিনি কমলকে ঘৃণা করিতে পারেন নাই এবং তাহার মতামতে বাধাও দেন নাই। কিন্তু এই দুর্গম অভিযানে তিনি কমলকে সর্বত্র অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করিতেও পারে নাই।

চিরদিনের সংস্কার আসিয়া তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা জানি, মৃত স্ত্রীর পবিত্র স্মৃতিকে বৃদ্ধ তাঁহার হৃদয়ের এক কোণে অতি সংগোপনে দীর্ঘকাল পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এই নীরব নিষ্ঠার প্রতি চারিদিক হইতে সশ্রদ্ধ অভিবাদনরাশি বর্ষিত হইত। ফলে এজন্য তাঁহার নিজের গর্বও কম ছিল না; অন্ততঃ কমলের আগ্রায় উপস্থিত হওয়ার আগে ইহাই আমরা দেখি; কমল আসিয়াই বৃদ্ধের হৃদয়ের এই অতি কোমল স্থানে আঘাত করিয়াছিল। আশুবাবু ইহাতে ব্যথিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইজন্য কমলের প্রতি বিন্দুমাত্র তিনি বিমুখ হন নাই।

শরৎচন্দ্র বুঝাইতে চাহিয়াছেন, সমাজিক জীবনে আজ যে আদর্শ সজীব, যাহার জয়ঢক্কার বিজয় নিনাদে চতুর্দিক মুখরিত, কাল হয়ত তাহার কোন মূল্যই থাকিবে না, প্রাচীন যুগের অসভ্য প্রথা বলিয়াই তাহা নিন্দিত হইবে। ভারতীয় সমাজ একদিন সতীদাহ করিয়া গৌরববোধ করিত, জীবিত নারীকে মৃত পতির চিতায় দগ্ধ করিয়া আত্মীয় স্বজন সকলে গৌরবান্বিত হইত বিক্ষুব্ধ সমুদ্র-বক্ষে অবুঝ শিশুকে নিক্ষেপ করিয়াও তাহারা ধর্মেরই সেবা করিত; কিন্তু আজিকার জীবনে ইহার মূল্য কি? বর্তমান সমাজে যে নিয়মগুলি শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছে; ভবিষ্যৎ সমাজে হয়ত ইহারও ঐ দশাই হইবে। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'শেষ প্রশ্নে' এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল এবং কমল আশুবাবুকে এই কথাই বলিয়াছিল, "আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত অনুকম্পার কারণ হবে। এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের বাড়াবাড়িকে লোক হয়ত উপহাস করে চলে যাবে।"

আশুবাবু এবং কমলের এই দুই বিপরীত মতবাদকে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পাশাপাশি স্থান দিয়াছেন। দুই পরস্পর প্রতিবাদ যেন হাত বাড়াইয়া দূর হইতে একে অপরকে অভিবাদন করিতেছে, আবার কাছে আসিয়া হৃদয়ের অপার স্নেহরাশি যেন পরস্পরের প্রতি ঢালিয়া দিতেছে। আমরা দেখি, আশু বাবুও কমল দুই পরস্পর বিপরীত ধর্ম। আশুবাবু শান্ত, কমল উগ্র, আশুবাবু ক্ষমাশীল, ক্ষমা কাহাকে বলে কমল তা জানে না। শিবনাথের প্রতি তাহার আচরণ বাহিরের দিক হইতে ক্ষমার আকার ধারণ করিলেও কমল তাহাকে ক্ষমা করে নাই, উপেক্ষা করিয়াছে। আশুবাবুকে কমল বহুবার আঘাত করিয়াছে, কিন্তু সেই স্নেহশীল ক্ষমাশীল হৃদয় নীরবেই সে-আঘাত সহ্য করে আমরা দেখি। তবুও

দেখি, বিদ্রোহধর্মী কমল আশুবাবুর প্রিয়। কারণ কমলের সত্যিকার মনের পরিচয় আশুবাবুই পাইয়াছেন। অন্তরে তাহার না আছে ঈর্ষা, না আছে দ্বেষ, ইহা তাহার বিদ্রোহী মনের ধর্ম। অন্তরের উত্তাপ ক্ষণে ক্ষণে বাহিরে প্রকাশ হয় মাত্র

শিবনাথের সঙ্গে বিবাহকে শৈব বিবাহ জানিয়াও কমল তাহাকে ফাঁকির চোখে দেখিতে পারে নাই। অন্য লোকে তাহাকে সাবধান করিয়াছ, কিন্তু কমলের নিজের মনকে ইহা বিন্দুমাত্র দোলা দিতে পারে নাই। ভালবাসার বন্ধনকে সে বিধান দিয়া আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধে নাই। তাহার নিজের কথায় মুক্তির আসন সে আলগাইয়া রাখিয়াছিল। আগ্রার সমাজে সেদিন কেহ কমলের এই কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সকলে ইহাকে তাহার অহঙ্কারী মনের দাম্ভিক উক্তিই মনে করিরাছিল। কিন্তু যেদিন সত্যসত্যই শিবনাথ তাহার শৈব-বিবাহকে কিছু না বলিয়াই উড়াইয়া ছিল এবং মনোরমার সঙ্গে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ যখন পাকাপাকি করিয়া ফেলিল তখন সকলেই বিস্মিত হইল। আশুবাবু, হরেন্দ্র, অবিনাশ প্রভৃতি কমলের হিতাকাঙ্ক্ষীর দল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শিবনাথকে শাস্তি দিয়া কমলকে আবার তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিবে এবং শৈব বিবাহের জুড়ীরথ আবার তাহার সহজ গতিতে চলিতে থাকিবে। তাহাদের নিকট ইহাই ছিল শিবনাথের অন্যায়ের প্রতিকার। কিন্তু কমলের নিকট ইহা নারীত্বের চরম অপমান, তাহার হৃদয়ের পতন। ইহাকে সে কোন মতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। আশুবাবুকে সুস্পষ্ট ভাবেই সে জানাইয়া দেয়, "সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে আর জোড়া দিতে আমি পারবো না।" হরেন্দ্রকে সে কহিয়াছিল, "আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভালো করবার বাসনায় আর যেন আমার ক্ষতি না করেন।"

আমরা দেখি, শৈব বিবাহের মোহ শিবনাথের যখন কাটিয়া গেল, ভবিষ্যতে মনোরমার সঙ্গেই আপন জীবনকে সে মিলাইয়া দিতে যখন কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল, কমলও এক মুহূর্তেই যেন তাহাদের পুরাতন সম্পর্ককে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। শৈব বিবাহের ব্যর্থতাকে সে একদিনের জন্যও ব্যর্থ মনে করিল না অথচ যে-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহাকে সে পুনরায় জোড়া দিতেও গেল না। ইহা কমলের প্রাণধর্মের পরিচয়, মনের সজীবতার পরিচয়। শিবনাথ গেল, তাহার ভালবাসাকে অপমান করিয়াই গেল। কিন্তু কমল নিজেকে অপমানিত লাঞ্ছিত মনে করিয়া আর দশজনের উপহাস বা করুণার পাত্রী

হইতে চাহিল না। কমলের নিকট বিশ্ব সংসারে একমাত্র শিবনাথের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা নয়। তাই শিবনাথ কমলের দিক হইতে মনোরমার দিকে মুখ ফিরাইল, কমল ও রাজেনকে তাহার গৃহে আহ্বান করিয়া লইল। তাহাকে জীবনে চিরসঙ্গী করিবার প্রচেষ্টা যে কমলের ছিল, ইহা সে নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছে। আমরা জানি, রাজেন যদি অমন উদাসীন ভাবে তাহার অক্ষয় বন্ধুত্বকে উপেক্ষা না করিত, তাহার দেওয়া 'তুমি' ডাকার অধিকারকে আর দশজন পুরুষের মত সাগ্রহে গ্রহণ করিতে পারিত, তবে অজিতের ভাগ্য হয়ত অত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিত না। কমলের মত এবং মনকে আমরা জানি। শিবনাথের শূন্য আসনে তাহার কাহাকেও একান্তই প্রয়োজন। নিজের মনের শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার জন্যই, তাহার এই প্রয়োজন। তাই রাজেনকে না পাইলে অজিতই আসিয়া সে স্থল পূর্ণ করে। তবুও কমলের পক্ষে ইহা উচ্ছৃঙ্খলার ইতিহাস নয়. ইহা তাহার সংযত শান্ত হৃদয়েরই পরিচয়। আমরা দেখি, কমল তাহার রূপযৌবন দিয়া অজিতকে প্রলুব্ধ করে নাই বরং যেখানে তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক কলিমা, মালিন্য সবচেয়ে বেশী, সেই ইতিহাসটুকুই সে অকুণ্ঠভাবেই অজিতের নিকট প্রকাশ করে। পাছে অজিতের বিতৃষ্ণা আসে, পাছে সে মিলনে দ্বিধাবোধ করে, এ চিন্তা কমলকে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করে নাই। কমলের মায়ের রূপ ছিল কিন্তু রুচি ছিল না— ইহা সে অকুণ্ঠভাবেই অজিতের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। আমরা দেখি মুহূর্তপূর্বে এই অজিতই তাহাকে দেবীর আসনে বসাইয়াছিল, উচ্ছ্বসিত আবেগে অনেককেই তাহার পদস্পর্শের অযোগ্য মনে করিয়াছিল। এই জন্য ইতিহাস তাহাকে কত বড় আঘাত করিবে, ইহা কমলের অজানা ছিল না। কিন্তু তবুও সে সত্যকে অকুণ্ঠ মর্যাদা দিয়াছিল। অথচ ইহা তাহার দাম্ভিকতা নয়, অহঙ্কারও নয়। অজিত আপনাকে আপনি একদিন এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বিপুল আড়ম্বরে আপনার কলঙ্ক কালিমাকে বিশ্বের সকলের সম্মুখে ধরিবার কি প্রয়োজন ছিল? ইহা গোপন করিলে তাহার ক্ষতি কি ছিল?" কিন্তু অর্থ ইহার নিকট আপনা আপনি সেইদিন স্বচ্ছ হইয়া পড়িল, সেদিন কমলের সঙ্গে জীবনযাত্রা তাহার একই পথে প্রবাহিত হইল। আমরা জানি, আপন অব্যক্ত জীবনের ইতিহাসের অত্যন্ত গোপনীয় পাতা কয়টাই সে অজিতের নিকট খুলিয়া ধরে নাই, তাহার স্বেচ্ছা প্রদত্ত অর্থও সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কারণ কমলও বুঝিয়াছিল, যে অধিকার-বোধে নরনারী পরস্পর মিলনে

পরস্পারের নিকট হইতে কুণ্ঠাহীন চিত্তে অর্থগ্রহণ করিতে পারে তাহাদের মধ্যে সে অধিকার-বোধ জন্মে নাই। অজিত কমলকে অর্থ সাহায্য করিতে গিয়াছিল তাহাকে অর্থাভাবগ্রস্ত মনে করিয়া, অজিত গিয়াছিল কমলকে অনুগ্রহ করিতে, ভালবাসার অধিকারে ভালবাসার পাত্রকে সে সাহায্য করিতে যায় নাই। তাই কমল এ অনুগ্রহের দান লইতে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা নাই। কমল বুঝিয়াছিল, অজিতের সহানুভূতি সে পাইয়াছে, অজিতের শ্রদ্ধা পাইয়াছে। ইহাই একদিন ফলে-ফুলে সঞ্জীবিত হইয়া প্রেমের আসন হয়ত গ্রহণ করিতে পারে। তাই অসময়ে অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে টুঁটি চাপিয়া মারিতে চাহে নাই। এইজন্যই কমল একদিন অজিতকে বলিয়াছিল, "দান আমি কারও নিইনে, এমনকি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া কি সংসারে কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, 'না কমল, একাজ আমি তোমাকে করতে দেব না?' আমি তার কি জবাব দিতাম?" লালাদের অভিনয়ের ব্যাপারের মধ্য দিয়াই কমল বুঝিয়াছিল, অজিতের অন্তরে কেবল তাহার জন্য দৈন্যে সহানুভূতিই নাই, সেখানে তাহার জন্য সম্ভ্রমবোধ আছে, মর্যাদার আসন আছে। আমরা দেখি, কমল ভুল বুঝে নাই। অজিত কেবলমাত্র তাহার দৈন্যে সাহায্য করিতেই যায় নাই। মান-সম্মান, নিন্দা-গ্লানি তুচ্ছ করিয়া কমলকে সে পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আশুবাবুর বিদায় উপলক্ষে নিমন্ত্রণ সভায় আমরা ইহা ভাল করিয়াই বুঝি। নিন্দার ভয়েই প্রথমে সে সম্বর্ধনা আসরে কমলের সঙ্গী হইতে পারে নাই কিন্তু কমলকে একা ছাড়িয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিন্তে গৃহে বসিয়াও থাকে নাই। সমস্ত নিন্দা এবং সমস্ত গ্লানির অংশ নিতে বিলম্বে হইলেও সে ছুটিয়া গিয়াছিল কমলের পাশে। সমবেত সকলের সম্মুখে তাহাদের মিলনের কথাটাও এই জন্যই সে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল।

শিবনাথ কমলকে শৈববিবাহ করিয়াছিল। সে-যে ফাঁকি তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহার পরও কমল সাবধান হয় নাই। অজিতের বিবাহের প্রস্তাব কমল অস্বীকারই করিয়াছিল। কারণ, নিরেট নিশ্ছিদ্র করিয়া সে বাড়ী গাঁথিতে চাহে নাই। তাহার নিজের প্রয়োজনে সে এই ফাঁকির পথ উন্মুক্ত রাখে নাই, ইহা আমরা বুঝি। কারণ একাকী অজিত কতখানি অসহায় তাহা কমল জানে। শরৎ-সাহিত্যে এইখানে কমল অন্যান্য নারীর

সমশ্রেণীর। পুরুষ এখানে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর দয়ার পাত্রী এবং এই দয়ার মধ্য দিয়াই পরস্পরের হৃদয় বিনিময় হয়। বিজয়ার জীবনে নরেন্দ্রনাথ, বড়দিদির জীবনে সুরেন্দ্রনাথ, ভারতীর জীবনে অপূর্ব এই করুণার পথেই প্রবেশ করিয়া শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আসন পাইয়াছে।

কমলের সঙ্গে অজিতের মিলন শেষ পর্যন্ত ঘটিয়াছিল। এ মিলন ছিল হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের—মিলন নিছক হৃদয়ের প্রয়োজনেই। আমরা জানি, মিলন যদি আমরণ স্থায়ী হয়, কমলকে ইহা আনন্দই দিবে কিন্তু কোন কারণে প্রয়োজন যদি মিটিয়া যায়, মিলনে যদি ছেদ পড়ে, তবুও সে ইহাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে না। হৃদয় ভালবাসিবে হৃদয়কে, মিলন হইবে তাহারই প্রতীক। ইহাই কমলের নীতি। কিন্তু ভালবাসার নদী শুকাইয়া গেলেও সেই শুক্‌না চরায় কেহ ডুবিয়া মরিবে, কমল ইহা চাহে নাই। তাই অজিত—কমলের মিলনেও সেই মুক্তির অবকাশ রাখিয়াছিল, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর যাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা এখানে ছিল। কমলের নীতিতে শক্ত বাঁধন মিলনের পথে বিঘ্ন, ইহা ভালবাসার প্রাণকেই আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া হত্যা করা হয়। তাই সে অজিতকে কহিয়াছিল, "সে যেন তাহার নিজের দুর্ব্বলতা দিয়াই কমলকে বাঁধিয়া রাখে, সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াই তাহাকে বাঁধে।"

'শেষ প্রশ্নে' কমলকে আমরা দেখি, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি—একথা বলা চলে না। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রের শতকরা ৯০ ভাগ তাঁহার নিজের চোখে দেখা। কিন্তু কমল সম্পর্কে ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, কমল যেন পুরাপুরিই কল্পনার সৃষ্টি। কমলের জীবনে ঘটনার অবকাশ কম, সবই যেন বাক্‌-চাতুর্যের একটা খেলা। কথার সঙ্গে কথা মিলাইয়া, অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার সাজাইয়া বাক্‌চাতুর্য্য ও প্রকাশভঙ্গী কতবড় কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে, কমলের সমস্ত জীবন যেন তাহারই একটা প্রতিযোগিতা।

পথের দাবী

অপূর্ব একদিন ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পথের দাবীর অর্থ কি বলবেন?" ভারতী উত্তর করিয়াছিল, "ও হচ্ছে আমাদের সমিতির নাম। ওর অর্থ আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সকল দাবী নিয়ে আমরা পথ চলি। আমাদের পথে যারা আসবে তারা যেন বিনা বাধায় হাঁটতে পারে। তাদের অবাধ মুক্ত গতি কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ।"

শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পথের দাবী' দেশ এবং কালের সীমারেখা টানিয়া সীমাবদ্ধ করেন নাই। 'পথের দাবী' বিশ্বের সকল মানুষের, সকল কালের এবং সকল দেশের। তবুও একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লববাদকেই সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া-ছেন, বাংলার বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না, হিংস্র রক্তপিপাসু ছিলেন না। মানুষের দুঃখে বিচলিত হইয়াই, মনুষ্যত্বের পথে মানুষের প্রতিষ্ঠা আর একটু পূর্ণতর করিবার জন্যই তাঁহারা এ পথে পা বাড়াইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন, একদিকে তাহারা যেমন ছিলেন বজ্রের মত কঠোর অন্যায়ের সঙ্গে জীবন গেলেও তাঁহারা আপোষ করিতেন না, কিন্তু অন্যদিকে আবার ছিলেন কুসুমের মতই কোমল। স্নেহ-প্রীতি এবং মমতা দিয়া তাঁহাদের অন্তর ছিল গড়া। মানুষের দুঃখ, মানুষের লাঞ্ছনা, মানুষের অপমান তাঁহাদের চিত্তকে যেমন ব্যথিত করিত, যেমন আকুল করিত, তেমনি অন্য কাহাকেও করিত কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্র জীবনে এই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনিন্দনীয় চরিত্র মাধুর্যের বিষয় জানিয়াছিলেন। তাই বাংলার এই বিপ্লবীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। এই শ্রদ্ধাই তিনি তাঁহাদের পথের দাবীতে লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

অপূর্বর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বর্মামুল্লুক হইতে 'পথের দাবী'র প্রতিষ্ঠা যখন উচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছিল; কথা উঠিয়াছিল, হিংসার, রক্তপাতের সম্পর্কে। সমবেত সকলকে শশি বলিয়াছিল, "আর মিছে রক্তপাতের কথা কেন ডাক্তার? উত্তরে সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, "বৃথা নরহত্যার আমি কোনদিনই পক্ষপাতী

নই। ও আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটি পিঁপড়েও মারতে পারি না। কিন্তু প্রয়োজন হলে…” ইহাই বাঙ্গালী বিপ্লবীর চরিত্র। মন তাহার অপূর্ব স্নেহ-মমতায় ভরা; কিন্তু প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতার জন্যই সে নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত নয়। আসলে এ নরহত্যা নয়, দেশ-বৈরীর নিধন। ইহার পশ্চাতে যে নীতি নিহিত আছে, তাহাও শরৎচন্দ্র পথের দাবীতে উল্লেখ করিয়াছেন, “দূর থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্য্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তাদেরই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার আর রইল না আমার?” এই অধিকার-বোধই বাংলার বিপ্লবীকে হিংসার পথে পা বাড়াইতে প্ররোচিত করিয়াছে। বিদেশীশক্তি এদেশে আসিয়া গায়ের জোরে শাসন করিবে, মানুষকে অমানুষ করিয়া, অক্ষম করিয়া, মনুষ্যত্বহীন করিয়া তিলে তিলে তাহাকে হত্যা করিবে, ইহা হইবে আইন আর যে বাঁচিবার অধিকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা হইবে অনধিকার এবং বে-আইনী? বাঙ্গালী সেদিন ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র বিপ্লবী বাংলার এই প্রচেষ্টার প্রতিই শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। বাংলার বিপ্লবী তরুণ দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া একদিন দাঁড়াইয়াছিল। দেশের খেয়া-তরীতে তাহার স্থান ছিল না, তাই সাঁতার কাটিয়াই তাহাকে নদী পার হইতে হইয়াছে; দেশের রাজপথ তাহার পক্ষে ছিল রুদ্ধ, তাই দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গাইয়াই তাহাকে চলিতে হইয়াছে। শৃঙ্খল একদিন হয়ত তাহারই জন্য রচিত হইয়াছিল, কারাগার এবং ফাঁসীর রজ্জু একদিন তাহারই জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তবুও এজন্য তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না। আত্মভোলা পথিকের দল দুঃখের পথে চলিয়াও আনন্দের পাত্রই পূর্ণ করিয়াছে। ডাক্তার একদিন তলোয়ারকর সম্পর্কে বলিয়াছিল, “বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি তলোয়ারকরকে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে জল তার গড়িয়ে পড়বে সত্যি; কিন্তু, একথা নিশ্চয় জেনো ভারতী, এজন্য দেশের লোকের কাছে কখনো একটা নালিশ সে জানাবে না।” ইহাই বাঙ্গালী বিপ্লবীর সত্যিকার পরিচয়। শরৎচন্দ্র তাঁহার পথের দাবীতে মুক্তিপথের অগ্রদূত বাংলার এই রাজ-বিদ্রোহীদেরই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন।

রেঙ্গুণ পুলিশ অফিসে গোয়েন্দা কর্মচারী নিমাইবাবু অপূর্বকে সব্যসাচী সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বাংলার অনেক বিপ্লবী সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

শরৎচন্দ্র ইহা জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই এমন নিখুঁত বাংলায় প্রতীক গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তির নাম সব্যসাচী। একথা জানিয়া অপূর্ব তাহার নিমাই কাকাকে বলিয়াছিল, সব্যসাচী! সব্যসাচী নাম ত কখনও শুনিনি। কথা শুনিয়া নিমাইবাবু উত্তর করিয়াছিলেন, "অর্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই হয়ত এর প্রচারিত আছে! পুণায় একদফা তিন মাস, আর সিঙ্গাপুরে একদফা তিন বছর, জেল খেটেছেন জানি। দশ-বারোটা ভাষা বলতে পারেন।" অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল, "বলেন কি!" নিমাইবাবু উত্তরে অপূর্বকে জানাইয়াছিলেন, "এতেই আঁৎকে উঠলে বাবা! তা হলে সবটাই শোনো। জারমানি জেলা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে, বিলেতে আইন পাশ করেছে, আমেরিকায় কি পাশ করেছে জানিনে। তবে যেখানে ছিল যখন, তখন একটা কিছু করেই থাকবে। এসব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল, রিক্রিয়েশন। কিন্তু কিছুই কোন কাজে এল না, বাবা। এর সর্বাঙ্গের শিরায় শিরায় ভগবান এমন আগুন জেলে দিয়াছেন যে, একে জেলেই দাও, আর শূলেই চড়াও, কিছুতেই কিছু হবে না। না আছে দয়ামায়া, না আছে ধর্ম-বর্ম, না আছে ঘর-দোর। বাপ্‌রে বাপ! আমরাও তো এদেশেরই মানুষ কিন্তু এ ছেলে কোত্থেকে বাংলা দেশে এসে জন্মাল, তা ভেবেই পাওয়া যায় না।"

কথাগুলির শেষ দিকে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণিত হইলেও মূলতঃ ইহা বাংলায় বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সব্যসাচী কে? ইহা লইয়াও এক সময় কম জল্পনা-কল্পনা হয় নাই। বাংলার বিপ্লবী নেতাদের অনেকের নামই এ সম্পর্কে করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাঁহার জীবনীর কাহিনী লিখিতে গিয়া এ সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই অধিকতর সত্য বলিয়া মনে হয়ঃ

"সমস্ত বিপ্লবীদের কাহিনী শুনে এবং অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত মেলামেশা করে, তিনি আপন কল্পনা দ্বারা বাংলার বিপ্লবীদের একটি type সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে কয়েকজন বিপ্লবী নেতার জীবনের ছায়া—বিশেষ করে সব্যসাচী চরিত্রে পড়েছে দুর্জয় সাহস, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, অসীম স্নেহ-প্রবণতা ও ক্ষমাশীলতা—এইগুলি তিনি নিয়াছেন যতীন মুখার্জীর জীবন থেকে, ছদ্মবেশ ধারণের অসাধারণ নিপুণতা ও গিরীশ মহাপাত্ররূপী সব্যসাচীর খুঁড়িয়ে চলা নিয়েছেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর জীবন থেকে, পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে

বেড়ান ও বৈপ্লবিক কেন্দ্র সংগঠনের দিকটা নিয়েছেন রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্র রায়) জীবন থেকে, নানা দেশের ইউনিভার্সিটী থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের ব্যাপারটা নিয়েছেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ডাঃ তারকনাথ দাসের জীবন থেকে। দুই হাতে অব্যর্থ লক্ষ্যে রিভলবার ছোঁড়ায় দক্ষতার মধ্যে সতীশ চক্রবর্তী ও অপর কয়েক জনের ছাপ আছে। সব চরিত্রই বাস্তব। তবে ঠিক যেমন ছিল তেমন নয়।" অর্থাৎ বাংলার বিপ্লবান্দোলনের বিভিন্ন মহল হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া শরৎচন্দ্র তাহার নিখুঁত বিপ্লবী সব্যসাচীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমগ্র অন্তরটি যেন জননী জন্মভূমি দিয়া গড়া। সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝায় অটল এবং নির্ভীক, যেন চাঞ্চল্যবিহীন মহাসমুদ্র। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছেন, সেই পাষাণ-স্তূপের মধ্যে শুধু একটিমাত্র জিনিসই আছে—জননী জন্মভূমি। তার আদি নাই, অন্ত নাই, ক্ষয় নাই। ইহাই বাংলার বিপ্লবীদের চিত্র। বাঙ্গালী তরুণ জন্মভূমিকে একান্ত করিয়াই ভালবাসিয়াছিল। কত পিতার করুণ আবেদন, কত মাতার অশ্রু তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের মুখে ভাসিয়া গিয়াছে। গৃহের অন্ন ফিরাইয়া দিয়া সে গৃহহীনের উপবাস সম্বল করিয়াছে। মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনকে ব্রত করিয়াছে। ইহা ছিল জীবনে তাহার সাধনা। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া বাঙ্গালী তরুণ জীবনে এই ব্রতকে একান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সব্যসাচী চিত্রে শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনে বিপ্লবী কোন আপোষ করিতে চাহে নাই। আমরা জানি, পথের দাবীর প্রতি ভারতীর সত্যিকার আকর্ষণ ছিল না। আকস্মিক ঘটনাচক্রেই সে ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সব্যসাচীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। এই শ্রদ্ধাই তাহাকে পথের দাবীর আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। মাতৃভূমির মুক্তি সম্পর্কে তাহাকে কখনও বিশেষ সচেতন আমরা দেখি না। বিশেষ করিয়া অপূর্বর সহিত সাক্ষাতের পরে পথের দাবীর সঙ্গে বন্ধন তাহার আরও শিথিল হইয়াছিল। সব্যসাচীর নিকট নিজেই ভারতী একদিন প্রকাশ করিয়াছিল—"আমি ক্রিশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরেজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেছি, আজ তাদের প্রতি ঘৃণায় মন পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারী কষ্ট হয়।" এই পথের দাবীর সঙ্গে তাহার অন্তরের কিছুটা মিল থাকিলেও ইহার পথের সঙ্গে ভারতী কোন মিল খুঁজিয়া পায় নাই। ভারতী কহিয়াছিল, "ভারতের মুক্তি আমরা চাই, অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর মুক্তি চাই, অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য জন্ম নিয়া

মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করিতে চাই।" কিন্তু সব্যসাচীর পথ তাহার পথ নয়, ভারতী ইহাও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। তাই তাহার একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র ডাক্তারকেও এই ভয়ঙ্কর পথে ছাড়িয়া যাইতে মন উঠিতেছিল না। এই নির্মম রক্তরেখার পথ ত্যাগ করিতে সে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা ইংরেজের সঙ্গে কি তোমার কখনো সন্ধি হতে পারে না?" সব্যসাচী কথাটার সারাসরি উত্তর দেন নাই, কিন্তু ভারতীকে কহিয়াছিলেন, "এই কথাটা তুমি আমার চিরদিন মনে রেখো ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের জন্মগত সংস্কার। এই এদের মূলধন। যদি পারো, দেশের নরনারীকে শুধু এই সত্যটি শিখিতে দিও।" ভারতী সব্যসাচীকে একদিন জানাইয়াছিল, "পথ তাহার নিষ্ঠুরতার পথ, দয়াহীনতার পথ। এই পথে কল্যাণ নাই।" পক্ষান্তরে ভারতীর পথ স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম-বিশ্বাসের পথ। ভারতী জানাইয়াছে, এই পথই তাহার শ্রেয়ঃ, এই পথই তাহার সত্য। এই পথেই নিহিত আছে কল্যাণ। ভারতীর এই পথ কি তাহা শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে আমাদিগকে জানান নাই। এ সম্পর্কে কোন সন্ধানই তিনি আমাদিগকে দেন নাই। অপূর্ব ও ভারতীর মিলনে যে গৃহসংসার গড়িয়া উঠিবে, ইহা তাহারই ইঙ্গিত কি না আমরা জানি না। কিন্তু সব্যসাচী ভারতীর এই উক্তিকে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই, ইহাই আমরা দেখি। ভারতীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবে না শুধু পথের দাবী।" আমরা জানি, শরৎচন্দ্র এখানে সত্য কথাই বলিয়াছেন, জগতে নিপীড়িত যারা, বঞ্চিত যারা, নির্যাতিত যারা, তাহাদের কল্যাণ করিবার জন্যই, দুঃখ দূর করিবার জন্যই বাংলার বিপ্লবান্দোলন গড়িয়া উঠে নাই। শুধু কল্যাণ করিবার প্রয়োজন যদি হইত, বিপ্লবী বাংলা তাহা হইলে এই ভয়ঙ্করের পথ খুঁজিয়া লইত না। বিপ্লবী বাংলার আন্দোলন ছিল মানুষের ঘুম ভাঙাইবার শঙ্খধ্বনি। মানুষ দুঃখী হউক, দরিদ্র হউক, অশিক্ষিত হউক, তবুও সে মানুষ; মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার তাহার আছে, আপনার দুঃখ-দারিদ্র্য মোচন করিবারও অধিকার আছে, বিপ্লবী বাংলা এই কথাটিই দেশকে শিখাইয়াছে। শরৎচন্দ্র ইহা জানিয়াছিলেন, বিপ্লবী বাংলার প্রকৃত রূপটি তিনি চিনিয়াছিলেন।

এইজন্যই তাঁহার সব্যসাচীর প্রয়োজন পথের দাবীতে, কল্যাণের প্রতিষ্ঠান তাঁহার প্রয়োজন নাই। সব্যসাচীর পথ মৃত্যুর সঙ্গে খেলার পথ, কল্যাণের পথ নয়।

নিজের দেশে ভারতবাসী যে কত অসহায় সব্যসাচী অতি শৈশবেই তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়া ছিলেন। সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়াও যেদিন একটি গাদা বন্দুকের ভয়ে মঠের মোহান্তকে ডাকাতদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, সেইদিন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহার দাদা। দুই তিন শত গ্রামবাসীর দৃষ্টির সম্মুখে মোহান্ত বাবাজীকে ডাকাতেরা খুঁটীতে বাঁধিয়া তিলে তিলে পোড়াইয়া হত্যা করিয়াছিল। মোহান্তের কাতর বুকফাটা আর্তনাদ সব্যসাচী ভুলিতে পারেন নাই। তারপরে সমগ্র গ্রামবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সব্যসাচীর দাদা যেদিন চলিয়া গেলেন, প্রতিকারের ভার দিয়া গেলেন তিনি সব্যসাচীর উপর। ডাকাতদল প্রতিশোধ নিতে আসিবে ইহা জানিয়াও সরকারের নিকট একটা বন্দুক চাহিয়া পাওয়া গেল না। তীর ধনুক বর্শা বল্লম তৈরী করা হইলে তাহাও আসিয়া পুলিশ লইয়া গেল। ইংরেজ শাসনে এত অসহায় সাধারণ মানুষ। এইজন্য সব্যসাচী মানুষের এই অসহায় অবস্থার প্রতিকারের ভারই স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, মানুষের কল্যাণ করিবার ভার তিনি গ্রহণ করেন নাই। এই ভার বড় দাদাই সব্যসাচীকে দিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি সব্যসাচীকে বলিয়াছিলেন, "মেয়েদের মতো এই সব গরু ভেড়া ছাগলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিসনি শৈল। কিন্তু রাজত্ব করবার লোভে যারা সমস্ত দেশের মধ্যে মানুষ বলতে আর একটি প্রাণীও রাখেনি, তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনি।" বড় দাদার অন্তিম কথাগুলি সব্যসাচী হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতীকে একদিন এই কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ব্যথা ভরা ইতিহাসে মৃত্যুটাই আসল ট্রাজেডী নয়, ভারতী, আসল ট্রাজেডী হচ্ছে, ওই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে শৃঙ্খলিত, পদানত, ভারতবাসীর যে উপায়হীন অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে তাই। আপন ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাবার অধিকারও তার নাই।"

ভারতবাসীর এই অসহায় অবস্থা ইংরেজ শাসকেরই সৃষ্টি। অপমান বা লাঞ্ছনা ইহাদের সচেতন এবং সজাগ করিয়া তোলে না; কারণ ইংরেজ শাসনের তথাকথিত শান্তির মধ্যে ইহারা সে চেতনাবোধ হাবাইয়া ফেলিয়াছে। এজন্য ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভিযোগ ছিল। বিপ্লবী বাংলা অনন্যমনা হইয়া ইহারই প্রতিকারে অগ্রসর হইয়াছিল, তাই বাংলার বিপ্লবীদের

প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। শুধু সব্যসাচীর জীবন অবলম্বনে নয়, পথের দাবীর অন্যত্রও শরৎচন্দ্রের বহু উক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লবী বাংলার প্রতিই শ্রদ্ধাঞ্জলি। এরূপ একটি অসংলগ্ন বা অহেতুক উক্তি আমরা উপন্যাসের প্রারম্ভেই দেখি। কথা হইতেছিল অপূর্বর বার্মা যাওয়া সম্পর্কে মা করুণাময়ী ও ছেলে বিনোদের মধ্যে। বিনোদ বলিয়াছিল, "সকল দেশেই জনকতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরের রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া আলো,—এর পাহাড় পর্বত, বনজঙ্গল, চন্দ্রসূর্য, নদীনালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়। বোধ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যকালে জননী জন্মভূমি কথাটা আবিষ্কার করেছিল।" বিপ্লবী বংলাকে মনে রাখিয়াই শরৎচন্দ্র সেদিন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অবশ্য, বিনোদ সেদিন অপূর্ব সম্পর্কেই এই উক্তি করিয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রকৃত লক্ষ্য যে অপূর্ব নয়, তাহা আমরা বুঝি। কারণ, অপূর্বর পরবর্তী জীবনকাহিনী ইহার বিন্দুমাত্র পরিচয় বহন করে না।

শরৎচন্দ্রের স্বাধীনতার আদর্শও ছিল; সমস্ত প্রকার বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ মুক্তিই ছিল তাঁহার নিকট স্বাধীনতা। রাজনৈতিক বন্ধন হইতে ভারতবাসী মুক্তি পাইবে অথচ একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে, নর-নারীকে সামাজিক বন্ধনে আষ্ঠে-পিষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবে, ইহাকে তিনি মুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সমাজের সতর্ক বিধি-নিষেধ শরৎচন্দ্র মানিয়া লইতে পারেন নাই। সমাজের প্রতি যে বিদ্রোহী মনোভাব তাঁহাকে শেষ প্রশ্নের কমল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তাহারই প্রথম সূচনা আমরা পথের দাবীতে দেখি। ব্রহ্মদেশীয় পিতার কন্যাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অপূর্বের মনে ভারতীয় সমাজের সতর্ক বিধিনিষেধের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করিয়াছিল। অপূর্ব বলিয়াছিল, "ইহা কঠোর হউক, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ।" ভারতীয় সমাজের বর্তমান দুর্দিনে অপূর্ব প্রাচীন মনীষিদের মতবাদকে ধরিয়া রাখার মধ্যে বাঁচিবার একমাত্র পথ দেখিয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "হায়রে! সোজা কথাটা তাহার মনে একবারও উদয় হইল না যে, যে-মুক্তিমন্ত্রকে সে এ-জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া কায়মনে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, তাহারই আর এক মূর্তিকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্তির সত্যকার দেবতাকেই অসম্মানে দূর করিয়া দিতেছে। মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার

আরামে চোখ বুঝিয়া স্নান করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া আছ ? সে সমুদ্র ; আছেই ত তাহাতে ভয় ; আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুমীর হাঙর ! তরী সেইখানেই ডোবে,—তবু সেইখানেই আছে জগতের প্রাণ,—তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা। নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবল মাত্র প্রাণ ধারণ করাটুকু চলে, বাঁচা চলে না।"

পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র অপূর্বকে প্রাচীন সংস্কারের প্রতীক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই পথের দাবীর সমিতি কক্ষে নবতারার আচরণ সেদিন তাহার নিকট বিসদৃশ মনে হইয়াছিল। নবতারা স্বামীত্যাগ করিয়া দেশের কাজের জন্য আসিবে, ইহাকে কোন মতেই সে সমর্থন করিতে পারে নাই। তাহার নিকট পুরুষের জন্য বহির্বিশ্ব এবং নারীর জন্য গৃহ। অধিকার সমান সে স্বীকার করে কিন্তু কর্মক্ষেত্র আলাদা। তাই নারীর স্থান গৃহের মধ্যে শুদ্ধান্তঃপুরে, স্বামীপুত্রের সেবার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা। ইহাতেই দেশের কল্যাণ এবং নারীর নিজেরও কল্যাণ, বাহিরে আসিয়া পুরুষের মাঝে ভীড় করিয়া দাঁড়াইলে এ কল্যাণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র সুমিত্রার মুখে প্রাচীন সমাজের এই ব্যর্থযুক্তির উত্তর দিয়াছেন। সুমিত্রা বলিয়াছে, "এটা অনেক দিনের এবং অনেকের মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত জানেন কোন একটা কথা কেবল মাত্র বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে উঠে না। এ ফাঁকির কথা।" ঠিক এই যুক্তিই আমরা 'শেষ প্রশ্নে' কমলের মুখে শুনি। ১৯২২ সালে বঙ্গবাসীতে পথের দাবী প্রকাশিত হইতে থাকে। মনে হয়, এই সময় হইতেই শরৎচন্দ্রের মনে এই কথা উদিত হইয়া শেষ প্রশ্নে ১৯৩০ সালে তাহা পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। সুমিত্রা অপূর্বকে বলিয়াছিল, "যাকে আপনি বাইরে এসে ভীড় করা বলছেন তা যদি কখনও ঘটে, তখনই দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভীড়ে শুক্‌নো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।" অপূর্ব দুর্নীতির সম্ভাবনার কথা তুলিয়াছিল, কিন্তু সুমিত্রা তাহাকে জানাইয়াছিল, "দুর্নীতি গৃহের মধ্যেও কম থাকে না। ওটা বিধাতারই দোষ, নরনারীর পরস্পরের হৃদয়ে যিনি অনুরাগের আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছেন।" সুমিত্রা তাহাকে একবার অন্য দেশের প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে বলিয়াছিল। শুনিয়া অপূর্ব খুশি হইতে পারে নাই, তীব্রতার সঙ্গে উত্তর করিয়াছিল, "অন্য দেশের কথা অন্য দেশ ভাবুক, আমি আমাদের নিজেদের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট মনে

করব।" কিন্তু সুমিত্রা এখানেই থামে নাই। সমাজকল্যাণ সম্পর্কে অপূর্বর যে ধারণা তাহার ভুল কোথায় তাহা দেখাইতে সে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ভারতীয় সমাজের নরনারীর পরস্পর সম্পর্কের যে ধারণা তাহার বিরুদ্ধাচরণই ইহার মধ্যে আমরা দেখি। অপূর্বকে সুমিত্রা বলিয়াছিল, "যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্য্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরমোৎকর্ষের বড়াই করেছিলেন, কিন্তু এই যে দেশে বিচারের ব্যবস্থা, সে দেশে ও বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব শুধু দেহেই পর্য্যবসিত নয়, অপূর্ব বাবু, মনেও ত দরকার। কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌছান যায় না।" এই সকল উক্তি উপলব্ধি করিলে সুমিত্রাকে কমলেরই পূর্বাভাষ মনে করা যাইতে পারে। অপূর্ব ইহার কোন উত্তর দিতে পারে নাই, অথচ সুমিত্রার কথা সে মানিয়া লইতেও পারে নাই। সুমিত্রাকে কহিয়াছিল, "কথা যদি আপনার সত্যও হয় তবুও আমি বলি, সমাজের মঙ্গলের জন্য, উত্তর পুরুষের কল্যাণের জন্য আমাদের এই ভাল।" সুমিত্রা শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে সেদিন তাহাকে জানাইয়াছিল, সমাজ বা উত্তরপুরুষ কোনটারই ইহাতে কল্যাণ নাই। সমাজ বা বংশের নামে একদিন মানুষ যে আচরণ করিত, আজ তাহার অনেকগুলি অচল। অপূর্বকে সুমিত্রা সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিল, "এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের মোহ কাটাইতেই হইবে। নারীকে বুঝাইতেই হইবে, ইহাতে তাহার লজ্জা ভিন্ন গৌরব নাই।" আমরা জানি, পুরাতন সমাজের বিরুদ্ধে ইহা বিদ্রোহের বাণী। ইহাতে অশান্তি আসিবে, বিপ্লব আসিবে কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে চলিবে না। রুগ্ন জরাজীর্ণ সমাজ, যে আপনাকে কোনক্রমে টিঁকাইয়া রাখিতে চায়, নিদারুণ আঘাতে সে হয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিন্তু সেইজন্য ভয় করিলে চলিবে না। পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র সেদিনের সমাজকে এই কথাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন।

পথের দাবীতে সুমিত্রার এই মত যে অভ্রান্ত তাহা সব্যসাচীও একদিন অপূর্বকে বলিয়াছিলেন, "সুমিত্রাকে বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এত বড় উঁচু জায়গা আর কোথাও পাবেন না অপূর্ববাবু।" নয়নতারা প্রসঙ্গে সব্যসাচী অপূর্বকে কহিয়াছিলেন, "মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে। কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবনযাত্রায় মানবের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে কোন যুক্তি দিয়াই ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে।"

সব্যসাচী সেদিন বলিয়াছিলেন, "সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটাতে পারাটাই কি চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়া সে যখন তার স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারে না।" আমরা জানি, ইহা শুধু সুমিত্রার কথা নয়, সব্যসাচীর কথাও নয়; ইহা স্বাধীনতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের আদর্শ।

বাংলার বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতিই শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন তাহা নয়, তিনি তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আজ দেশের এতবড় দুর্গতি যে, যাহারা দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণকামী তাহারা তাহাদেরই পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়া ফাঁসীর ব্যবস্থা করিয়াছে। শরৎ--চন্দ্রকে ইহা ব্যথিত করিত। ভারতী একদিন সব্যসাচী প্রসঙ্গে অপূর্বকে কহিয়াছিল, "এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোন মূল্য নাই, যে কোন লোকের হাতে যে কোন মুহূর্তে তাহা কুকুর শিয়ালের মত নষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎ বিধানে এতবড নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন্ পাপের দণ্ড? আমরা জানি, এ অভিযোগ শরৎচন্দ্রের নিজের এবং বাংলার বিপ্লবী দলের অনিন্দনীয় চরিত্রের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কেই তাঁহার এই অভিযোগ।

দেশের অধিবাসীরা তাহাদের কল্যাণকামীদের সর্বনাশ সাধন করে। শরৎচন্দ্র ইহা জানিতেন। কিন্তু এজন্য তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোনপ্রকার অভিযোগ ছিল না। কারণ তিনি জানিতেন, জীবনে ইহারা ধিকৃত ও বঞ্চিত, শিক্ষার অভাবে জ্ঞানের অভাবে নিজেদের মঙ্গল কোথায় তাহা নিজেরাই জানে না। তাই বন্ধুর সর্বনাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এ সর্বনাশ যে তাহাদের নিজেদেরই সর্বনাশ তাহারা এ কথা ভাবিয়া দেখে না। ভারতীকে ডাক্তার এই কথাই একদিন বলিয়াছিলেন, "পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হোল কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখবে। প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রী করে দিতে চাইবে। মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, সহানুভূতি নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষাক্ত সাপের মত তোমাকে দেখে চমকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালবাসায় এই আমাদের দাবী, এর বেশী দাবী করার কিছু যদি

থাকে ত সে শুধু পরলোকে। শরৎচন্দ্র বিপ্লবী বাংলাকে দেশ সেবার পুরস্কার—সর্বনাশা পুরস্কার সানন্দে গ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন! দেশের লোকের হাত হইতে ফাঁসীর রজ্জু লইয়া তাঁহারা গলায় পরিয়াছেন। তবু তাঁহাদের কোন অভিযোগ দেশবাসীর বিরুদ্ধে ছিল না। পরাধীনতাই তাহাদের এমন অজ্ঞ এবং অচেতন করিয়া রাখিয়াছে ইহাই তাঁহারা জানিতেন।

জীর্ণ পঙ্গু সমাজকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য শরৎচন্দ্র বিপ্লব চাহিতেন। শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনেই এই প্রয়োজন মিটিবে না ইহাই তিনি জানিতেন। ইহাতে দুঃখ আসিবে, অশান্তি আসিবে, কিন্তু ইহাতে ভীত হইলে চলিবে না ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত। ভারতীকে ডাক্তার এই কথাই একদিন বলিয়াছিলেন, "মহামানবের মুক্তি সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেইত আমার স্বপ্ন। এত কালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে?" দেশের মধ্যে ইহাতে অশান্তি আসিবে বলিয়া ভারতী ভীত হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এর থেকে বড় আদর্শ কি আর তোমার নেই?" ডাক্তার উত্তর করিয়াছিলেন, "আজও খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেছি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেই বলেচি, ভারতী, অশান্তি কাটিয়ে তোলা মানেই অকল্যাণ কাটিয়ে তোলা নয়। শান্তি। শান্তি! শান্তি! শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেচে জানো? পরের শান্তি যারা হরণ করে, যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যা শাস্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত উপদ্রুপ নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে তাদের এমন করে তুলেচে যে আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে ওঠে! ভাবে, এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাই ত হয়েচে, তাই ত আজ দীন দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে। তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়?" সব্যসাচী সেদিন আরও কহিয়াছিলেন, "না ভারতী তা হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক, মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। ধূলো ত উড়বেই, বালি ত ঝড়বেই, ইট-পাথর খসে মানুষের মাথাতে ত

পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক। ভারতী প্রশ্ন করিয়াছিল, "তাও যদি হয় দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?" ডাক্তার উত্তর দিয়াছিলেন, "তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে। কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।"

ইহার অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, একমাত্র বিপ্লবের পথেই আজ মানবের মুক্তি সম্ভব। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানবতাকে বঞ্চিত করিয়া যাহারা আজ অত্যাচারের দুর্গে আশ্রয় লইল সে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, অত্যাচারীর শান্তি হয়ত নষ্ট হইবে, কিন্তু তাহাতে দুর্গত মানবতার কি? ধনীর আনন্দের মাত্রা হয়ত কমিবে, তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা হয়ত ব্যাহত হইবে, কিন্তু নিপীড়িতের লাঞ্ছনা বিন্দুমাত্র কমিবে না। প্রাসাদে বাস করিয়া সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে ভোগ করিতেছে শান্তি তাহারই জন্যই প্রয়োজন। বঞ্চিতকে চিরদিন বঞ্চিত রাখিবার জন্য, আপনার ভোগ সুখ অব্যাহত রাখিবার জন্যই ধনী চিরদিন এই শান্তির বুলি আওড়াইয়া আসিতেছে, ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত।

ইহার আরও একটি দিকের প্রতিও শরৎচন্দ্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। চিরদিন ধরিয়া ধনী এই লাঞ্ছিত, দুর্গত মানবতাকে লইয়া খেলা করিয়া আসিতেছে। তাহাকে উপায়হীন, কর্মহীন করিয়া সে তাহারই উপর একান্ত নির্ভরশীল করিয়া তোলে। তার পরে তাহাকে লইয়া বঁড়শীতে বিদ্ধ মাছের মত খেলায়, কখনও বা ডাঙ্গায় তোলে, কখনও বা জলে ছাড়ে। এইভাবে ক্রমে তাহাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া যায়। লাঞ্ছিত মানবতা একদিন হয়ত নিরুপায় হইয়াই ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সেই দিন কিন্তু ধনীর সেই সযত্নে আওড়ানো শান্তির বুলি মনে থাকে না। যে সনাতন ও পবিত্র শান্তির জয়ধ্বনি এতদিন সে করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াই "নিরন্ন নিরস্ত্র দরিদ্রের রক্তে সে নদী" বহাইয়া দেয়।

তাই বিপ্লবীর পথ শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ নয়, সৎকর্ম করাই তাহার কার্য নয়, শরৎচন্দ্র ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। আর্তের সেবা যাহারা করে, নরের পুণ্য-সঞ্চয়ে যাহারা প্রবৃত্তি দান করে, রোগে যাহারা ঔষধ যোগায়, বন্যা প্লাবনে যাহারা সাহায্য বিতরণ করে, তাহারা স্বতন্ত্র লোক, তাহারা বিপ্লবী নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র সব্যসাচীকে বিপ্লবী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতীর নিকট একদিন ডাক্তার এই কথাই বলিয়াছিলেন, 'আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই,

স্নেহ নেই—পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ও-ই ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সাধনা।" কিন্তু তাই বলিয়া বিপ্লবীর নিকট স্বাধীনতাই স্বাধীনতার লক্ষ্য নয়, স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—ইহারা স্বাধীনতার অপেক্ষাও বড়। এদের একান্ত বিশ্বাসের জন্যই স্বাধীনতা, তাহা না হইলে স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। সব্যসাচী একদিন ভারতীকে এই কথাই বলিয়াছিলেন —"ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানব--জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি।" আমরা বুঝি, ইহা স্বাধীনতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রেরই নিজস্ব আদর্শ।

আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যাহারা স্বাধীনতার আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন চালাইতে ছিলেন, তাহাদের সম্পর্কেও শরৎচন্দ্রের মনোভাব আমরা 'পথের দাবী'তে দেখি। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, ইংরেজের আইনে স্বাধীনতার কামনা করা, কল্পনা করাও বে-আইনী, রাজদ্রোহ! তাই আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যথার্থ স্বাধীনতার আন্দোলন করা চলে না। তাই সমাজের প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা নিজেদের বাঁচাইয়া যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহাতে সামান্য পরিবর্তন আসিতে পারে; কিন্তু স্বাধীনতা কোন দিন আসিবে না,—ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের একান্ত অভিমত।

বিপ্লবীরা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, দেশের এক শ্রেণীর জনসাধারণের নিকট ইহা ছিল অক্ষমের নিস্ফল প্রয়াস। এই কথাই ভারতী একদিন সব্যসাচীকে কহিয়াছিল—"এত বড় রাজশক্তি, কত সৈন্য-বল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন, তার কাছে তোমার বিপ্লবী দল কতটুকু? সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের চেয়েও ত তোমরা ছোট। এর সঙ্গে তোমরা শক্তি পরীক্ষা করতে চাও কোন্ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও, দাও কিন্তু এত বড় পাগলামি ত আমি আর সংসারে দ্বিতীয় দেখতে পাই নে।" দেশের জন্য সর্বস্ব দেওয়ার যে প্রয়োজন আছে, ভারতী তাহা স্বীকার করিয়াছিল, সব্যসাচীর অতুলনীয় দেশপ্রেমকে সে শ্রদ্ধা জানাইয়াছিল, কিন্তু আত্মহত্যার পথ দিয়া কোন দেশই কখনও স্বাধীন হয় নাই, ইহাও সে জানাইয়াছিল। ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জবাব দিয়াছিলেন, "বিপ্লব মানেই, ভারতী, কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে আমূল পরিবর্তন। সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়।" শরৎচন্দ্র

এখানে ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন, এ যেন বিপ্লবী বাংলারই অন্তরের কথা। শক্তি--মানের সঙ্গে শক্তিমানের শক্তি পরীক্ষা চলিতে পারে কিন্তু দুর্বল বাঁচিবার তাগিদে, আত্মরক্ষার জন্য প্রবলের বিরোধিতা করে। ইহার মধ্যে শক্তি পরীক্ষার ঔদ্ধত্য নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়াছিলেন, "কি বলছিলে ভারতী, গোষ্পদ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদকে ভস্মসাৎ করে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানো? সহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ব-বিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোন দিন ব্যত্যয় করতে পারে না।" আগুন যদি জ্বলে তাহাতে শুধু প্রতিপক্ষই পোড়ে না, সে জ্বালায় তাহাকেও জ্বলিয়া মরিতে হয়। কিন্তু পূর্ব পিতামহদের যুগান্ত সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ইহা প্রয়োজন। এ যুক্তি শুধু শরৎচন্দ্রেরই যুক্তি নয়। বিপ্লবী বাংলা জানিত, বাঙ্গালী একদিন সাদরে ইংরেজকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাই প্রায়শ্চিত্ত তাহাকেই করিতে হইবে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়া এবং ইংরেজের গুলীতে প্রাণ দিয়া।

ভারতীয়দের, বাঙ্গালীর শক্তিহীনতা শরৎচন্দ্রকে পীড়া দিত। এই শক্তি--হীনতার জন্যই শক্তিমান ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রাচ্যের বুকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া নিরুদ্বেগে শাসনকার্য চালাইত। ইহার নাম দিয়াছে তাহারা সভ্যতা প্রচার। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের এই সভ্যতা প্রচারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের অভি--যোগের অন্ত ছিল না। শরৎচন্দ্র ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য জাতির লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশুশক্তিরই একান্ত প্রাধান্য দেখিয়াছিলেন। ভারতীকে ডাক্তার এক-দিন ইহাই কহিয়াছিলেন, "সভ্যতার নাম নিয়ে দুর্বল, অসহায়ের বিরুদ্ধে এত বড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায় ধর্মই সকলের বড় এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যই এই অধীনতার শৃঙ্খল পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম কর্ত্তব্য,—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারির ধর্ম প্রচারে, ছেলের পাঠ্য পুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।"

পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র আরও সত্য প্রচার করিয়াছেন, সেও সম্ভবতঃ বাঙ্গালী বিপ্লবীদের দিকে চাহিয়া। আজ চতুর্দিকে রব উঠিয়াছে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজে অপ্রয়োজনীয়, অশিক্ষিত মজুর এবং চাষী শ্রেণীই সমাজের ভিত্তি। তাহারা সর্বহারা, বিপ্লবে তাহাদের হারাইবার কিছু নাই। এই জন্যই তাহারা জাতবিপ্লবী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এইরূপ বিপ্লবী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবিত কালে বাংলা দেশে ইহ'ব বিপরীতটাই দেখিয়াছেন। শিক্ষিত ভদ্র সন্তানকেই তিনি দেখিয়াছেন আদর্শের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে। শরৎচন্দ্রকে ইহা শুধু আকৃষ্ট করে নাই, মুগ্ধ করিয়াছে, অভিভূত করিয়াছে। পথের দাবীতে একাধিক বার তিনি ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। অপূর্ব একদিন ডাক্তারকে কহিয়াছিল, "একদিন কৃষি প্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্র জাতি তাদের ত্যাগ করে সহরে এসে, যেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এদের মুখের অন্ন এবং পরণের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে নামচে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করব এবং ভারতীও আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সন্ন্যাস দেশের জন্য, নিজের জন্য নয় ডাক্তার।"

অপূর্ব আশা করিয়াছিল, ডাক্তার এ প্রস্তাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিবেন, তাহার দেশসেবার এই অপূর্ব উদ্যোগকে অভিনন্দিত করিবেন। ভারতীও তাহাই মনে করিয়াছিল। এই জন্যই সে বলিয়াছিল, "এ তো তোমারই কাজ দাদা। কিন্তু ডাক্তার তাহাকে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভাল করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য করা মনে করবার কোন প্রয়োজন নাই। চাষারা রাজা হোক, তাদের ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করিনে।" অপূর্বকে সম্বোধন করিয়া সব্যসাচী জানাইয়া ছিলেন যে, কৃষক শ্রেণীর দুর্গতির মূলে ভদ্রজাতি নয় এবং মূল যে কোথায় তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন আছে। সব্যসাচী সেদিন সমবেত অভিমতের প্রতিবাদ করিয়াই জানাইয়াছিলেন, এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত,

অপমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাঙলা দেশে আর নেই। প্রকৃতপক্ষে চাষীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোদ্ধা কোন কালেই হইতে পারবে না ; ইহাই ছিল শরৎচন্দ্রের অভিমত। এই জন্য তিনি ভারতীকে বলিয়াছিলেন, আমার পথের দাবী চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শশীকবি একদিন ডাক্তারের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, পল্লী কৃষকের কবিতা রচনা করিয়াই সে জীবন কাটাইয়া দিবে। দ্বিতীয় দিন সাক্ষাতে ডাক্তার ব্যঙ্গ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কবিতাকে চাষাড়ে কবিতা' বলিয়াছিলেন। কিন্তু শশী তখন তাহাকে তাহার সুচিন্তিত অভিমত জানাইয়াছে, "না, তাদের কাব্য যারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখছিনে। আপনার সে-কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি, এবং এ উপদেশও কখনও ভুলব না যে, আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান, অশিক্ষিত কৃষকে পারে না। আমি হব তাদেরই কবি।"

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পথের দাবী বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস নয়, সব্যসাচীর বৈপ্লবিক পরিচয়ই সবটুকু পরিচয় নয়। সুমিত্রা পথের দাবীর প্রেসিডেন্ট কিন্তু ডাক্তারের সহিত তাহার এই সম্পর্ক ছাড়াও আর একটা সম্পর্ক যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়া যায়। ভারতী একদিন সব্যসাচীকে এই প্রশ্নই করিয়াছিল—"বল, সুমিত্রা দিদি তোমার কে?" প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, তারপরে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ও যে আমার কে, এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু যেদিন ওকে চিনতাম না বললেই চলে, সেদিন নিজেই আমি স্ত্রী বলে ওর পরিচয় দিয়ে ছিলাম। সুমিত্রা নাম আমারই দেওয়া,—আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।" সব্যসাচী নিজেই একদিন সুমিত্রার পরিচয় দিয়াছে। সুমিত্রা, তাহার মা, দুই মামা, একটি চীনে এবং জন দুই মাদ্রাজী মুসলমান মিলিয়া জাভায় লুকানো আফিঙ গাঁজা আমদানি-রপ্তানীর ব্যবসা করিত। বাটাভিয়া সুরবায়ার পথে মাঝে মাঝে তাহার সাক্ষাত হইত ডাক্তারের সঙ্গে রেলগাড়ীতে। এই নারীর অতুলনীয় সৌন্দর্য ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। একদিন ওয়েটিংরুমে উভয়ের পরিচয় হইল, ডাক্তার বুঝিতে পারিলেন সুমিত্রা বাঙ্গালীর মেয়ে। ইহার পর বেঙকুলান সহরের জেটীতে পুনরায় ইহাদের সাক্ষাৎ। অবস্থাটার পরিচয় ডাক্তারই দিয়াছেন—"এক তোরঙ্গ আফিঙ, চারিদিকে পুলিশ, আর তার মাঝে সুমিত্রা।

আমাকে দেখে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, এ সন্দেহ আর রইল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিঙের সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলাম।" ঘটনা সুমাত্রায় ঘটিয়াছিল বলিয়া এই ঘটনা উপলক্ষেই তাহার নাম সুমিত্রা। তা না হইলে এই রমণীর নাম ছিল রোজ দাউদ। ডাক্তার বলেন, "মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে কিন্তু সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলেন না।"

ইহার পরে সুমিত্রাকে আমরা দেখি, সেলিবিস দ্বীপের ম্যাকেসার সহরের এক ক্ষুদ্র হোটেলে। ডাক্তার তখন সেখানেই অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন। তার পরনে হিন্দু মেয়েদের মত তসরের শাড়ী; হিন্দু মেয়েদের মতই এই প্রথম দিন ডাক্তারকে সে হেঁট হইয়া প্রণাম করে। নিঃসঙ্কোচে সে তাঁহাকে জানাইল, সব ছাড়িয়া দিয়া সে তাহার কাছে আসিয়াছে। তাহার কাজ সে নিজের কাজ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অতীত তাহার সে মুছিয়া ফেলিতে চায়। ডাক্তারের নিকট তাহার আবেদন, "আমাকে তোমার কাজে ভর্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর তুমি আর পাবে না।"

একুশ বছরের সুদীর্ঘ জীবন নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া আসিয়া সে ডাক্তারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সব্যসাচী ইহার সম্পর্কে জানাইয়াছেন, "পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ভারতী, সুমিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি।" শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায় মুহূর্তকালের জন্য যেন তিনি লজ্জায় আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্যই এই দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়াই আমরা সুমিত্রা-সব্যসাচীর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝিতে পারি। আমরা বুঝি, সব্যসাচীর ভিতর এবং বাহির সবই বৈপ্লবিক আদর্শ দিয়া গড়া। এই সুদৃঢ় বর্ম ভেদ করিয়া সে-অন্তরে কোন নারীর প্রবেশ সম্ভব নয়। তবুও বিপ্লবই বিপ্লবীর একমাত্র পরিচয় নয়। সর্বোপরি, সে নর, তাই নারীর প্রতি, বিশেষভাবে সুযোগ্যা নারীর প্রতি তাহার আকর্ষণ স্বাভাবিক। কিন্তু সুদীর্ঘ সাধনাবলে মনের প্রতি বিন্দুটির উপর বিপ্লবীর অধিকার এমন অসামান্য যে, কোন কারণেই সে তাহার কর্তব্য পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হয় না। সুমিত্রা শুধু পথের দাবীর সভানেত্রী নয়, ডাক্তারের হৃদয়েও তাহার জন্য একটি স্থান আছে। কিন্তু উহা কোনদিনই নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কে পরিণত হয় নাই। এই ধর্ম যে শুধু ডাক্তারেরই ছিল তাহা নয়, কম-বেশী ইহা সুমিত্রারও ছিল।

অপূর্বকে হত্যা করিবার আদেশ একদিন সুমিত্রা অবলীলাক্রমে দিয়াছিল—এজন্য তাহার বিরুদ্ধে ভারতীর মনে মনে অভিযোগ ছিল। নারী হইয়া আর এক নারীর প্রাণাধিকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা তাহারই সম্মুখে দিতে তাহার তিলার্ধ বাধে নাই, এজন্য সে বেদনা বোধ করিত। কিন্তু ডাক্তারের কাছে তাহার জন্ম, শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস শুনিয়া ভারতী আর এই অভিযোগ রহিল না। সে অন্তত: এইটুকু বুঝিল, সুমিত্রা আর দশজন নারীর মতই শুধুমাত্র নারী নয়। সে পথের দাবীর সভানেত্রী, তাই কর্তব্যের প্রতি নির্মম নিষ্ঠা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা বুঝি, পথের দাবীকে সে ভারতীর মত বাহির হইতেই শুধু গ্রহণ করে নাই, সে তাহার সমগ্র অন্তর দিয়াই ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার সর্বস্ব শুধু সব্যসাচীকে দেয় নাই, পথের দাবীকেও দিয়াছিল। পথের দাবীকে সেবা করিয়াই সে ডাক্তারকে সেবা করিতে চাহিয়াছিল। এদিক হইতে সুমিত্রা ভুল করে নাই। তাই পথের দাবীকে অতিক্রম করিয়া সে কোনদিনই ডাক্তারের হৃদয়ের সান্নিধ্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করে নাই। আমরা জানি, এই জন্যই সুমিত্রার প্রতি ডাক্তারের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

অপূর্বর নিকট একদিন সুমিত্রার পরিচয় দিয়াছিল ভারতী, "আমাদের প্রেসিডেণ্ট যিনি তাঁর নাম সুমিত্রা, তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন,—শুধু ডাক্তার ছাড়া তাঁর মত বিদুষী বোধহয় এ দেশে কেউ নেই।"

ইহার পরক্ষণেই পথের দাবীর আসরে সুমিত্রার সঙ্গে অপূর্বর সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ভারতী কানে কানে তাহাকে প্রেসিডেণ্টের পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "বলিবার প্রয়োজন ছিল না, অপূর্ব দেখিয়াই চিনিয়াছিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স তাহার ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরাণী। বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্য ধরণে এলো করিয়া চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিক চিক করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী ফুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে,—এই ত চাই। ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠাধার—কোথাও যেন আর খুঁত নাই—একি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ!

কিন্তু এই রূপের পরিচয়ই তাহার যথেষ্ট নয়। তাহার প্রকৃত পরিচয় আমরা

পাই, নবতারার স্বামী উকিল মনোহর বাবুর সঙ্গে কথায়, পরিচয় পাই আমরা অপূর্বর সঙ্গে কথাবার্তায়ও।

আমরা দেখি, নবতারা তাহার দুর্বৃত্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এই স্বামীটিও আমাদের অপরিচিত নয়। বর্মীশ্বশুরের সম্পত্তির আশায় সে তার বিবাহিত পুরাতন পত্নীকে ত্যাগ করিয়া আবার নূতন বর্মীর পানীগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে পুরুষের এ অপরাধ, অপরাধ নয়। অপরাধ শুধু নারীর। অপরাধ নবতারার, কারণ, স্বামী ত্যাগ করার পরে কেন সে সেই স্বামীর ধ্যানেই কালাতিপাত না করিয়া পথের দাবীর নারী-পুরুষের দলে আসিয়া ভিড়িয়াছে! পুরুষের জঘন্য হীন অপরাধও মার্জনীয়, কারণ সে স্বামী, আর নারীর অপরাধ যেখানে সে আসিয়াছে—সেখানে তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ পুরুষের পদস্খলন কোন অপরাধ নয়, আর নারীর পক্ষে পদস্খলনের সম্ভাবনাও অপরাধ। সুমিত্রা এই কথাই সেদিন মনোহরবাবুকে তাহার অনুপম সুস্পষ্ট ভঙ্গীতে জানাইয়া দিয়াছিল। সুমিত্রা বলিয়াছিল, "দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্ কাজ করবেন, না করবেন, সে বিচার তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন করেন নি, একথা আপনারা সবাই জানেন। কর্ত্তব্য ত কেবল একদিকে নয়।" পুরুষের নিকট পুরুষের বিরুদ্ধে এই যুক্তি অচল। তাই মনোহরবাবু শেষ পর্যন্ত শেষ পন্থারই আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পুরুষ অন্যায় করিতে পারে, পুরুষ বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, তাই বলিয়া স্ত্রীকেও যে অসতী হইতে হইবে এ তো কোন যুক্তি হইতে পারে না!—"এই বয়সে এই সবার মধ্যে থেকে উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারেন—এ তো কোনমতেই জোর করে বলা চলে না।" যুক্তি অকাট্য এবং ইহার প্রতিবাদ অচল। কিন্তু আমরা দেখি, সুমিত্রা ইহার পরও সংযতভাবে মনোহরবাবুর কথায় উহার উত্তর দিয়াছিল। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখনই সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, "জোর করে কিছুই বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে এবং সব চেয়ে বড় যা সেই ধর্ম্মজ্ঞান আছে; দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট মনে করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলচেন, সে বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন।" কথা শুনিয়া মনোহর বাবু ক্রুদ্ধ হইয়াই সেদিন চলিয়া গিয়াছিলেন; কারণ

প্রচলিত ধর্মজ্ঞানের সঙ্গে পথের দাবীর এই ধর্মজ্ঞানের কোন মিল তিনি খুঁজিয়া পান নাই। মনোহর বাবুকে এজন্য দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, আজীবন প্রচলিত যে ধর্মের আওতায় তাহারা মানুষ হইয়াছে; সেখানে নারীর মনুষ্যত্ব অপেক্ষা সতীত্বই বড়। পুরুষের নিকট শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও নারী তাহার সতীত্বকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইবে। ইহা শুধু তাহার নিকট নারী জীবনের সার্থকতার পথ নয়, মানব-ইতিহাসে মানুষের চলিবার একমাত্র পথও। ইহার প্রতিবাদ করার অর্থই নারীর পতন। কিন্তু সুমিত্রার মন, পথের দাবীর মন, সামাজিক এই বিধিবদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিল। পথের দাবীর পথ প্রচলিত পথ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তাই মনোহর বাবু সুমিত্রার ধর্মজ্ঞানকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেও সুমিত্রার উত্তর ঠিক তাহার প্রত্যুত্তর ছিল না। পথের দাবীর সভাবনেত্রীর উপযুক্ত মর্যাদার সহিতই তিনি উত্তর করিয়াছিলেন। কিন্তু সুমিত্রার কথাগুলি সেদিন পথের দাবীতে নবাগত অপূর্বকেও খুশী করিতে পারে নাই। অতগুলি লোকের সম্মুখে একজন নারীর মুখ হইতে অসঙ্কোচে সতীধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ অপূর্বকে সেদিন শুধু বিস্মিত করে নাই, ব্যথিতও করিয়াছিল। তাই সুমিত্রার নিকট সেদিন সে জানিতে চাহিয়াছিল, নবতারার আচরণ সত্যই তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করেন কিনা। কিন্তু সুমিত্রা তাহাকে জানাইয়াছিল, নবতারার আচরণে অন্যায় কিছুই হয় নাই, কারণ নবতারা দুর্বৃত্ত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া দেশের সেবা করিতে আসিয়াছে এবং এই দেশের সেবা অপেক্ষা বড় কিছুই নাই। সুমিত্রা তাহাকে জানাইয়াছিল, পুরুষ বাহিরে আসিয়া কাজ করিবে এবং গার্হস্থ্যধর্মে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্যেই নারীজীবনের সার্থকতা, ইহাই দেশের কাজ এবং এতেই দেশের ও দশের কল্যাণ—এটা অনেক দিনের ও অনেকের মুখের কথা, কিন্তু তাহা হইলেও এ যুক্তি সত্য নয়। সুমিত্রা অপূর্বকে বলিয়াছিল, "আপনি ত জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র বহুদিন ধরে বহু লোক বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে উঠে না; এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড এ তাদের কথা।" অপূর্ব চিরাচরিত যুক্তিতে দুর্নীতির আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল, চরিত্র কলুষিত হইবার ভয় দেখিয়াছিল। কিন্তু সুমিত্রা তাহাকে জানাইয়াছিল, "দুর্নীতির ভয় শুধু বাহিরেই থাকে না, ভিতরেও থাকে—ইহা ভিতর বা বাহিরের ব্যাপার নয়। নর ও নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ ভগবানই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাহারই

কথা।" সুমিত্রার নিকট অপূর্ব সেদিন তাহার জীবনে এক অতি নূতন কথা শুনিয়াছিল—সতীত্ব শুধু দেহেই পর্যবসিত নয়, মনেরও সতীত্ব দরকার। প্রকৃত সতীত্বের জন্য কায়মনে ভালবাসা প্রয়োজন। সুমিত্রা অপূর্বকে জানাইয়াছিল, জোর জবরদস্তি করিয়া ভালবাসা যায় না। এতে না আছে কল্যাণ সমাজের, না আছে কল্যাণ ভবিষ্যৎ মানব জাতির। এতে হয়ত সমাজে অশান্তি আসিবে, বিপ্লব আসিবে কিন্তু বিপ্লব মানেই অশান্তি নয়। রুগ্ন জরাজীর্ণ সমাজ আজ কোনমতে নিজেকে টিঁকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। আজ সেই পুরাতন সমাজ ধ্বংস হইয়া যদি তাহার স্থানে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই। বরং আতঙ্কে দম বন্ধ করে থাকাটাই সমাজের পক্ষে প্রকৃত মৃত্যু। সুমিত্রার এই উক্তি বিপ্লবী নারীর উক্তি সন্দেহ নাই।

কিন্তু পথের দাবীতে ইহাই সুমিত্রার একমাত্র পরিচয় নয়। পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ীতে পথের দাবীর সভায় অপূর্বর অপরাধের জন্য সে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল। অপরাধীর প্রতি বিপ্লবী সমিতির সভানেত্রীর দণ্ড। কিন্তু ইহার পর ডাক্তার যখন তাহার এই নির্দেশ ব্যর্থ করিয়া দিলেন, সমবেত জনমত তখন সুমিত্রার দিকে। কিন্তু ইহাও সে জানে, ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করা তাহার অসাধ্য। শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, সুমিত্রা কানে কানে কহিলেন, আমরা সকলে একমত। এতবড় অন্যায় প্রশ্রয়ে আমাদের সমস্ত ভেঙে চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য তাহারা তখন কিছুতেই মানিতে সম্মত নয়। অপূর্বকে শাস্তি দিতে তাহারা দৃঢ় সঙ্কল্প। আমরা জানি, সুমিত্রার সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই ডাক্তারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন সেদিন এক প্রচণ্ড দাবাগ্নি সৃষ্টি করিত। কিন্তু সুমিত্রা ত শুধু পথের দাবীর সভ্যমাত্র নয়, তাহার একটা নারী সত্তাও আছে। ডাক্তারের নির্দেশ তাহার নিকট অলঙ্ঘনীয়, বিদ্রোহ ত দূরের কথা!

সুমিত্রার পরিচয় দিয়াছেন ডাক্তার ভারতীর নিকট "ওর মা ছিল ইহুদীর মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙালী। প্রথমে সার্কাসের দলে জাভায় যান, পরে সুরভায়া রেলওয়ে ষ্টেশনে চাকরী করতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সুমিত্রা মিশনারীদের স্কুলে লেখাপড়া শিখতো।" সুমিত্রার বাবা মারা যাওয়ার পর পাঁচ ছয় বৎসরের ইতিহাস কোন এক অজ্ঞাত কারণে ডাক্তার ভারতীর নিকট বলেন নাই।

ভারতী সেদিন সুমিত্রার আদ্যোপান্ত ইতিহাস ডাক্তারের নিকট হইতে

জানিয়া লইয়াছিল। শরৎচন্দ্র আমাদের জানাইয়াছিলেন, সমস্ত জানিবার পরে ভারতীর ইচ্ছা করিয়াছিল একবার জিজ্ঞাসা করে, সুমিত্রাকে তিনি কতখানি ভালবাসেন কিন্তু লজ্জায় একথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে নাই। মেয়েমানুষ সম্পর্কে মেয়েমানুষের এ ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। ভারতী এ প্রশ্ন সেদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্নের উত্তর আমরা যে জানিনা তাহা নয়। আমরা বুঝি, সুমিত্রার জন্য ডাক্তারের হৃদয়ে ভালবাসা ছিল অতলস্পর্শী, কিন্তু সেই সুগভীর সুপ্রশস্ত সাগর বক্ষে ইহা কোনরূপ আলোড়ন বা বিক্ষোভ তুলিতে পারিত না।

অপূর্বের অপরাধের জন্য সুমিত্রা তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিয়াছিল। ডাক্তার যে অপূর্বকে ক্ষমা করিয়া আশ্রয় দিয়াছে, সমগ্র বিপ্লবীবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার নিরাপত্তা বিধান করিয়াছে, ইহা সুমিত্রা মানিয়া লইতে পারে নাই। কিন্তু এজন্য দায়ী পথের দাবীর প্রতি তাহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ব্রজেন্দ্র অন্য কারণে তাহাকে উত্তেজিত করিতেছিল, ইহাও একটি কারণ।

ব্রজেন্দ্র সুমিত্রাকে ভালবাসিত এবং ডাক্তারকে এ পথে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিত ডাক্তার নিজে ইহা জানিতেন। কিন্তু সুমিত্রা এ সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানে না ইহাও তাহার জানা ছিল। সুমিত্রা জানে, ব্রজেন্দ্র পথের দাবীরই একজন একনিষ্ঠ কর্মী, এই জন্যই পথের দাবীর শৃঙ্খলা ও ঐক্য রক্ষার জন্য তাহার আগ্রহ। পথের দাবীর শেষ যাত্রায় ডাক্তার সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, সুরভায়ায় ব্রজেন্দ্র একবার তাহাকে হত্যা করার চেষ্টা করে, দুইদিন আগে আর একবার সে এই চেষ্টা করে। শুনিয়া সুমিত্রা বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরবর্তী মনোভাব কি হইয়াছিল, তাহা শরৎচন্দ্র আমাদের খুলিয়া বলেন নাই। পথের দাবীতে সুমিত্রার শেষ ইতিহাসেও আমরা দেখি, প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া সুমিত্রা তখন জাভায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে।

মানুষ একদিন আসে, আবার চলিয়া যায় কিন্তু সমাজ চিরন্তন। তাই ব্যক্তি বিশেষের অভাব সমাজের পক্ষে কিছুই নয়; সমাজ জলধারার মত অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহিত। কোন সংগঠন সম্পর্কেও একথা আংশিক সত্য। ব্যক্তি বিশেষের অভাবে সংগঠনে আঘাত আসে সত্য কিন্তু যতদিন এই সংগঠনের প্রয়োজন আছে, ততদিন সে নিজেই নিজের নেতৃত্ব সৃষ্টি করিয়া চলে। ডাক্তারের কথা সেদিন ছিল মূলতঃ এই। কিন্তু সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়, ইহা

শুধু সেদিন সব্যসাচী সংগঠনের দিক হইতেই বলেন নাই। সুমিত্রাকে দেবীর আসনে বসাইয়া ডাক্তার যে অসাধ্য সাধন করিতেছিলেন, সুমিত্রা চলিয়া যাইবার পরে তাহাতে যে কিছুটা ছেদ পড়িবে, তাহার নিজের উৎসাহ উদ্যম যে কিছুটা ব্যাহত হইবে, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই।

কথাগুলি যেদিন সম্পূর্ণ একতরফা হইয়াছে তাহাও বলা চলে না। প্রশ্ন করিয়াছিল ভারতী—দাদা, এই কি তোমার নীতি, এই কি তোমার অকপট মূর্ত্তি? ডাক্তার ইহার উত্তর দেন নাই, উত্তর দিয়াছিল সুমিত্রা—হ্যাঁ, ঠিক এই! এই ওঁর যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই—এই পাষাণ মূর্ত্তি আমি চিনি ভারতী। ভারতী সেদিন কথাগুলি বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু আমরা জানি. ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য আর কিছুই হইতে পারে না। সুমিত্রার পক্ষে কথাগুলি অভিমানের সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অভিমানের মধ্য দিয়াও অত্যন্ত সত্য কথাগুলিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিপ্লবীর প্রকৃত রূপ ইহাই। বিপ্লবী এ জগতে কাহারও নয়—মাতার নয়, পিতার নয়, স্ত্রীরও নয়—একমাত্র আদর্শই তাহার নিকট সর্বস্ব। হৃদয়ের সম্পর্ক বিপ্লবী অস্বীকার করে না, কিন্তু এই বন্ধনে কেহ তাহাকে বাঁধিতে পারে না। মাতার স্নেহ, পিতার আদর, পত্নীর প্রেম তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ইহার মুগ্ধকরী শক্তির নিকট সে কখনও আত্মসমর্পণ করে না। তাই সুমিত্রা অতি নিকটে থাকিয়াও সব্যসাচী হইতে বহু দূরে। সুমিত্রা ইহা মর্মে মর্মে অনুভব করিত এবং এই কথাই সেদিন সে প্রকাশ করিয়াছিল। আমরা জানি, ম্যাকেসার সহরের ক্ষুদ্র হোটেলে সুমিত্রা সেদিন আসিয়া ডাক্তারের পথের পথিক হইবার দাবী জানাইয়াছিল! সে-আবেদন পথের দাবীর পথিক হইবার জন্য নয়, আবেদন ছিল অন্যরূপ। কারণ, পথের দাবীর পথিক হইবার জন্য হিন্দু মেয়ের মত তসরের শাড়ী পরিবারও প্রয়োজন হয় না, হিন্দু রমণীর মত হেঁট হইয়া প্রণাম করারও প্রয়োজন হয় না। ইহা সত্বেও সুমিত্রার অন্তরে ক্ষুদ্রতা ছিল না, তাই হৃদয়ের আবেদন পথের দাবীর আদর্শকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। আরাধ্য দেবতার আদর্শকেই সে নিজের আদর্শ করিয়া লইয়াছিল। এইজন্যই উভয়ের চলার পথে কোন বাধা সৃষ্টি না হইয়া সমান তালেই চলিতেছিল। শুধু বিদায়ের বেলাই অভিমানের দুই-একটি কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ডাক্তারের অন্তর-বাহির তখনও পথের দাবীময়, তাই সুমিত্রার কথাগুলি যেন তাহার কানেই প্রবেশ

করে নাই, এমনই অবস্থা তাহার দেখি। সব্যসাচী তখও তাহার পরম এবং চরম সত্যের গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত। নবতারা বিদায় নিয়াছে, সুমিত্রা চলিয়া যাইতেছে, পথের দাবী অন্ততঃ বর্মামুলুকে ভাঙ্গিবার মুখে কিন্তু সব্যসাচীকে এই চরম মুহূর্তে আমরা বলিতে শুনি, "তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য—এই অর্থহীন শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এত বড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরষেয়। মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত সনাতন নয়—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।"

আমরা পথের দাবীর প্রকৃত পরিচয় পাই, আর পাই শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী মনের পরিচয়। শরৎচন্দ্র জানাইতে চাহিয়াছেন, নীতির বাঁধনে সমাজের কল্যাণ নাই, সমাজের কল্যাণ পথ চলার গতিতে। বন্ধন মৃত্যুই আনে, বন্ধনে জীবন সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। এইজন্য সব্যসাচী কবিকে সামাজিক মুক্তির গান গাহিতে বলিয়াছেন, রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে, পথের দাবীতে তিনি তাহাকে ডাকেন নাই।

পথের দাবীতে ভারতীর স্থান শুধু অস্পষ্ট নয়, হেঁয়ালীপূর্ণও। পথের দাবীর যোগসূত্র সে, অথচ পথের দাবীর সঙ্গে তাহার যোগাযোগই সর্বাপেক্ষা কম। সব্যসাচীর ছোট বোন সাজিয়াই সে আগাগোড়া অভিনয় করিয়া গেল, ইহাই আমরা দেখি। অথচ সে অপূর্বর মত দুর্বলও নয়।

রেঙ্গুনের এক অস্পষ্ট সন্ধ্যায় ভারতীকে আমরা প্রথম দেখি। পরিচয় তাহার প্রথম দিনেই আমরা পাই। আমরা বুঝি, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়—এই সামাজিক নীতিবোধ তাহার অন্তরে অক্ষুণ্ণই আছে। দুর্বৃত্ত মাতাল পিতাকে অন্যায় হইতে নিবৃত্ত করিতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, পিতার অন্যায় স্বীকার করিয়া অজ্ঞান মাতাল পিতার জন্য অপূর্বর নিকট ক্ষমা ভিক্ষাও করিয়াছে। গৃহে অপরিচিত আগন্তুক ভাড়াটিয়াকে পিতা উৎপীড়ন করিয়াছে, এজন্য সে লজ্জিত হইয়াছে এবং উৎপীড়নের ফল যথাসাধ্য প্রশমনের জন্য সাজি ভরিয়া ফল ভেট লইয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অপূর্ব সেদিন ভারতীর অন্তরে সাধারণ নরনারী হিসাবে এক ভীত রমণীকেই দেখিয়াছিল; কিন্তু আমরা জানি, অপরিচিত নিরীহের প্রতি অযথা উৎপীড়নই সেদিন তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। অপরিচিত নিরীহের প্রতি অযথা লাঞ্ছনা

ভারতীর হৃদয়ে সেদিন যে ব্যথা এবং সমবেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়াই একদিন দুইটি নরনারী হৃদয় পরস্পরের আরও সন্নিকটে পৌছিয়াছিল, ইহাও আমরা জানি। অবশ্য ভারতীর এই অকুণ্ঠিত সরলতা এবং অপরিসীম ন্যায়নিষ্ঠা সেদিন যথোচিত সমাদর পায় নাই। অপমানিত অন্তরের দুঃসহ বেদনা লইয়াই সে ফিরিয়া গিয়াছিল। আমরা দেখি, এই ভারতীর নিকট হইতে তেওয়ারী একদিন জল পান করিয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু-বার্লি খাইয়াছে। জাতির বিশুদ্ধতা ইহাতে ছিল কিনা, অথবা কতটা ছিল সে হিসাব রাখিবার তখন সময় ছিল না এবং থাকিলেও ইহার বিরুদ্ধে গঙ্গাস্নান এবং গোবরের অভাব তাহার হয় নাই। কিন্তু এই ভারতীর হাতে করিয়া লইয়া আসা ফলের অস্পৃশ্যতা সেদিন এই গোবর গঙ্গাস্নানকেও অতিক্রম করিয়াছিল। দীর্ঘ কয়েক শত মাইলের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া জননী করুণাময়ীর আদেশ সুদূর বর্মাদেশেও সেদিন আপনাকে প্রচার করিয়াছিল—"ওসব আমরা ছোঁই না মেমসাহেব, তুমি তুলে নিয়ে যাও।"

এ ব্যাপারে অপূর্বকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু ইহার পর ভারতীর যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। সত্যকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করা এবং উল্টা প্রতিপন্ন কবিতে প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনা বাড়ে, কিন্তু ইহাতে নিজের কোন গৌরব নাই—একথা ভারতী যে জানিত না তাহা নয়।

বর্মা মুলুকে 'পথের দাবী'কে অল্প দিনের মধ্যে পাততাড়ি উঠাইতে হইয়াছিল। ইহার মূলেও অপূর্ব ভারতীর পরস্পর হৃদয়াকর্ষণ। অবশ্য, অপূর্বর দুর্বলতা ইহার একটি কারণ। কিন্তু অপূর্বকে দুর্বল জানিয়াও ভারতীই তাঁহাকে 'পথের দাবীতে' আশ্রয় দিয়াছিল। কারণ 'পথেব দাবী' অপেক্ষা অন্য একটা দাবীই এই সময়ে তাহার নিকট বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই অপূর্ব ভারতীর পরস্পর হৃদয়াকর্ষণই একদিন প্রবল ঝটিকায় পরিণত হইয়া পথের দাবীর সাজান বাগানকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। আকাশের গায়ে একখানি লঘুমেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাই এক সময়ে কালিকাময় হইয়া পথের দাবীর সমগ্র পরিবেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা দেখি, অপূর্বর আচার আচরণ সাগরের পরপারে আসিয়া হিন্দুত্বের নির্দেশ অমান্য করিতে পারে নাই কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীকে সে-যে ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিহার করিয়া চলিয়াছে, তাহাও ঠিক বলা চলে না।

কিন্তু অপূর্ব ভারতীর এই প্রণয় ব্যাপারকে শরৎচন্দ্র যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে যে অস্বাভাবিকতা কোথাও নাই তাহা নয়। আমরা জানি, অপূর্ব যখন রেঙ্গুন হইতে ভামো রওনা হইয়া যায়, তাহার মন ছিল ভারতীর প্রতি বিদ্বেষে ভরা। বাড়ীতে ফিরিয়াই সে ভারতীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। ইতোমধ্যে ভারতীরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে অনেক ইহা যথার্থ। তাহার মার মৃত্যু হইয়াছে, পালক পিতাও বর্তমান নাই। তেওয়ারীকে সে শুশ্রূষা করিয়া রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রণয় নিবেদনের যে চেষ্টা, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের যে প্রচেষ্টা দেখি, তাহা কতকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, অপূর্ব অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভারতী হাত-মুখ ধোয়াইয়া তাহাকে আনিয়া খাটের উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল এবং গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়াই তাহার হাত ও পায়ের জল মুছাইয়া দিয়াছিল। হাতপাখা তুলিয়া আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিয়াছিল, "এই বার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যাবো না।

অপূর্ব বাঞ্ছিত মৃদুকণ্ঠে কহিল—কিন্তু আপনার যে খাওয়া হয়নি।

ভাবতী কহিল, খেতে আর আপনি দিলেন কই? আপনি ঘুমোন।

—ঘুমিয়ে পড়লে তো আপনি চলে যাবেন না?

—না, আপনার ঘুম না ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করব।

অপূর্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনাকে মিস ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?

—নিশ্চয় করব। অথচ শুধু ভারতী ব'লে ডাকলে করব না।

—কিন্তু অন্য সকলের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, হলই বা অন্য সকলের সামনে। কিন্তু চুপ করে একটু ঘুমোন দিকি, আমার ঢের কাজ আছে।

অপূর্ব বলিল, ঘুমোতে আমার ভয় করে, আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে চান।

— কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই আপনি থাকবেন কি কোরে?

পরিস্থিতি বিবেচনায় সমস্ত ব্যাপারটাই একটু প্রণয় পর্বের বাড়াবাড়ি নয় কি?

শরৎচন্দ্র জানাইয়াছেন, সব্যসাচী সুমিত্রাকে করিয়াছিলেন পথের দাবীর প্রেসিডেণ্ট এবং ভারতীকে তিনি করিয়াছিলেন পথের দাবীর সেক্রেটারী। কিন্তু আমরা দেখি, পথের দাবীর সমর্থন অপেক্ষা, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কেই যেন তাহার আগ্রহ বেশী। পথের দাবীতে সে অপূর্বকে আকর্ষণ করিয়াছিল। পথের

দাবীর 'সত্যিকার কাজে, ওয়ার্কমেনদের নরককুণ্ডেও' তাহাকে আমরা দেখি অপূর্বকে সে বলিয়াছিল, "এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে, তার ভার আপনাকে পর্য্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সব্যসাচীর পথের দাবীর সঙ্গে তাহার পরিচয় খুব নিবিড় ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় হয় না।

আমরা দেখি, অপূর্ব দুর্বল। ফয়ার মাঠে সমবেত জনতার সম্মুখে অপূর্ব যে অভিনয় করিয়াছিল, তাহাতে পথের দাবীতে তাহার কোন স্থান হইতে পারে না। অপূর্বর নিজের নিকটও ইহা অজ্ঞাত ছিল না। ভারতীকে সে বলিয়াছিল—আপনারা ত জানেন, সমিতির আমি যোগ্য। কিন্তু আমরা এখানে যে ভারতীকে দেখি, সে পথের দাবীর সেক্রেটারী নয়, সে নারী। প্রণয়াস্পদের ন্যায় অন্যায়ের কোন বিচার তাহার নিকট নাই। অপূর্বকে ভারতী ইহার পূর্বেই সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। পথের দাবীর বহু উর্ধে তখন তাহার হৃদয়ের দাবী। তাই অপূর্ব যখন দৃঢ়কণ্ঠে, সুস্পষ্টভাবে ভারতীকে জানাইয়া দিল, "পথের দাবীতে তাহার স্থান নাই"। শরৎচন্দ্র আমাদিগকে জানাইয়াছেন, 'ভারতী হঠাৎ যেন তার হাত ধরিতে গেল কিন্তু সামলাইয়া লইয়া এক মুহূর্ত তাহার মুখের 'পরে দুই চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল—পথের দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন কিছু নেই অপূর্ববাবু।" আমরা দেখি, ভারতীর জীবনে এই 'আর একটা দাবী'রই শেষ পর্যন্ত জয় হইল, পথের দাবী তখন অতল তলে ডুবিয়া গেল। ইহার পর ভারতীর পথ পশ্চাতের পথ। সম্মুখের সকল বন্ধন ভাঙিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইবার দুঃসাহস তাহার মধ্যে আর আমরা দেখি না।

———